হৃষীকেশ-সিরিজ,—সং ৪

কান্তকবি রজনীকান্ত

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

কলিকাতা

৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৮

মূল্য চারি টাকা

১—৭ ও ১৪—২০ } ফর্ম্মা হেয়ার প্রেসে

৮—১৩ ফর্ম্মা—ভিক্টোরিয়া প্রেসে

২১ নং ফর্ম্মা—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে

২২, ২৩, ২৩ ক এবং সূচীপত্র প্রভৃতি } ফর্ম্মা কালিকা প্রেসে

২৪, ২৫, ২৬ ফর্ম্মা—ওরিয়েণ্টাল প্রেসে

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে

শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

কবি রজনীকান্ত
(যৌবনে)

"জ্বলুক্ যতই জ্বলে,

পর জ্বালা-মালা গলে,

নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি ;

হিমাদ্রিই বক্ষ 'পরে

সহে বজ্র অকাতরে,

জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় ;

অস্তাচলে চলে রবি,

কেমন প্রশান্ত ছবি !

তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি !"

— বিহারীলাল।

সমর্পণ

যে দুইজন সহৃদয় মহোদয়

কান্তকবি রজনীকান্তকে

তাঁহার দারুণ দুঃসময়ে

অপরিমেয় সাহায্য-দান করিয়া

বাঙ্গালী জাতির মুখরক্ষা করিয়াছেন,

বাঙ্গালার সেই দুই মহাপ্রাণ—

শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

ও

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের

যুগল-করে

তাঁহাদেরই সাধের কবির

এই জীবন-গাথা সমর্পণ করিয়া

কান্তের আত্মার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি-সাধন করিলাম

বিনীত

ভূমিকা

রজনীকান্ত সেনের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় অতি সামান্যই ছিল। আমি কয়েকবার মাত্র তাঁহার গান তাঁহার মুখে শুনিয়াছি এবং রোগশয্যায় যখন ক্ষতকণ্ঠে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই স্বল্প পরিচয়ে তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে সে আমি তৎকালে তাঁহাকে পত্রদ্বারাই জানাইয়াছিলাম। সেই পত্র এই বর্ত্তমান গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকা লিখিবার উপলক্ষ্যে রীতিরক্ষার উপরোধে সেই পত্রলিখিত ভাবকে যদি পল্লবিত করিয়া বলিবার চেষ্টা করি তবে তাহাতে রসভঙ্গ হইবে, অতএব তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। কেবল শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এই কবি-চরিত রচনাকল্পে যে সাধু অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন, সে জন্য এই অবকাশে তাঁহাকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
৩১ আশ্বিন,
১৩২৮

নিবেদন

১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে কান্তকবি রজনীকান্ত পরলোকগমন করেন; তাঁহার পরলোকগমনের প্রায় বার বৎসর পরে তাঁহার এই জীবন-চরিত প্রকাশিত হইল।

এই জীবন-চরিত প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় অনেকে অনেক অনুযোগ ও অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সে অনুযোগ ও অভিযোগ যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা বলি না, তবে এই সম্বন্ধে আমারও কিছু বলিবার আছে।

রোগশয্যাশায়ী রজনীকান্ত তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অনুরোধ, আদেশ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে, এই অনুরোধ বা আদেশ রক্ষা করা কত কঠিন, কত গুরুতর, কত দায়িত্বপূর্ণ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমি বাস্তবিকই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ি। এ যে অকূল পাথার, অগাধ সমুদ্র! এই বার বৎসর কাল ধরিয়া আমি পরলোকগত কবিকে বুঝিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ সাধক কবির জীবন-চরিত বুঝিয়া আয়ত্ত করা আমার পক্ষে খুব কঠিন। তাই এই জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে এরূপ বিলম্ব ঘটিয়া গেল। এখনও যে রজনীকান্তকে যথাযথভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিয়াছি, তাহাও ত বলিতে পারি না।

সাধ্যমত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও রজনীকান্তের জীবন-চরিতকে সুন্দর করিতে পারিলাম না, পরন্তু ইহাতে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। যদি কখন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখন সে সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিব।

এই গ্রন্থ-রচনার জন্য আমার বন্ধুবান্ধব অনেকে এবং বহু রজনী-ভক্ত আমাকে উপকরণ প্রভৃতির দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের সকলের কাছে আমি সে জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের সকলের নাম প্রকাশ করিয়া এ নিবেদনের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। তবে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মাত্র এক জনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি—তিনি স্বর্গীয় কবির সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী মহাশয়া, তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ ও কবি-লিখিত হাসপাতালের খাতাগুলি এই জীবন-চরিত রচনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

সৎসাহিত্য-প্রচারে ব্রতী হইয়া যিনি ইতিমধ্যেই অনেকের শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন হইয়াছেন, আমার সেই পরম কল্যাণভাজন বন্ধু কুমার শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে সাহায্য না করিলে আমার পক্ষে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করা দুরূহ হইত।

বরেণ্য কবি পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে কয়টি কথা লিখিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার সেই আশীর্ব্বচন ভূমিকারূপে প্রকাশ করিলাম।

মহাবিষুব সংক্রান্তি
১৩২৮

বিনীত
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

বিষয়-সূচী

১

সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে

হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়

পরিচ্ছেদ বিষয়		পৃষ্ঠা

৩

বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে

পরিচ্ছেদ বিষয়		পৃষ্ঠা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"জনপ্রিয় রজনীকান্ত" শীর্ষক পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠাগুলির সংখ্যা ভুল হইয়াছে। ৩৯৩ হইতে ৪০৮ পৃষ্ঠার পরিবর্ত্তে ৩৬৭ হইতে ৩৮২ পৃষ্ঠা হইবে।

চিত্র-সূচী

১

সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে

"প্রাণের মধুর জ্যো'স্না ফুটেছে অধরে,
সদাই আনন্দে রয়,
সংসারে সংসারী হয়,
ভুলেও কখন কারো মন্দ নাহি করে।"

— বিহারীলাল।

কান্তকবি রজনীকান্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও জন্মস্থান

১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ, (২৬এ জুলাই, ১৮৬৫) বুধবার প্রত্যুষে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে বৈদ্যবংশে কান্তকবি রজনীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন।
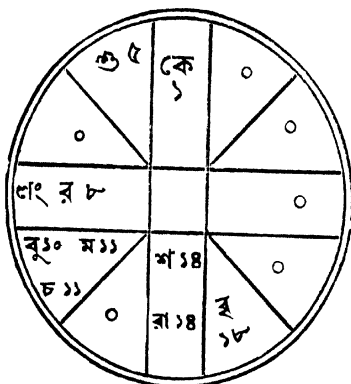
কর্কটলগ্নে, সিংহরাশিতে কান্তকবির জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকালীন নক্ষত্র ছিল পূর্ব্বফল্গুনী। তাঁহার রাশিচক্রের প্রতিলিপি উপরে প্রদান করিলাম।

ভাঙ্গাবাড়ীর সেন-পরিবার সে সময়ে সমাজ-মধ্যে সম্মানিত ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন। ধনধান্যে গৃহ যখন পরিপূর্ণ, আত্মীয়-কুটুম্বের আনন্দ-কলরবে গৃহাঙ্গন যখন মুখরিত, সেন-পরিবার-মধ্যে প্রীতির ধারা যখন পূর্ণবেগে বহমান, রজনীকান্ত সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধন করেন।

ভাঙ্গাবাড়ী একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। ইহা উল্লাপাড়া থানার অধীন। পূর্ব্বে এই স্থানে অসংখ্য নলবন ও পানের বরজ ছিল। বৈদ্যবংশীয় রাজারাম সেন ও রাজেন্দ্ররাম সেন—দুই সহোদর ময়মনসিংহের সহদেব-পুর গ্রাম হইতে এই স্থানে আসিয়া প্রথম বাস করেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে ভাঙ্গাবাড়ীতে বৈদ্যের বাস ছিল না, তাঁহারাই ভাঙ্গা-বাড়ীর প্রথম বৈদ্যবংশ। তখন ইহার চতুর্দ্দিকে এক প্রকাণ্ড বিল (যমুনার শাখা) ছিল। কালক্রমে সেই বিল শুকাইয়া যায় এবং উহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠে।

ভাঙ্গাবাড়ী উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে দেলুয়াকান্দি, দক্ষিণে চন্দনগাঁতি এবং পূর্ব্বে কোনা-বাড়ী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নিকট দিয়া হুড়াসাগর নামক একটি নদী (যমুনার শাখা) প্রবাহিত হইত। তা ছাড়া গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গের সমবেত চেষ্টা ও যত্নে তিন চারিটি পুষ্করিণী খনন করান হইয়াছিল।

গ্রামের উত্তরে টিঠা নামে একটি ক্ষুদ্র বিল আছে। এই বিল, গ্রাম ও গ্রামস্থ পণ্ডিতগণকে লক্ষ্য করিয়া কবির কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের খুল্লমাতামহ ৺যাদবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি রহস্যপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। রজনীকান্ত অনেক সময় সেইটি আবৃত্তি করিতেন—

শ্লোকটি এই,—

ভগবাটী ভবেৎ কাশী টিঠা চ মণিকর্ণিকা।

বিশারদঃ সদাশিবঃ ব্রজনাথঃ কালভৈরবঃ॥ (১)

টিঠা নামক মণিকর্ণিকায় স্নান-দান-ফল—

স্নানদানে ফলং নাস্তি কেবলং ঘ্যাগবর্দ্ধিকা। (২)

সেন মহাশয়দিগের অভ্যুদয়ের সহিত গ্রামখানিরও উন্নতি হয়, এবং নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহু জাতি এখানে আসিয়া বসবাস করেন।

কবির জন্মকালে গ্রামখানির অবস্থা বেশ উন্নত ছিল এবং গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি বাস করিত। ইহা ব্যতীত সে সময়ে গ্রামে প্রায় চল্লিশ ঘর মুসলমানও ছিল।

কবির জন্ম-সময়ে ভাঙ্গাবাড়ীতে ডাকঘর ছিল না; কিন্তু পরে রজনীকান্ত ও দুই চারিজন স্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় কবির বহির্ব্বাটীর একটি কক্ষে ডাকঘর স্থাপিত হয়।

সে সময় গ্রামে ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী বিশারদ মহাশয়ের দেশ-প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ও গভর্ণমেন্টের সাহায্য-প্রাপ্ত একটি বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল। তদ্ভিন্ন আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি ও রাজনাথ চক্রবর্ত্তী তর্ক-

(১) কবির বাল্যবন্ধু সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী কবি-শিরোমণি মহাশয়ের পিতা ৺ভুবনেশ্বর বিশারদ এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতা ৺ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত ব্রজনাথ অতিশয় কৃষ্ণকায়, হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘচ্ছন্দ ব্যক্তি ছিলেন; যখন সেই কৃষ্ণাঙ্গ রক্ত-চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া তিনি বাহির হইতেন, তখন প্রকৃতই তাঁহাকে ভৈরব বলিয়া বোধ হইত।

রত্ন প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিত তখন ক্ষুদ্র পল্লীখানিকে অলঙ্কৃত করিতেন। এতদ্ব্যতীত কয়েক জন বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত লোক ভাঙ্গাবাড়ীর অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কবির জ্যেষ্ঠতাত রাজসাহীর বিখ্যাত উকীল গোবিন্দনাথ সেন, পিতা সব্‌জজ্ গুরুপ্রসাদ সেন, রাজসাহীর কমিশনারের সেরেস্তাদার প্যারীমোহন সেন, রাজ-দেওয়ান রাজীবলোচন সেন ও গোবিন্দপুর লালকুঠীর দেওয়ান পুলিনবিহারী সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র পল্লী তখন সুখ-সমৃদ্ধি, উৎসব-আনন্দ ও স্বাস্থ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে এগারটি পরিবারে দুর্গোৎসব হইত; ভাঙ্গাবাড়ীর ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র পল্লীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। চৈত্র মাসে চড়কের সময় প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব চলিত।

এখন গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। পূর্ব্বের সে শ্রী আর নাই। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন, লোকের যত্ন ও ছাত্রাভাববশতঃ বঙ্গবিদ্যালয়টি উঠিয়া গিয়াছে। চড়কের সেই দুই সপ্তাহব্যাপী উৎসব আর হয় না। সংস্কারের অভাবে পুষ্করিণীগুলি মজিয়া গিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া আসিয়া দেখা দিয়াছে।

কবির ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রেরিত গ্রামের বিবরণ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, গ্রামের কত দূর দুর্দ্দশা হইয়াছে। কাল-মহিমায়, পল্লীবাসীর অবহেলায় ও অযত্নে এবং ম্যালেরিয়ার মাহাত্ম্যে এখন ভাঙ্গাবাড়ী প্রকৃতই ভাঙ্গাবাড়ীতে পরিণত হইয়াছে।

"গুরুপ্রসাদ ও গোবিন্দনাথের রাজ-প্রাসাদ-সদৃশ বৃহৎ অট্টালিকাতে এখন গুটিকতক বিধবা বাস করিতেছেন।" * * *

'ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন।" * * * *

"গ্রামে যাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহারা প্রায় সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতেই অর্থহীন ছিলেন, ভদ্রলোকগণ তবু সহরে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসিগণের কোন উপায় নাই বলিয়া তাঁহারা বাধ্য হইয়া গ্রামে বাস করিতেছেন এবং ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া জর্জ্জরিত হইতেছেন।"

পল্লীবাস-সম্বন্ধে কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি।—

"দেশটা মধ্যম শ্রেণীর লোকের পক্ষে বাসের অযোগ্য হ'য়েছে। মুসলমান প্রধান। হিন্দুদের মধ্যেও দলাদলি, মনোমালিন্য। তবে honest villager (নির্ব্বিরোধ গ্রামবাসী) কেমন করে সেখানে বাস ক'রবে? আমি ত পথ একরকম দেখিয়েছি। দেখ্‌ছ না? বাড়ী ঘরে কৈ যাওয়াই হয় না। আমার একটু সম্পত্তি ছিল, তার অধিকার নাই, আমি পত্তনি দিয়েছি, কতক বিক্রী করেছি। I smelt from the beginning that the quarter would not be fit for our living. (আমি গোড়া হইতেই অনুভব করিয়াছিলাম যে, এই স্থান আমাদিগের বাসোপযোগী হইবে না।)*

---

* হাসপাতালের রোজনাম্‌চা, ৬ই ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বংশ-পরিচয়—পিতৃকুল ও মাতৃকুল

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সহদেবপুর গ্রামে রজনী-কান্তের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাস ছিল। তাঁহারা বঙ্গজ বৈদ্য। সহদেবপুর যমুনা নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। তাঁহার প্রপিতামহ যোগিরাম সেন ভাঙ্গাবাড়ীর জমিদার যুগলকিশোর সেনগুপ্তের কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করেন। এই যুগলকিশোর পূর্ব্বোক্ত রাজেন্দ্ররাম সেন মহাশয়ের পৌত্র। যোগিরামের মৃত্যুর সময়ে করুণাময়ী গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনি বাপের বাড়ীতে—তাঁহার ভাই শ্যামকিশোর সেনের আশ্রয়ে ভাঙ্গাবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানেই তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। ইনিই রজনীকান্তের পিতামহ গোলোকনাথ সেন।

পিতৃহীন বালক গোলোকনাথ মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। সহদেবপুরে আর ফিরিয়া গেলেন না। তাঁহার মাতুল শ্যামকিশোর সেন মহাশয় গোলোকনাথকে একটি বাড়ী ও কিছু জমি দান করেন। তাহাতেই অতিকষ্টে গোলোকনাথের সংসার চলিত। তাঁহারা মাটির পাত্রই ব্যবহার করিতেন ; কারণ, তাঁহাদের তৈজসপত্র ছিল না। অনেক সময় তাঁহাকে কলাপাতে ভাত খাইতে হইয়াছিল। অত্যন্ত গরীব বলিয়া তিনি ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সহদেবপুর গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম অন্নপূর্ণা দেবী। গোলোকনাথের দুই পুত্র—গোবিন্দনাথ ও গুরু-

সেন-বাড়ীর বহির্দ্দেশ—ভাঙ্গাবাড়ী
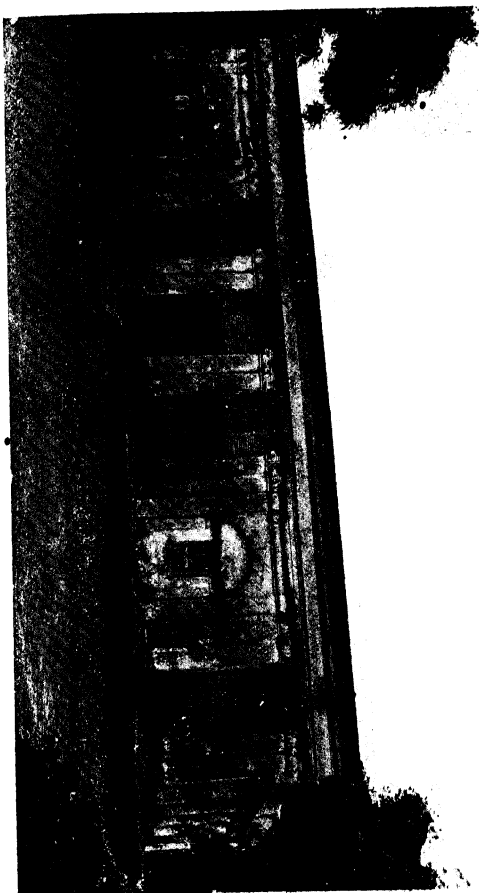
প্রসাদ। যদিও গোলোকনাথ নিজে ভালরূপ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই, তথাপি শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি ছেলেদের রীতিমত লেখাপড়া শিখাইতে ত্রুটি করেন নাই। গোবিন্দনাথ বড় ও গুরুপ্রসাদ ছোট। এই গুরুপ্রসাদই কবি রজনী-কান্তের পিতা।

ছেলেবেলায় মামাতো-ভাই রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের রাজসাহীর বাসায় থাকিয়া দুই ভাইকে অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সময়ে সময়ে বালিস অভাবে ইটে চাদর জড়াইয়া, তাহাতেই মাথা রাখিয়া তাঁহাদিগকে ঘুমাইতে হইয়াছে। তখনকার মত সস্তাগণ্ডার দিনেও তাঁহাদের ভাগ্যে সপ্তাহে একদিনের বেশী ঘি জুটিত না। বড় ভাই গোবিন্দনাথ, রংপুর কালেক্টারীর সেরেস্তাদার কাশীনাথ তালুকদার মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার পরে একজন মৌলবীর নিকট পার্শী পড়েন। তারপর তিনি রাজসাহীতে সাত টাকা মাহিনায় চৈতন্যকৃষ্ণ সিংহ নামক একজন উকীলের মুহুরী নিযুক্ত হন। ক্রমে নিজের একান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি উকীল হইয়াছিলেন। সে সময়ে লোকে জজসাহেবের অনুগ্রহে উকীল হইতে পারিত। তাঁহার নিকট আইন-সংক্রান্ত সামান্য রকমের একটি পরীক্ষা দিলেই লোকে ওকালতি করিবার সনন্দ পাইত। বস্তুতঃ সে সময়ে বু দ্ধিমান্ লোকের পক্ষে উকীল হওয়া কঠিন ছিল না।

গোবিন্দনাথ খুব পরিশ্রম করিতেন, তাঁহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি অনেক জটিল মোকদ্দমা খুব সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এ জন্য অল্পদিন-মধ্যেই ওকালতিতে তাঁহার বিলক্ষণ উন্নতি হয়। সে সময়ে রাজসাহীর আদালতে তাঁহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকীল বড় ছিল না। তিনি ইংরাজি জানিতেন না, কিন্তু পার্শী ও সংস্কৃতে

তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তখন উর্দ্দু ভাষায় আদালতের কাজ চলিত। মোকদ্দমা গুছাইয়া বলিবার ভঙ্গী এবং তাঁহার যুক্তি ও তর্কের এমনই প্রভাব ছিল যে, অনেক সময় হাকিমকে তাঁহার মতে মত দিতে হইত। প্রতি মোকদ্দমাতেই তিনি প্রায় জয়লাভ করিতেন। ফলে তাঁহার ব্যবসায়ে এত দূর পসার-প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, দেশের ধনি-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত ও সম্মানের চক্ষে দেখিত। এ সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যখন তিনি মহাসমারোহে দানসাগরের অনুষ্ঠান করেন, তখন নাটোর ছোট তরফের প্রসিদ্ধ রাজা ৺চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ভাঙ্গা-বাড়ী গ্রামে শুভাগমন করেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করান। এমন কি, শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি নাকি নিজ হাতে কাঙ্গালী বিদায় পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত গোবিন্দনাথ ওকালতি করেন এবং এই আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে অর্থ তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই,—পরের উপকারে ও ধর্ম্মকর্ম্মে তাহা ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। দারিদ্র্য কি, তাহা তিনি ছেলেবেলায় বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি অন্নদানে কাতর ছিলেন না। তাঁহার রাজসাহীর বাসায় দু'বেলা পঁচিশ ত্রিশ জন ছাত্রের ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির পাত পড়িত।

ভাঙ্গাবাড়ীতে যেখানে গোলোকনাথের ভাঙ্গা কুঁড়ে ছিল, সেই পৈতৃক ভিটার উপর গোবিন্দনাথ রাজবাড়ীর মত জমকালো বাড়ী করেন। বাড়ীটি দুই মহল। বাহিরের মহলে সুন্দর ও সুবৃহৎ ঠাকুর-দালান; সেই ঠাকুর-দালানে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। তাঁহাদের

সেই ঠাকুর-দালান ও বাহিরের বাড়ীর ছবি দেওয়া গেল, দেখিলেই বোধ হইবে যে, উহা একজন বড় মানুষের বাড়ী বটে।

গোবিন্দনাথের দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ভুবনময়ী, দুর্গা-সুন্দরী ও নিস্তারিণী,—এই তিন মেয়ে এবং বরদাকান্ত, কালীকুমার ও উমাশঙ্কর,—এই তিন ছেলে। বড় মেয়ে ভুবনময়ী নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন; ইনি আজও জীবিত আছেন এবং ভাঙ্গাবাড়ীতে বাস করিতেছেন। ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে এখন কেবল কবির বাড়ীতেই যে দুর্গাপূজা হয়, সে শুধু দেবী ভুবনময়ীর আন্তরিক চেষ্টা ও আগ্রহে। একবার কবির সংসারে টাকাকড়ির অভাব হইলে, ছেলেরা পূজা বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন ভুবনময়ী আকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, "আগে তোরা আমার গলায় ছুরী দে, তারপর যা হয় করিস্। আমার ত মরণ নেই। বাবার এই প্রকাণ্ড পূজার দালান কেমন ক'রে খালি দেখ্‌ব?" ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ দ্বারকানাথ রায়ের সহিত গোবিন্দনাথের মেজ মেয়ে দুর্গাসুন্দরীর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্প দিন পরেই তিনি স্বামীর সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি এখন জীবিত নাই। ইঁহার চারি পুত্র—বড় কাকিনা রাজষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়; মেজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এ; সেজ সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (মিঃ জে এন্ রায়); ছোট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়। গোবিন্দনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী রাধারমণী দেবী গত ১৩২১ সালে মারা গিয়াছেন। সু-লেখিকা শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী ইঁহার একমাত্র কন্যা। ইনি বেশ ভাল বাঙ্গালা লিখিতে পারেন। তাঁহার যে বাঙ্গালা লেখায় এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছে—সে কেবল তাঁহার ভাই রজনীকান্তের গুণে। ইঁহার রচিত 'প্রীতি ও পূজা', 'খোকা', 'গল্প', 'ভাব ও ভক্তি', 'দুটী কথা'

এবং আর আর বই বাঙ্গালা সাহিত্যে যথেষ্ট আদর পাইয়াছে। ইনি প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৈলাশগোবিন্দ দাসগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের স্ত্রী।

গোবিন্দনাথের ছোট ভাই গুরুপ্রসাদ বিশেষ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। দাদার মত তাঁহারও পার্শী ও সংস্কৃতে বিশেষ দখল ছিল। তা ছাড়া তিনি ইংরাজিও বেশ জানিতেন। দাদার সাহায্যে ঢাকা হইতে ওকালতি পাশ করিয়া তিনি সদরালার (মুন্সেফ) পদ প্রাপ্ত হন। তিনি কাল্না, কাটোয়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে মুন্সেফী করেন। পরে বরিশালে তিনি সব্-জজ হন এবং কৃষ্ণনগরে বদলি হইয়া পেন্সন্ পান।

কাল্না ও কাটোয়া বৈষ্ণব-প্রধান জায়গা। ঐ দুই জায়গায় তিনি যখন মুন্সেফ ছিলেন, তখন সেখানকার বৈষ্ণবগণের সঙ্গে থাকিয়া তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনদিগের মনোহর পদাবলী বিশেষভাবে পাঠ ও আলোচনা করিতেন এবং এই আলোচনায় বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগের ফল সাধনা, আর সেই সাধনার ফল "পদচিন্তামণিমালা"—ব্রজবুলির প্রায় সাড়ে চারি শত হীরামোতিতে এই পদচিন্তামণিমালা গাঁথা। কাল্নার প্রসিদ্ধ সিদ্ধ বৈষ্ণব ভগবান্‌দাস বাবাজী মহাশয় গ্রন্থের এই নাম দেন এবং শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ভাগবত প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় ইহার ভূমিকা লেখেন।

ভাঙ্গাবাড়ীর সেন মহাশয়েরা শাক্ত। তাঁহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎ-সবের সময়ে পাঁঠাবলি হইত। গুরুপ্রসাদের দাদা গোবিন্দনাথ শাক্ত ছিলেন। তাঁহার ভিতরও যেমন, বাহিরও তেমন ছিল—তাঁহার প্রাণে যেমন ভক্তি ছিল, বাহিরে তেমনি অনুষ্ঠানও ছিল। এ দিকে

কবির জনক

স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন

সেন-পরিবারের ঠাকুরদালান
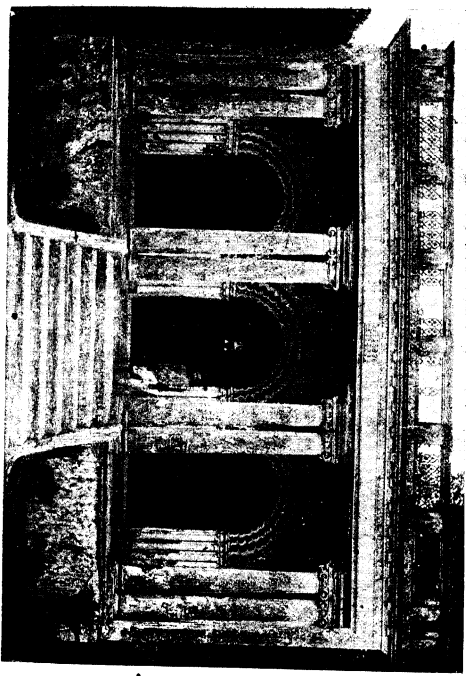
গুরুপ্রসাদ দাদাকে খুব ভক্তি করিতেন, এমন অবস্থায় দাদার ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহার মনের বৈষ্ণব ভাব তিনি বাহিরে বড় একটা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তিনি দাদার চোখের বাহিরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধনা করিতেন। দাদার প্রতি এরূপ অচলা ভক্তি আজিকার দিনে বিরল হইলেও, সে সময়ে দুর্ল্লভ ছিল না।

গুরুপ্রসাদ গান বড় ভালবাসিতেন। নিজে কাহারও নিকট গীতবাদ্য শেখেন নাই, কিন্তু গান শুনিতে ও গাহিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রাজসাহীর ধর্ম্মসভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রসিদ্ধ গায়ক রাজনারায়ণের চণ্ডী-যাত্রা ও কীর্ত্তন গান হইত। চণ্ডীর গান শুনিয়া তাঁহার 'ভাব' লাগিত এবং তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বার বার রাজনারায়ণের সহিত কোলাকুলি করিতেন। কীর্ত্তনে হরিনাম শুনিয়াও তাঁহার সেইরূপ 'ভাব' লাগিত।

১২৮৩ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার "পদচিন্তামণিমালা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের পদাবলীও তিনি সুর করিয়া গান করিতেন। কোনও কোনও সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িত। বালক রজনীকান্ত পিতার এইরূপ ভাবাবেশ দেখিতেন এবং তাঁহার ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিত। তাই পিতার গানের ও ভাবের প্রভাবে তিনি সুগায়ক ও সুকবি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পদাবলী-প্রকাশের কিছু দিন পরে বড় আনন্দে গুরুপ্রসাদ দাদাকে বই দেখাইতে গেলেন। কিন্তু বই দেখিয়া গোবিন্দনাথ বলিলেন, "বই ভাল হয়েছে; কিন্তু এতে মায়ের নাম কৈ?" দাদার অনুযোগ ছোট ভাইয়ের প্রাণে বেশ লাগিল। ভ্রাতৃভক্ত গুরুপ্রসাদ শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ব্রজবুলিতে "অভয়া-বিহার" নামক

আর একখানি কাব্য লিখিলেন। ইহা গুরুপ্রসাদের শেষ বয়সের লেখা ; ইহাতে দক্ষ-প্রজাপতি-গৃহে সতীর জন্ম হইতে দক্ষ-যজ্ঞে তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বইখানি তিনি বা রজনীকান্ত কেহই প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।*

গুরুপ্রসাদ অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কোন উৎসবের সময়ে তাঁহার বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। তিনি তাঁহাদের পা ধোয়াইবার জন্য আসিলে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বলিলেন—"বাড়ীতে এত দাসদাসী থাকিতে আপনি কেন?" তাহাতে গুরুপ্রসাদ বলেন, "আমি সদরালা বটে, কিন্তু এখানে আপনাদের দাস।"

গোবিন্দনাথের মেজাজ একটু কড়া ছিল। রাজসাহীতে একজন নূতন মুন্সেফ বদ্‌লি হইয়া আসিলে, গোবিন্দনাথ একদিন তাঁহার এজ্‌লাসে হাজির হন। কি কথায় হাকিম ও উকীলের মধ্যে একটু বচসা হয়। গোবিন্দনাথ হঠাৎ চটিয়া বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়, আপনার সহিত মিছে তর্ক ক'রতে চাই নে। আপনার মত কত মুন্সেফ আমার তামাক সেজে দেয়।" তিনি এই কথা বলিয়াই এজ-লাস হইতে বাহির হইয়া যান। পরে গুরুপ্রসাদ ছুটীর সময়ে রাজ-সাহীতে আসিলে, গোবিন্দনাথ ঐ মুন্সেফ বাবুকে সাদরে আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। উক্ত মুন্সেফ বাবু নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ গোবিন্দ-নাথের বাড়ীতে আসিলে, তাঁহার সমক্ষে গোবিন্দনাথ গুরুপ্রসাদকে

---

* এই গ্রন্থের দুইখানি কাপি ছিল; ইহার একখানি রাজসাহীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই মহাশয়ের নিকট ছিল, কিন্তু ভূমিকম্পের সময়ে সেখানি নষ্ট হইয়া যায়। অপরখানি অদ্যাপি নাটোরের উকীল শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর রায় মহাশয়ের নিকট আছে।

ডাকিয়া তামাক সাজিতে বলিলেন। মুন্সেফ বাবু গুরুপ্রসাদকে চিনিতেন; সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়াই গোবিন্দনাথের সে দিনকার কথার ভাব বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে গোবিন্দনাথের কথার রস ততটা না ফুটিলেও, গুরুপ্রসাদের ভ্রাতৃভক্তির পরিচয় অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মাহিনার টাকা পাইবামাত্র গুরুপ্রসাদ সমস্ত টাকা দাদার নিকট পাঠাইয়া দিতেন, পরে তাঁহার নিকট হইতে দরকার-মত বাসা-খরচ চাহিয়া লইতেন। দুই ভাইয়ের যিনি যাহা রোজগার করিতেন, তাহাতে উভয়েরই সমান অধিকার ছিল। যাহা কিছু জমিজমা গোবিন্দনাথ করিয়াছিলেন, তাহা উভয়েই ভোগ করিতেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে পাছে পুত্রপৌত্রের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি লইয়া কোনরূপ বিবাদ-বিসংবাদ হয়, এই ভয়ে গোবিন্দনাথ সমস্ত বিষয় দুই সমান ভাগে ভাগ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন গোবিন্দনাথের তিন ছেলে ও গুরুপ্রসাদের দুই ছেলে। তাই গুরুপ্রসাদ এই প্রকার বিভাগে আপত্তি করিয়া পাঁচ জনের জন্য সম্পত্তি সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে দাদাকে অনুরোধ করেন। তাঁহারই কথামত সমস্ত সম্পত্তির সেইমত উইল করা হইয়াছিল।

রজনীকান্তের জ্যেঠা ও বাপ দুইজনেই ভাল লোক ছিলেন এবং এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কিরূপ সম্প্রীতি ছিল, এই সকল ঘটনা হইতেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। রজনীকান্তও স্বলিখিত অসম্পূর্ণ আত্ম-জীবন-চরিতে পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"আমার পিতা কিছু স্থির, ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, বলিতেন,

'রোস, বিবেচনা করিয়া দেখি।' পিতৃজ্যেষ্ঠের প্রকৃতিতে তেজস্বিতা, অহঙ্কার, হঠকারিতা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইত। একজন কোমল, নম্র, 'মাটির মানুষ'; একজন উদ্ধত, মানোন্নত, গর্ব্বী। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতি 'আজন্ম-পরিবর্দ্ধিত সখ্যে' মিলিয়া-মিশিয়া কোমল ও কঠোর, বিনয় ও গর্ব্ব, গম্ভীরতা ও ঔদ্ধত্য—কেমন করিয়া নির্ব্বিরোধে ও স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতে পারে, তাহার উজ্জ্বল ও মনোহর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে।

"উভয়েই অন্নবিতরণে ও বিপন্নের সাহায্যে অর্থদান করিতে মুক্ত-হস্ত ছিলেন। ধর্ম্ম-প্রবণতা, ঈশ্বরনিষ্ঠা, দুঃস্থের প্রতি করুণা ও দান, ইহার উপর অসামান্য প্রতিভা—এই সমস্ত দুর্লভ গুণে উভয় ভ্রাতাকে ভগবান্ ভূষিত করিয়াছিলেন; এবং অল্প দিনেই তাঁহারা এমন যশস্বী হইয়াছিলেন যে, রাজসাহী ও পাবনা, 'গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ-ময়' হইয়াছিল। এখনও লোকে বলে 'গোবিন্দ সেনের ভাঙ্গাবাড়ী'। *

(প্রতিভা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৬৬-৬৭ পৃঃ)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাঙ্গাবাড়ীর সেন-গৃহে নানা পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান হইত। ৺ দুর্গা পূজার সময়ে যখন আরতির বাজনা বাজিত, তখন দুই বৃদ্ধ অঙ্গনে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন ও দশপ্রহরণ-ধারিণী দশভুজার মহিম-মণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে দুই ভ্রাতার বুকে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগ্‌বাটী নামক গ্রামে রজনীকান্তের মাতুলালয়। তাঁহার মাতুল-বংশেরও নাম-ডাক বড় কম ছিল না। তাঁহার মাতামহ হরিমোহন সেন মহাশয় রঙ্গপুরে চাকরী করিতেন। তাঁহার

* এখানে 'ভাঙ্গাবাড়ী,' ভগ্ন অট্টালিকা নহে, "ভাঙ্গাবাড়ী" গ্রাঃ
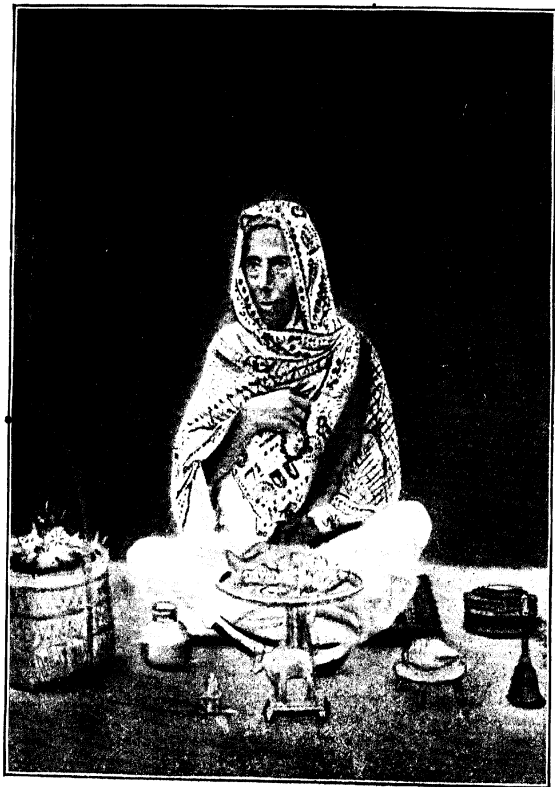
কবির জননী

স্বর্গীয়া মনোমোহিনী দেবী

মাতুল পঞ্চানন সেন মহাশয়ের বাঙ্গালায় বেশ দখল ছিল। (ইনি হরলাল নামেও অভিহিত হইতেন)। তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত পুটিয়ার চার-আনির রাণী মনোমোহিনী দেবীর বিপুল সম্পত্তি পরিদর্শনের ভার পান। তিনি ছোট ছোট কবিতা রচনা করিতেন।

রজনীকান্তের জননী মনোমোহিনী দেবী গুণবতী, তেজস্বিনী ও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন, অত বড় পরিবারের গৃহস্থালীর কাজ তিনি সুন্দররূপে ও পরিপাটীভাবে করিতেন। ভাসুরের ছেলে-মেয়েদের তিনি এতই আদর-যত্ন করিতেন যে, তাহাদের মাতার অভাব তাহারা বুঝিতেই পারিত না।

রন্ধন-কার্য্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী রন্ধন-নৈপুণ্যের জন্য তাঁহাকে 'রান্নার জজ' বলিতেন। তাঁহার মত পুলিপিঠা তৈয়ার করিতে প্রায় কেহ পারিত না। পাথরের উপর ছাঁচ কাটিতে ও ছবি আঁকিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি নারিকেলের ঝাড়, রথ, পদ্ম, চাঁপা ইত্যাদিও তৈয়ার করিতে পারিতেন। কবি-জননী রন্ধনে সিদ্ধহস্ত ও শিল্পকলায় দক্ষ ছিলেন,—এই সকল কথার অবতারণা একটু অপ্রাসঙ্গিক ঠেকিতেছে কি? রন্ধন-কার্য্য উড়ে বামুনের হাতে, শিশু ও গৃহস্থালী ঝিয়ের হাতে, আর বাড়ীর নিত্যসেবা বেতনভোগী পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করিয়া আমরা আজ কাল ভোগ-বিলাসে বিভোর! ফলে গৃহের লক্ষ্মীরা রান্না ভুলিয়া গিয়াছেন, রন্ধনশালায় যাওয়াই এখন বিড়ম্বনায় দাঁড়াইয়াছে। ঝিয়ের উপর, দাইয়ের উপর শিশুর লালন-পালন-ভার পড়িয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়া ও ইন্‌ফেন্‌টাইল লিভারে দেশ ভরিয়া গিয়াছে! কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন ঘরে ঘরে প্রত্যেক মহিলাই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবারবর্গকে আহার করাইতেন। পল্লীতে কোন গৃহে

ক্রিয়াকাণ্ড হইলে, আনন্দ-উৎসব হইলে পাড়ার পাঁচ জন প্রাচীনা আসিয়া রন্ধন-কার্য্যে যোগ দিতেন। রন্ধনে দ্রৌপদী-রূপে হাসি-মুখে হাজার লোকের রন্ধন করাতে তাঁহাদের শ্রান্তি হইত না, ক্লান্তি হইত না, বিরাগ থাকিত না, বিশ্রাম থাকিত না। সে কি আনন্দ, কি উৎসাহ! আবার অনেক প্রবীণা বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জন রন্ধনে পারদর্শিনী বলিয়া গ্রামে বিখ্যাত ছিলেন। রায়েদের বড় গিন্নী মধুর শুক্তানি রাঁধিতে পারিতেন, মুখুজ্যেদের মেজ-বৌ ইঁচড়ের ডালনা এমন চমৎকার পাক করিতেন যে, লোকে বলিত, তিনি 'গাছ-পাঁঠা' রাঁধিয়াছেন।—এমন প্রশংসাপ্রাপ্ত রন্ধননিপুণা রমণী তখন দুই দশ জন প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যাইত। পাড়ায় নূতন জামাই আসিলে, গ্রামের শিল্প-কলানিপুণা মহিলাগণ একত্র হইয়া নানা আয়োজনে জামাইকে ঠকাইবার ব্যবস্থা করিতেন। সোলার অন্ন, বাঁশের গেঁড়োর মাছের মুড়ি প্রভৃতি সামগ্রী এখন ইতিহাসের সামিল হইয়াছে। তেমন সুন্দর চিত্রবিচিত্র-পূর্ণ আলপনা, লতাপাতা-শোভিত কাঁথা, মনোরম স্ত্রী-আচারের "ছিরি", নানাবিধ খয়েরের খেলনা, মোমের রকমারি ফুলফল আর বড় একটা দেখিতে পাই না। এই ক্রুরুষ-কার্পেটের যুগে, সূতা-ফিতা-পশমের প্লাবনে পল্লীর সেই সুকুমার নারী-শিল্প কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

মনোমোহিনী দেবী বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিতেন এবং তাঁহার হাতের লেখাও সুন্দর ছিল। তিনি কাব্য পড়িতে ভালবাসিতেন। কবিবর হেমচন্দ্রের তিনি একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কালীকৈবল্যদায়িনী, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, কোকিল-দূত, সীতার বনবাস, সতী নাটক, জানকী নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল। অনেক সময়ে তিনি পুত্র

রজনীকান্তের সহিত বাঙ্গালা নানা গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিতেন। বাল্যকালেই তিনি পুত্রের হৃদয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতির বীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর নিজস্ব সনাতন ভাব-ধারাকে বালকের হৃদয়ের খাতে প্রবাহিত করিয়া দিবার চেষ্টাও তিনিই করিয়াছিলেন। তাই উত্তর কালে আমরা খাঁটি স্বদেশী কবি রজনীকান্তকে পাইয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি—তাঁহার পরমার্থ-সঙ্গীত শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এগুলি মহাজনদিগের চিরাচরিত ভাব-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মনোমোহিনী দেবীর বৈধব্য-জীবনও আদর্শস্বরূপ। শিবপূজা ও ত্রিসন্ধ্যার উপর ভক্তিময়ী মনোমোহিনী দেবীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি প্রতিদিন বিধিমতে শিবপূজা করিতেন, কোন অনিবার্য্য কারণ বা কোন প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাঁহাকে কোন দিন সংক্ষেপে পূজা শেষ করিতে দেখা যাইত না। যখন তিনি জ্বর ও হাঁপানিতে শয্যাগত থাকিতেন, তখনও শিবপূজা, ইষ্টদেব-পূজা ও গুরুপূজা যথারীতি করিতেন। সমস্ত দিন জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিলেও সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি স্নান করিয়া পূজায় বসিতেন। পূজায় বসিয়া জপ আরম্ভ করিলে তিনি আহার-নিদ্রা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতেন; বাহ্য জগতের কর্ম্ম-কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না।

তাঁহার দুই কন্যা ও তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীপ্রসাদ দুই বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর তাঁহার এক কন্যা জন্মে; তাঁহার নাম ত্রিনয়নী, অল্প বয়সেই ইনি এক কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যে মাতৃহারা শিশুও বৃন্তচ্যুত কোরকের মত অকালে শুকাইয়া যায়। রজনীকান্ত তাঁহার তৃতীয় সন্তান। রজনীকান্তের পরে ক্ষীরোদ-

বাসিনী নামে তাঁহার আর একটি কন্যা হয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমার ঘোড়া-চরা গ্রামনিবাসী রোহিণীকান্ত দাশ গুপ্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

মনোমোহিনীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান জানকীকান্ত। এই জানকীকান্ত ও গোবিন্দনাথের কন্যা অম্বুজাসুন্দরী, উভয়ে সমবয়স্ক ছিলেন।

রজনীকান্ত এই নিষ্ঠাবান্, আদর্শ হিন্দু-পরিবারে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হৃদয়বান্, পিতা ভক্তিমান্ এবং মাতা ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। এই পারিবারিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার সহৃদয়তা ও ভক্তি এবং মাতার ধর্ম্মশীলতা রজনীকান্তের চরিত্রে যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে তিনি যে উত্তরকালে কেবল বংশের মুখই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা নহে,—তিনি দেশ ও জাতির গৌরবস্বরূপও হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শৈশব ও বাল্যজীবন

শৈশব হইতেই রজনীকান্তের আকৃতিতে এমন একটি লাবণ্য পরিলক্ষিত হইত, যাহার প্রভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিও প্রথম দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত রজনী-কান্তের এই লোকচিত্তাকর্ষণী শক্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

রজনীকান্ত যখন ভাঙ্গাবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা কাটোয়ার মুন্সেফ এবং জ্যেষ্ঠতাত রাজসাহীর উকিল। তাঁহার জন্মের কিছু পরেই তাঁহার পিতা কাটোয়া হইতে কাল্‌নায় বদলি হন এবং রজনীকান্তও তাঁহার জননীর সহিত কাল্‌নায় গমন করেন। তিনি শৈশবের অধিকাংশ সময়ই জননীর সহিত পিতার বিভিন্ন কর্ম্ম-স্থানে অতিবাহিত করেন।

বাক্‌স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ অঞ্চলের ভাষা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। শৈশবের অর্দ্ধোচ্চারিত শব্দে রজনীকান্ত মাত্র যখন আত্মীয়-স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময়ে ৺ পূজার ছুটীতে একবার তাঁহার পিতা ভাঙ্গাবাড়ীতে আগমন করেন। ৺মহাপূজা উপলক্ষে তাঁহাদের বাড়ীতে মহা ধূমধাম ও বহু লোকের সমাগম হইত। প্রতি পূজাতেই তাঁহাদের গৃহ পাঁচালী, কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে সজীব হইয়া উঠিত। রজনী-কান্তের মুখে অর্দ্ধোচ্চারিত নবদ্বীপের ভাষা শুনিবার জন্য বহু নর-নারী ব্যাকুল হইত। "অমৃতং বালভাষিতম্" এই বাক্যের সার্থকতা

রজনীকান্ত কর্ত্তৃক শৈশবেই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রিয়-দর্শন শিশু যত দিন গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদের পল্লী নানা শ্রেণীর নরনারী-সমাগমে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইত।

তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের উদারতার পরিচয় শৈশবেই সূচিত হইয়াছিল। কেহ কোলে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, পরিচিত-অপরিচিত-নির্ব্বিশেষে সকলের কোলেই রজনীকান্ত হাসিমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন।

তাঁহার উত্তর-জীবনের সঙ্গীতপ্রিয়তা, আবৃত্তিপটুতা ও রহস্যাভিনয়-দক্ষতার অঙ্কুর অতি শৈশব হইতেই দেখা দিয়াছিল। চারি বৎসরের নয়নাভিরাম শিশু যখন জ্যেষ্ঠতাতের ক্রোড়ে বসিয়া হাততালি দিতে দিতে মধুর বালকণ্ঠে গাহিতেন,—

"মা, আমায় ঘুরাবি কত
চোক-ঢাকা বলদের মত—"

তখন সকলে মুগ্ধনেত্রে শিশুর স্বভাব-সরল মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আর তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, একাগ্রচিত্তে গানের সুর ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার এরূপ অনন্যসাধারণ আসক্তি ছিল যে, গান শুনিতে শুনিতে তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। এই আসক্তিই ক্রমে অনুকরণ, অভ্যাস ও অনুশীলন সাহায্যে শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আর তাহারই ফলে রজনীকান্ত এক দিন অক্লান্ত ও সুকণ্ঠ গায়করূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছিলেন।

যখন সবেমাত্র তাঁহার অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে, তখনই তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের নানা অংশ লোকমুখে শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া-

ছিলেন। শিশুর মুখে আবৃত্তি শুনিবার জন্য ভাঙ্গাবাড়ীর সেন-গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগম হইত। জ্যেষ্ঠতাত বা পিতার কোলে বসিয়া শিশু অসঙ্কোচে রামায়ণ-মহাভারতের নানা অংশ আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। শিশুর স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তাঁহার কণ্ঠস্থ অংশের প্রথম চরণ ধরাইয়া দিলেই তিনি অনায়াসে অবশিষ্ট অংশ আবৃত্তি করিতেন।

এই সময়ে রজনীকান্ত হস্তপদাদি অবয়বের ইংরাজি প্রতিশব্দ কণ্ঠস্থ করেন। শারদীয়া পূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপে দশ-প্রহরণ-ধারিণী দশ-ভুজা ও অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিমা দেখিয়া ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব সম্মিলনে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তিনি দেব-দেবীগণের রূপাদির যে ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা অপূর্ব্ব। তৎকালে যাঁহারা সেই ব্যাখ্যা শুনিবার সুবিধা পাইতেন, তাঁহারাই বিস্মিত হইয়া উহা উপভোগ করিতেন।

পুত্রের এই আবৃত্তি-শক্তি লক্ষ্য করিয়া গুরুপ্রসাদ বিদ্যাপতি, চণ্ডী-দাস ও স্বরচিত পদাবলী তাঁহাকে ধীরে ধীরে অভ্যাস করাইতেন এবং আবৃত্তি করিবার প্রথা ও প্রণালী শিক্ষা দিতেন।

অনুশীলন-ফলে তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠে। ৩১এ আষাঢ় (১৩১৭) তারিখে তাঁহার হাসপাতালের সেবাপরায়ণ সহচর ও সখা, মেডিকেল কলেজের তাৎকালীন ছাত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বক্সীকে রজনীকান্ত বলিয়াছিলেন,—"বই একবার পড়্‌লে প্রায় মুখস্থ হ'ত, * * * * আমি তোমাকে একটা পরখ এখনও দিতে পারি। যে কোন একটা চারি লাইনের সংস্কৃত শ্লোক (যা আমি জানি না) তুমি একবার ব'ল্‌বে, আমি immediately reproduce (তৎক্ষণাৎ আবৃত্তি) কর্‌ব। একটুও দেরী হবে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাংসারিক অবস্থা ও পারিবারিক দুর্ঘটনা

বাল্যকালে রজনীকান্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েন নাই। তিনি রাজসাহীতে আসিয়া একেবারে বোয়ালিয়া জেলা স্কুলে (বর্ত্তমান রাজসাহী কলেজিয়েট্ স্কুল) ভর্ত্তি হন।

বাল্যে তাঁহার স্বভাব উদ্ধত ও প্রকৃতি অস্থির ছিল, কাহাকেও তিনি ভয় করিতেন না। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—"আমি বাল্যকালে বড় অশান্ত ছিলাম।" ঘুড়ী-লাটাই, মার্ব্বেল ও ছিপ্-বড়সী লইয়া তিনি প্রায় সমস্ত দিনই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার ছোট ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী যদি কোন দিন তাঁহাকে বলিতেন,—"দাদা, প'ড়ছ না কেন? বাবা যে মার্‌বেন।" নির্ভীক রজনীকান্ত হাসিয়া উত্তর করিতেন,—"তার বেশী আর ত কিছু কর্‌বেন না?" যাহা হউক, এই উদ্দাম চপলতা ও অবাধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যেও পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা কালীকুমারের বিশেষ চেষ্টায় তিনি লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত প্রতিবেশীর গাছ হইতে ফুল-ফল চুরি করিয়া সহযোগীদিগকে বিলাইয়া দিতে আনন্দ লাভ করিতেন, পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়া তাহাদের শাবক লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসিতেন। তরলমতি শিশুর এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া, ভাগবতপ্রধান গুরুপ্রসাদ মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃখ অনুভব করিতেন। তিনি পুত্রকে কত বুঝাইতেন, কত শাসন ও তিরস্কার করিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না—

জীবে দয়া যে মানবের সারধর্ম্ম, এই সরল সত্য বালকের হৃদয়ে তখনও রেখাপাত করিতে পারে নাই।

খেলিতে খেলিতে রজনীকান্ত বহু বার গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। গাছ হইতে পড়িয়া কয়েকবার তাঁহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসমসাহস বালক কিছুতেই ঐ সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হন নাই। পুত্রের এই চঞ্চল স্বভাব লক্ষ্য করিয়া পিতা শাসন ও তিরস্কারে তাহা সংশোধন করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন্ ক্রমেই তিনি রজনীকান্তকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না।

তিনি কখনও বেশী পড়িতেন না, যাহা পড়িতেন, তাহাই অল্প সময়ে আয়ত্ত করিয়া লইতেন। সারা বৎসর এক-রকম না পড়িয়া এবং পরীক্ষার সময়েও অতি অল্প দিন মাত্র পড়িয়া তিনি সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া গুরুপ্রসাদ স্নেহার্দ্রস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিতেন,—"দেখ্, তুই না প'ড়ে এত পারিস্, পড়্লে না জানি কত পার্বি।" ১৩১৭ সালের ৩১এ আষাঢ় তারিখে রোজনাম্চায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—"তার পর দাবা, হারমোনিয়ম, তাস, ফুটবল—এই নিয়ে কাটিয়েছি। যে বার বি এ পাশ হ'লাম, সে বার বাটীতে ব'সে কেবল হিন্দুহোষ্টেলেরই ৮০।৮২ খানা পোষ্টকার্ড পাই—যে এমন আশ্চর্য্য পাশ।.........আমি সব নষ্ট ক'রে ফেলেছি, হেমেন্দ্র! আমি যদি প'ড়্তাম, তবে আমি স্পর্দ্ধা ক'রে বল্তে পারি যে, কেউ আমার সঙ্গে compete কত্তে (সমকক্ষ হইতে) পারত না। আমি গান গেয়ে হেসে নেচে পাশ হয়েছি। I was never a book-worm, for I was blessed with very brilliant parts. (আমি কখনই বইএ-মুখে থাকিতাম না, কারণ আমার মেধা ও প্রতিভা ভালই ছিল)।"

রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতৃদ্বয় বরদাগোবিন্দ সেন বি এল্ ও কালীকুমার সেন এম্ এ, বি এল্ রাজসাহীতে ওকালতি করিতেন, কালীকুমারের নিকট রজনীকান্ত পাঠাভ্যাস করিতেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ছোট ছোট কবিতা এবং "মনের প্রতি উপদেশ" নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এই পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে আমার স্বর্গীয় বন্ধু পণ্ডিত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কাছ হইতে কালীকুমারের রচিত একটি কবিতার চারি চরণ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"পলিত হইলে কেশ
ধরিয়ে বরের বেশ
শ্বশুরের বাড়ী যাব হইয়ে জামাতা,
এই কি অদৃষ্টে মোর লিখেছে বিধাতা ?"

অন্য লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রজনীকান্ত কালীকুমারের নিকট কবিতা রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কালীকুমারই রজনীকান্তের কাব্য-গুরু; তিনিই কবির প্রাণে কাব্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে ও সহায়তায় বাল্যকাল হইতে রজনীকান্ত কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

ইংরাজ কবি আলেকজেণ্ডার পোপ অতি শৈশবে আধ-আধ বাণীতে ছড়া কাটিতেন—

"As yet a child, nor yet a fool to fame,
I lisp'd in numbers, for the numbers came."

এ কথা আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি; কেন না, তিনি ইংরাজ

কবি। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী কবি রজনীকান্তও অতি শিশুকাল হইতে মুখে মুখে পদ্য রচনা করিতেন, ইহা কি সকলের বিশ্বাস হইবে?

বালক ঈশ্বর গুপ্ত যেমন বলিয়াছিলেন,—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
তাই তাড়িয়ে কল্‌কাতায় আছি।"

সেইরূপ বাল্যকালে রজনীকান্ত, তাঁহার জনৈক পূজনীয়া মহিলাকে লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীশ্রীযুতা।
আমার জন্য এন এক জোড়া জুতা॥"

এই সময় বরদাগোবিন্দের ওকালতিতে খুব পসার, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। কালীকুমারের আয়ও মন্দ ছিল না। তাই বৃদ্ধ গোবিন্দনাথ বিষয়-কর্ম্মের ভার বরদাগোবিন্দের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, রাজসাহী ছাড়িয়া ভাঙ্গাবাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গুরুপ্রসাদ তখন বরিশালের সবজজ্। কিছু দিন পরে তিনি কৃষ্ণনগরে বদ্‌লি হইলেন এবং উৎকট উদরাময় ও বাতরোগে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি ছুটী লইয়া রাজসাহী গমন করিলে, বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমার উভয়েই তাঁহাকে কহিলেন,—"ঠাকুর-কাকা, আমরা দু'ভাই ভগবানের ইচ্ছায় দু'পয়সা আনিতেছি, আর চিন্তা কি? এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া চাকরি করিলে আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে, আপনি অবসর গ্রহণ করুন।" তদনুসারে ১২৮১ সালে গুরুপ্রসাদ পেন্সন লইলেন। তখন রজনীকান্তের বয়স প্রায় দশ বৎসর।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সময়েই এই সুখী ও উন্নতিশীল পরিবারের উপর কালের কুটিল দৃষ্টি নিপতিত হইল। ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথ

রুদ্ধ হইয়া, কৃতী পুরুষগণের অবনতির পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। ১২৮৪ সালে (১৮৭৮ খৃঃ) অকস্মাৎ বরদাগোবিন্দের কলেরারোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে কনিষ্ঠ কালীকুমার এত দূর মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন যে, সেই রাত্রিতে হৃদ্‌যন্ত্রের গতি বন্ধ হইয়া তিনিও অকালে মারা যান। বরদাগোবিন্দের স্ত্রী দুই বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, কালীকুমারের পত্নী আজিও জীবিত আছেন।

রাজসাহীতে গুরুপ্রসাদের বুকে মাথা রাখিয়া দুই ভ্রাতা ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। সহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই দুই উন্নতি-শীল সচ্চরিত্র যুবকের জন্য চোখের জল ফেলিল। আর্ত্তকণ্ঠে গুরুপ্রসাদ বলিয়া উঠিলেন,—"এই জন্যই কি তোরা আমাকে পেন্সন্ লওয়াইলি ?" সমস্ত পরিজনবর্গ শোকে আকুল হইল, কেবল এই প্রাণান্তকর নিদারুণ সংবাদ পাইয়া চোখের জল ফেলেন নাই—গোবিন্দনাথ। তিনি তখন ভাঙ্গাবাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া দুর্গানাম উচ্চারণপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় চণ্ডীর বেদীতে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এই বৃদ্ধ বয়সে আবার আমাকে ওকালতি করিতে হইবে।" জানি না, আদ্যাশক্তি মহামায়ার কোন্ অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তির বলে অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ এই নিদারুণ পুত্রশোক জয় করিলেন; অথবা এই দুঃসহ অরুন্তুদ যাতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের নিম্নস্থলে প্রবাহিত হইতেছিল কি না, কে বলিতে পারে? কিন্তু এ কথা সত্য যে, কেহ কোন দিন তাঁহাকে শোকে মুহ্যমান হইতে দেখেন নাই।

বিপদ্ কখনও একাকী আসে না। বরদাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র কালীপদ যকৃৎপ্লীহাসংযুক্ত জ্বরে দীর্ঘকাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, এগার বৎসর বয়সে সকল জ্বালা জুড়াইল। বৃদ্ধ গোবিন্দনাথ

পৌত্রের মুখ চাহিয়া হয়ত পুত্রের বিয়োগ-কষ্ট ভুলিয়াছিলেন; বোধ হয়, ভাবিয়াছিলেন, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—পৌত্র ত তাঁহার পুত্রেরই নিদর্শন, পৌত্রই তাঁহার বংশধারাকে অক্ষুণ্ন রাখিবে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসের অর্থ ত আমরা সকল সময়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

এই সময়ে আবার একদিন গুরুপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীকান্তকে এক ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিল। জানকীকান্তের সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত-ভগিনী অম্বুজাসুন্দরী ছিলেন; অম্বুজা ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজেও দষ্ট হইলেন। তাঁহার আঘাত তত গুরুতর হয় নাই, তাই ভগবানের কৃপায় অম্বুজা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু জানকীকান্ত সেই কালরূপী কুক্কুরের দংশনে দশমবর্ষ বয়সে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল।

এই বালকের কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাহার মধুর বাক্য শুনিয়া সকলে মোহিত হইত। সে অল্প বয়সে এরূপ লোক-প্রিয় হইয়াছিল যে, তাহার কথা বলিতে বলিতে এখনও অনেকে শোকে আত্মহারা হইয়া উঠেন। ৮।৯ বৎসর বয়সে সে ছোট ছোট ছড়া রচনা ও কঠিন সমস্যার পাদ-পূরণ করিত। তাহার কণ্ঠস্বর বেশ সুমধুর ছিল।

বৃদ্ধ বয়সের আশা-ভরসা, বিপুল সংসারের ভারগ্রহণকারী কৃতী পুত্রদ্বয় এবং নয়নানন্দদায়ক উদীয়মান দুইটি স্নেহের দুলালের অকাল-মৃত্যুতেও সেন-পরিবারের দুর্ভাগ্যের শেষ হইল না। এই সময় হইতে তাঁহাদের আর্থিক অবনতিরও সূত্রপাত হইল।

সেন-পরিবারের বহু অর্থ রাজসাহীর ইন্দ্রচাঁদ কাঁইয়ার কুঠীতে রক্ষিত ছিল। কান্তকবি তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতের প্রথম অধ্যায়ের খণ্ডিতাংশে লিখিয়াছেন,—"কুঠী দেউলিয়া পড়িয়া গেল। জ্যেষ্ঠতাত, পুঠিয়ার চারি-আনির রাজা পরেশনারায়ণ রায়ের

বেতনভোগী উকীল ছিলেন এবং রাজার একটি বাসায় থাকিয়াই ওকালতি করিতেন। রাজার মৃত্যুর পর যাঁহারা সুসময়ে গোবিন্দ-নাথের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ও প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই চক্রান্তে ও কুপরামর্শে বাসাটি গোবিন্দনাথের হস্তচ্যুত হইল। তখন রহিল কেবল একটি ভাড়াটিয়া বাসা, পিতৃদেবের পেন্সনের কয়েকটি টাকা ও ক্ষুদ্র সম্পত্তির সামান্য আয়। যাঁহারা উপার্জ্জন ও ব্যয়ের হিসাব জীবনে করেন নাই দারিদ্র্য এবং অর্থ-হীনতা যাঁহাদের বাল্যজীবনে একবার মাত্র চকিত দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, যাঁহারা পরের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার জরাগ্রস্ত হইয়া অস্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের মুখ দর্শন করিলেন।" ভাগ্যবিপর্য্যয়ের এই করুণ চিত্র আমরা এই-খানেই শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগ

শৈশব হইতেই রজনীকান্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। কাহারও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলে তিনি আত্মহারা হইতেন এবং ঘরে ফিরিয়া সকলকেই সেই গান গাহিয়া শুনাইতেন। গানের যে অংশ তাঁহার স্মরণ হইত না, সেই অংশ তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া জোড়া দিয়া লইতেন। এই প্রক্ষিপ্ত অংশ এত সুন্দর হইত এবং মূলের সহিত তাহার এরূপ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত যে, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সহজে ধরা যাইত না। সঙ্গীত-চর্চ্চার প্রারম্ভে তিনি একটি 'ফ্লুট্' বাঁশী ক্রয় করেন এবং উহারই সাহায্যে সঙ্গীতাভ্যাস করিতে থাকেন। সঙ্গীত তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রবাহ ছুটাইয়া দিত। মৃদঙ্গের মৃদু-গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া গান করা তাঁহার বাল্যের নিত্য-ক্রিয়া বা ক্রীড়া ছিল।

রজনীকান্তের অনুষ্ঠিত সকল কাজই অলৌকিক বলিয়া বোধ হইত। বাল্যকালে তিনি খুব ভাল জিম্‌নাষ্টিক্ (gymnastic) করিতে পারিতেন। তিনি একবার জিম্‌নাষ্টিক্ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া রাজসাহী কলেজে পুরস্কার পান। তিনি এমন সুন্দর ground exercise (জমির উপর কসরৎ) করিতেন যে, বোধ হইত, তাঁহার গলায় ও কোমরে হাড় নাই। তাঁহার সঙ্গে 'হা—ডুডু' খেলায় কেহই জিতিতে পারিত না। পাবনা জেলায় প্রচলিত 'ট্যাম্‌বাড়ি' ও 'টুন্‌কিবাড়ি' প্রভৃতি খেলাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। একবার কয়েকজন বন্ধুর সহিত

সুবিশাল পদ্মানদীতে সাঁতার দিতে দিতে তিনি নদীমধ্যে বহুদূরে গিয়া পড়েন। বন্ধুরা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তবুও তিনি ফিরিলেন না, তিনি তখন একটি কুমীরের পিঠকে চর ভ্রম করিয়া, তাহা লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিতেছিলেন। পরে নিকটে গিয়া, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, তিনি সাঁতার দিয়া তীরে ফিরিয়া আসেন।

রজনীকান্ত নানা প্রকার ব্যায়াম-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। একই প্রকার ব্যায়াম অভ্যাসের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না; কারণ, তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নূতনের দিকে আকৃষ্ট হওয়া মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই জন্য যখনই কোনও ব্যায়ামের অভিনবত্বের লোপ হইত, উহাতে বন্ধুদিগের উৎসাহ কমিয়া যাইত, তখনই তিনি নূতন ব্যায়ামের অনুষ্ঠান করিতেন।

তিনি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিতেন। 'Moral Class Book' পড়িবার সময়ে তিনি উহার অনেকগুলি গল্প, বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১২।১৩ বৎসর। বোধ হয়, সেইগুলিই রজনী-কান্তের প্রথম রচনা। চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে বি এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজি হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার জন্য যে প্রশ্ন থাকিত, তাহা তিনি প্রায়ই পদ্যে লিখিয়া দিতেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িবার সময় হইতে যখন তিনি পূজা ও গ্রীষ্মের ছুটীতে ভাঙ্গাবাড়ী যাইতেন, তখন তাঁহাদের প্রতিবেশী ৺ রাজনাথ তর্করত্নের নিকট সংস্কৃত শিখিতেন। এই সংস্কৃত অধ্যয়ন-কার্য্যে তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বাল্যসহচর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী (কবিশিরোমণি) তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। এই সময় হইতেই রজনীকান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃত

কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ও স্বত্বাধিকারী এবং পাবনা কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামধন্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষার্থী হইয়া রাজসাহীতে আসেন। গুরু-প্রসাদ তাঁহাকে নিজ বাসায় রাখিয়া, বালক রজনীকান্তের শিক্ষাভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন। লাহিড়ী মহাশয়ের শিক্ষা-কৌশলে মেধাবী ছাত্র উত্তরোত্তর বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া অচিরকাল-মধ্যেই যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালার ন্যায় সংস্কৃতেও তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার ছন্দোজ্ঞানও ভাল ছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। রোজনাম্‌চার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি কটকে উদ্ভট-সাগরকে (শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর বি এ) যে সংস্কৃত কবিতা দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলাম, তিনি তা প'ড়ে সে কবিতা ক'টি মাথায় করে হাজার লোকের মধ্যে পাগলের মত রীতিমত নাচ্‌তে আরম্ভ কল্লেন।"

পত্রাদি রচনায় কোন বর্ণবিন্যাসে ভুল দেখিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন এবং বলিতেন,—"সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় লোকের এত অশ্রদ্ধা যে, আমি একখানিও নির্ভুল পত্র দেখি নাই।" তিনি আরও বলিতেন যে, মূর্খ তিন প্রকার,—(১) যে লেখাপড়া জানে না, (২) যে সামান্য পত্রাদি লিখিতেও বানান ভুল করে, (৩) যে পুস্তকা-দিতে কোনও ভ্রম-প্রমাদ দেখিলে সংশোধন করিতে সাহসী হয় না।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্ব বৎসর কিশোর কবি সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"ততঃ শ্রুত্বা পিতুর্বাক্যং পতিমুদ্দিশ্য দারুণম্।
রুরোদ শোকসন্তপ্তা সতী ত্রিভুবনেশ্বরী ॥
হা পিতঃ! কুত্র তত্তেজঃ প্রাজাপত্যং সুমানিতম্।
ত্রৈলোক্যং বিদিতং যেন কুত্র তত্তপসো বলম্॥"

তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচিত একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

নবমী দুঃখের নিশি দুঃখ দিতে আইল।
হায় রাণী কাঙ্গালিনী পাগলিনী হইল ॥
উমার ধরিয়া কর, কহে, উমা আয় রে।
এমন করিয়া দুঃখ দিয়া গেলি মায়ে রে ॥
সারাটি বরষ তোর মুখ পানে চাহিয়ে।
আসিবি রে আশা করি থাকি প্রাণ ধরিয়ে ॥
কত আশা করে থাকি পারি না তা বলিতে।
তিন দিনে চলে যাস্ পারি না তা পূরাতে ॥
তোর মত দয়াহীনা মেয়ে আমি দেখিনি।
ওমা, উমা ছেড়ে যাস্—দেখে দীন-দুঃখিনী ॥

অপরের রচিত গান গাহিয়া রজনীকান্তের তৃপ্তি হইত না। তাই তিনি কিশোর বয়স হইতে নিজে গান বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাববিভোর বালক স্বরচিত ভক্তি-রসাত্মক গান গাহিতেছেন—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। তাঁহার বাল্যের রচনা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যে দুই একটি গান এখনও পাওয়া যায়, তাহারই মধ্য হইতে একটি গানের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

(মায়ের) চরণ-যুগল, প্রফুল্ল কমল
মহেশ স্ফটিক জলে,
ভ্রমর নূপুর ঝঙ্কারে মধুর
ও পদ-কমল-দলে।

এই চারি পংক্তির মধ্যে কি সুন্দর ভাব ও অলঙ্কার। এই সব গান যখন তিনি রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

রজনীকান্তের একজন বাল্যসুহৃদ্ ও সহাধ্যায়ী ছিলেন—গোপাল-চরণ সরকার। ইনিও একজন কবি। এণ্ট্রান্স ক্লাসে একত্র পড়িবার সময়ে উভয়ের মধ্যে কবিতা লেখা লইয়া প্রতিযোগিতা চলিত।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, (১২৮৮ সালে) আঠার বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ১০৲ টাকার গভর্ণমেণ্ট-বৃত্তি লাভ করেন এবং রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজি প্রবন্ধ রচনার জন্য "প্রমথনাথ-বৃত্তি" (মাসিক ৫৲ টাকার) পাইয়া রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এণ্ট্রান্স পাশের পরে ১২৯০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার বেউথাগ্রামনিবাসী স্কুল-বিভাগের ডেপুটী ইন্সপেক্টর তারকনাথ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। রজনীকান্তের স্ত্রী কবিত্ব-শক্তির অধিকারিণী না হইলেও, তিনি চিরদিন সাহিত্যানুরাগিণী। তিনি স্বামীর কবিতা পাঠ করিয়া অনেক সময়ে কবির সহিত কাব্যালোচনা করিতেন এবং কখন কখন তাঁহার কবিতার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। তিনি উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি পরিষ্কার। তাঁহার প্রকৃতি সরল এবং লোকের সহিত ব্যবহারে তিনি মূর্ত্তিমতী অমায়িকতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রতিভার বিকাশ

বয়োবৃদ্ধির সহিত রজনীকান্ত যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার মধুর চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত প্রতিভাও তেমনি সুপরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিল। বয়ঃকনিষ্ঠ রজনীকান্তের মুখে নৈতিক উন্নতি-বিষয়ে সৎপরামর্শ পাইয়া, গ্রামের অনেক প্রবীণ ব্যক্তিও চিরদিনের জন্য স্ব স্ব কদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে রজনীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। যৌবনে রজনীকান্তের নৈতিক চরিত্র ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামের তাৎকালীন বালক ও যুবক-সমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। রজনীকান্তের আদর্শ-চরিত্র-প্রভাব কেবল বহির্ব্বাটীতে পুরুষ-সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পল্লীর বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা—সকলে রজনীকান্তকে ভয় ও ভক্তি করিতেন এবং পাছে তাঁহাদের কোন সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি রজনীকান্তের কর্ণগোচর হয়, এই ভাবিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। তাই পূজা ও গ্রীষ্মের অবকাশে যখনই তিনি ভাঙ্গাবাড়ীতে আসিতেন, তখনই সেই কিশোর বালকের আগমনে পল্লীমধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত।

ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার প্রতিভার কিরণ অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি এই সময় হইতে গল্প বলিবার অসাধারণ শক্তি লাভ করেন। বাড়ীতে আসিলেই পল্লীর যুবতী ও বালিকাগণ, এমন কি, বৃদ্ধার দলও গল্প শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন,—বন্ধুবান্ধব ও

পল্লীবৃদ্ধাদের ত কথাই ছিল না। নানা দেশের কাহিনী, ইতিহাস ও ডিটেক্‌টিভ্ গল্পসমূহ তিনি এমন মনোরম ভঙ্গীতে, এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে বলিতে পারিতেন যে, লোকে তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। বহুবার-শ্রুত ডিটেক্‌টিভ গল্প রজনীকান্তের বলিবার গুণে লোকে অভিনব বোধে পুনরায় শুনিতে চাহিত। তাঁহার ভ্রাতৃপ্রতিম স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "তাঁহার গল্প শুনিবার জন্য শৈশবে আমাদের বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে।"

সমবয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে তিনি ছিলেন—'চাঁই',—তা কি ফুটবল খেলায়, কি জিম্‌নাষ্টিকে, কি দেশের উন্নতিসাধনে। ছুটীর সময়ে ভাঙ্গাবাড়ী গিয়া রজনীকান্ত আহার ও পাঠের সময় ব্যতীত বাকি সময় পল্লীর উন্নতিকল্পে এবং প্রতিবাসিগণকে আমোদ আহ্লাদ দিবার জন্য অতিবাহিত করিতেন। কখনও বা বৃদ্ধমহলে, কোন দিন বা প্রৌঢ়দিগের মজ্‌লিসে, কোন সময়ে বা বৃদ্ধা কিংবা যুবতী কুলবধূগণের পাকশালার পার্শ্বে বা যুবক ও বালকগণের ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে অথবা বালিকাগণের খেলাঘরের সন্নিকটে তাঁহাকে কোন না কোন অভিনব তত্ত্বব্যাখ্যায় বা কোন কৌতুকজনক বস্তুপ্রদর্শনে অথবা কোনও সরস ও সদ্ভাবপূর্ণ উপাখ্যান-বর্ণনে নিযুক্ত দেখা যাইত। এই সময়ে রজনী-কান্তের উপস্থিতিতে সমস্ত পল্লী যেন আনন্দের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিত।

রজনীকান্তের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তাঁহার একটি সহচর লাভ হয়। তিনি ভাঙ্গাবাড়ী-নিবাসী তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী; তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। তিনি সেই বয়সেই সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতা-লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সংস্কৃত কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ

থাকিত এবং তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতেন। ছুটী উপলক্ষে গৃহে গমন করিয়া রজনীকান্ত তারকেশ্বরের সঙ্গলাভে আনন্দিত হইতেন। তাঁহারা দুইজনে একত্র হইয়া সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—মিশ্র-ভাষায় কবিতা লিখিতেন এবং কাব্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। এই সময়ে রজনীকান্ত "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্" কাব্যখানি দ্বিতীয় বার পাঠ করেন। তদ্ভিন্ন কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মনীষিগণের কাব্যাদি তিনি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। তারকেশ্বরের একটি অনন্যসাধারণ গুণ ছিল, তিনি কবিওয়ালাদের মত "ছড়া ও পাঁচালী" মুখে মুখে তৈয়ার করিয়া দুই তিন ঘণ্টা অনর্গল বলিতে পারিতেন। তাঁহার দেখাদেখি রজনীকান্তও ঐরূপ "ছড়া ও পাঁচালী" তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তারকেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন,—"ঐ সময়ে সে আমার অনুকরণ করিতে এত তীব্র ভাবে চেষ্টা করিত যে, কেবল শারীরিক বল ভিন্ন আর সকল বিষয়েই সে আমার সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল। বরং কোন কোন বিষয়ে সে আমা অপেক্ষা কিছু কিছু উন্নতি লাভও করিয়াছিল।"

এই তারকেশ্বরই রজনীকান্তের সঙ্গীত-গুরু। বাল্যকালে তারকেশ্বরের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। তাঁহার নিকটে থাকিয়া এবং তাঁহার সুমধুর গান শুনিয়া রজনীকান্তের সঙ্গীত-লিপ্সা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। তিনি বাল্যকালে যে সকল গান গাহিতেন, রজনীকান্ত সেগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা করিতেন। কান্তকবির সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্বন্ধে তারকেশ্বর লিখিয়াছেন,—"তখন সে অল্প অল্প ছোট সুরে গান করিতে পারিত, ঐ গান আমার নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিত। আমিও তখন

সঙ্গীত বিষয়ে কোন শিক্ষা লাভ করি নাই,—শুনিয়া শুনিয়া যাহা শিখিতাম, তাহাই গাহিতাম। বৎসরের মধ্যে যে নূতন সুর বা নূতন গান শিখিতাম, রজনীর সঙ্গে দেখা হইবা মাত্র, তাহা তাহাকে শুনাইতাম, সেও তাহা শিখিত। পরে যখন একটু সঙ্গীত শিখিতে লাগিলাম, তখনও বড় বড় তাল যথা—চৌতাল, সুরফাক্ প্রভৃতি একবার করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিতাম, তাহাতেই সে তাহা আয়ত্ত করিত এবং ঐ সকল তালের মধ্যে আমাকে সে এমন কূট প্রশ্ন করিত যে, আমার অল্প বিদ্যায় কিছু কুলাইত না।

একবার রাজসাহী হইতে একজন পাচক ব্রাহ্মণ ভাঙ্গাবাড়ী আসিয়াছিল। তাহার নাম কুমারীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কি বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে। সে সর্ব্বদাই গান করিত। তাহার একটি গানের প্রথম ছত্র,—

গেঁথেছি মালা সুচিকণ, ধর লো রাজবালা।

এই গানের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া রজনীকান্তও একখানি গান রচনা করিয়াছিল, তাহার কতক অংশ এই—

কে রে বামা রণ-মাঝে মনোমোহিনী !
ভূপ হে, একি রূপ ধরা মাঝে সৌদামিনী,
কাল কি আলো করে, এ কাল আলো করে
মুনির মনোহরা এ কামিনী।

এরূপ আরও অনেক গান সে সেই বয়সেই রচনা করিয়াছিল, সে সব আমার স্মরণ নাই।"

রজনীকান্তের সময়ে পদার্থবিজ্ঞান এফ্ এ পরীক্ষার্থীর অন্যতর অবশ্য-পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখনকার মত তখন কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় এত যন্ত্রাদির আবির্ভাব হয় নাই। সেই অসুবিধা দূর

করিবার জন্য রজনীকান্তকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইয়াছিল। বাড়ী আসিলেই তিনি সেগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেন এবং পল্লীস্থ ছাত্রবৃত্তি-স্কুলের ছাত্রদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানের স্থূল, নীরস তত্ত্বগুলি সরস ও সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন।

এই সময়ে উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রতিও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মে। অবসর মত তিনি নানা-জাতীয় গাছ-গাছড়া, ফল-ফুল, শাক-সবজি লইয়া পরীক্ষা করিতেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদিতে তাহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিতেন। তৎকালে ভাঙ্গা-বাড়ীর গ্রাম্য স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বালকগণকে শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র বসু মহাশয়ের কৃত "কৃষি-পরিচয়" ও "কৃষি-সোপান" পড়িতে হইত। রজনীকান্ত নিয়মিত ভাবে একদিন অন্তর স্কুলে উপস্থিত হইয়া ছাত্রবৃন্দকে কৃষি-সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। যাহাতে ছাত্রগণ বাল্যকাল হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে অভ্যাস করে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিতে পারে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি ভাঙ্গাবাড়ী স্কুলের ছাত্রগণমধ্যে বহুতর পুরস্কার প্রদান করিতেন।

ভাঙ্গাবাড়ীতে তিনিই প্রথমে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার প্রচলন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই নূতন খেলার স্রোত গ্রামে বহুকাল সমভাবে বহিয়াছিল। এই সমস্ত ক্রীড়ার খরচপত্র তিনি নিজেই বহন করিতেন। শুধু তাহাই নহে—লোকজন সংগ্রহ, খেলা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি কার্য্য তিনি স্বেচ্ছায় নিজের হাতে গ্রহণ করিতেন।

এই সময়ে তিনি নিয়মিত ও ধারাবাহিকরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস,

জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি আধুনিক কালের প্রায় সমস্ত কবির কাব্যগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ভাঙ্গাবাড়ী-বঙ্গবিদ্যালয়ের তাৎকালীন হেড্ পণ্ডিত মহম্মদ নজিবর রহমান সাহেব অনেক সময়ে তাঁহার এই সাহিত্যালোচনায় যোগদান করিতেন। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বাঙ্গালা মাসিক পত্রসমূহ সংগ্রহ করা এই সময়ে তাঁহার জীবনের অন্যতর কার্য্য ছিল। তিনি ঐ সকল সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, অবসর মত সেগুলি পাঠ করিয়া রীতিমত আলোচনা করিতেন।

কবিতা রচনা ব্যতীত আর একটি সুকুমার কলার প্রতি রজনীকান্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নাট্য-কলা ও অভিনয়-ক্রিয়া এই সময় হইতেই অল্পে অল্পে রজনীকান্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ফলে উত্তর-কালে তিনি ভাঙ্গাবাড়ীতে সখের থিয়েটারের প্রচলন করেন। প্রথমে প্রথিত-যশা লেখক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাটকাকারে লিখিত অংশ "সরলা" অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হয়; কিন্তু কোন কারণে ইহার পরিবর্ত্তে বঙ্গের গ্যারিক্ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রণীত "বিল্বমঙ্গল" অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে রজনীকান্তের বাল্যবন্ধু তারকেশ্বর কবিশিরোমণি মহাশয় "বিল্বমঙ্গল" এবং রজনীকান্ত স্বয়ং "পাগলিনী"র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "পাগলিনী" র ভূমিকা এরূপ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল এবং গানগুলি এমন মধুরকণ্ঠে ও এরূপ প্রাণস্পর্শীভাবে গীত হইয়াছিল যে, ভাঙ্গাবাড়ীর অনেকে আজিও তাহার উল্লেখ করেন। রজনীকান্তের সাধনা কত কঠোর ছিল, তাহা তাঁহার এই অভিনয়ের সাফল্য হইতেই সূচিত হইবে। রজনীকান্ত অন্য বিষয়েও যেরূপ উদ্দেশ্যের

দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া উপায় উদ্ভাবন হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি পর্য্যন্ত কখনও কর্ম্মকর্ত্তৃরূপে, কখনও বা কার্য্যকারকরূপে কার্য্য করিতেন, এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। নাট্যাভিনয়ের কল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন, বিভিন্ন চরিত্রের বক্তব্য-লিখন, ভূমিকার অভিনেতা নির্ব্বাচন, অভিনয়ে শিক্ষাদান, রঙ্গমঞ্চ-গঠন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যেই রজনীকান্তের অদম্য উৎসাহ এবং অসাধারণ অধ্যবসায় সমভাবে পরিলক্ষিত হইত। যে সময়ে এই নাট্যাভিনয়ের প্রথম অনুষ্ঠান হয়, তখন তিনি সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় নিয়ত নিযুক্ত। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তিনি দুই ঘণ্টা সংস্কৃত পাঠ করিতেন এবং আহারান্তে অভিনয়-শিক্ষাগৃহে উপস্থিত হইয়া সমবেত বন্ধুবর্গকে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। এই গুরুগিরিতে একদিনও তাঁহার কামাই ছিল না,—কখন গান শিখাইতেছেন, কখন উচ্চারণ বলিয়া দিতেছেন, কখন বা অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া দিতেছেন,—তখন তাঁহার উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছাত্রজীবনে রস-রচনা

রজনীকান্ত যখন রাজসাহী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ এড্‌ওয়ার্ড সাহেব রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে মালদহের পরলোকগত ঐতিহাসিক রাধেশচন্দ্র শেঠ, মালদহের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ এবং কুষ্টিয়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রময় সান্ন্যাল এম্‌, এ, বি'এল্ রজনীকান্তের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

অধ্যাপকের আসিতে বিলম্ব হইলে বা ক্লাস বসিতে দেরী থাকিলে তিনি ক্লাসে বসিয়া বহু রহস্য আলোচনায় সহপাঠিগণকে আনন্দ দিতেন। এই সময়ে তিনি বেশীর ভাগ সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত যে কয়টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া গিয়াছে, সেকয়টি রচনার বিবরণ সমেত প্রদান করিতেছি। এইগুলি শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সান্ন্যাল বি এ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি।

রজনীকান্ত একদিন কলেজে বসিয়া বোর্ডের উপর লিখিলেন—

"রমতে রমতে রমতে রমতে।"

এবং তাঁহার সহপাঠিগণকে ইহার পাদপূরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যখন কেহই তাঁহার অনুরোধে পাদপূরণ করিতে সমর্থ হইল না, তখন তিনি নিজেই এইভাবে কবিতাটির পাদপূরণ করিলেন—

"গহনে গহনে বনিতা-বদনে,
জনচেতসি চম্পকচূত-বনে।
দ্বিরদো দ্বিপদো মদনো মধুপো
রমতে রমতে রমতে রমতে ॥"

দ্বিরদঃ (হস্তী) গহনে (বিজনে) গহনে (বনে) রমতে। দ্বিপদঃ (মানবঃ) বনিতা-বদনে রমতে। মদনঃ (কামভাবঃ) জনচেতসি (লোকচিত্তে) রমতে। মধুপঃ (ভ্রমরঃ) চম্পক-চূত-বনে রমতে।

অর্থাৎ বিজন বনে হাতী, বনিতা-বদনে মানুষ, লোকের চিত্তে কাম এবং চম্পক ও আম্র-কাননে মধুকর রমণ করিয়া থাকে।

তিনি শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করিয়া সংস্কৃতে নানা প্রকার ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিতেন। চিরপ্রথামত রচনার প্রারম্ভেই সরস্বতীকে স্মরণ করিতেছেন,—

"এতেষাং শিক্ষকানান্ত বর্ণ্যতে প্রকৃতির্ময়া।
বাগ্দেবি দেহি মে বিদ্যামস্মিন্ দুঃসাধ্যকর্ম্মণি ॥"

অর্থাৎ আমি এই সকল শিক্ষকের স্বভাব বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে, দেবি সরস্বতি, আমাকে বিদ্যাদান করুন।

সে সময়ে কালীকুমার দাস মহাশয় রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্যাকরণে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু সভা-সমিতিতে তিনি ভালরূপ বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। কবি নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন,—

"ব্যাকরণে মহাবিদ্যা 'ব্যা' ব্যা-করণতৎপরঃ।
কস্মিংশ্চিদ্ যদি বা কালে ক্রিয়তেঽসৌ সভাপতিঃ।
সমারোহং সমালোক্য 'চরকীমাতং' প্রজায়তে ॥"

অর্থাৎ ইঁহার ব্যাকরণ-শাস্ত্রে মহাবিদ্যা কেবল ব্যা-ব্যা-করণ-তৎ-পর (অর্থাৎ 'ব্যা' 'ব্যা' করা স্বভাব) ; কিন্তু যদি কোন সময়ে ইঁহাকে সভার সভাপতি করা হয়, তবে লোকসমাগম দেখিয়া তাঁহার চরকাঁমাত (ত্রাস) উৎপন্ন হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এড্‌ওয়ার্ড সাহেব তখন রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ। কেরাণী বিনোদবিহারী সেন তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি শুদ্ধ করিয়া ইংরাজি বলিতে পারিতেন না। একদিন কলেজের খিলানের উপর একটি পাখী বসিয়াছে দেখিয়া এড্‌ওয়ার্ড সাহেব বন্দুক লইয়া তাহাকে শীকার করিতে উদ্যত হইলে, বিনোদবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"Sir, Sir, it will won't die." এই বিনোদবাবুকে উপলক্ষ করিয়া রজনীকান্ত বলিয়াছিলেন—

"এডওয়ার্ড-কপেরস্তা বিনোদ ইতি নামতঃ।
বিদ্যারস্তা বুদ্ধিরস্তা ইংলিশঃ সর্ব্বদা মুখে ॥"

হরগোবিন্দ সেন মহাশয় তখন রাজসাহীর একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা অতুলনীয় এবং শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার স্ফীত উদর লক্ষ্য করিয়া কবি নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখেন—

"অজরোঽমরঃ প্রাজ্ঞঃ হরগোবিন্দশিক্ষকঃ।
বেতনেনোদরস্ফীতঃ বাগ্দেবী উদরস্থিতা ॥"

অর্থাৎ শিক্ষক হরগোবিন্দ বাবু প্রবীণ, অজর ও অমর (জরা-মৃত্যুহীন)। বেতনের কল্যাণে পেট মোটা হইয়াছে,—বিদ্যা সমস্তই পেটে, মুখে আসে না।

পঠদ্দশায় তিনি এইরূপ বহু সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেইগুলি এখন আর পাওয়া যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-সমাপ্তি

রজনীকান্ত রাজসাহী কলেজ হইতে ১২৯১ সালে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) দ্বিতীয় বিভাগে এফ্ এ পাশ করেন। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সকল ডিসেম্বর মাসে গৃহীত হইত, কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মার্চ্চ মাসে পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। সেই জন্য রজনীকান্তের ন্যায় যাঁহারা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এফ্ এ পরীক্ষা দিতে হয়। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেই বৎসরে ৺ শারদীয়া পূজার বন্ধে বাড়ী গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ জ্বর ও উদরাময় রোগে মরণাপন্ন হইয়াছেন। সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে জ্যেষ্ঠতাত আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। রজনীবাবুর পিতা পূর্ব্বাবধিই নানা রোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠতাত আরোগ্য লাভ করিবার অল্পদিন পরেই গুরু-প্রসাদের জ্বর হইল এবং সেই জ্বরেই ১২৯২ সালে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রজনীকান্ত তখন সিটি কলেজে বি এ পড়িতেছিলেন। যখন সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে গুরুপ্রসাদকে বাহিরে লইয়া গেল, তখন গোবিন্দনাথ বলিয়া উঠিলেন—"কি? গুরু গেল? আমার বাল্যসখা গেল? আমার চির জীবনের সাথী গেল? আমার অমন ভাই গেল? তবে আর আমি বাঁচিব না।"

তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। গোবিন্দ-নাথ সেই রাত্রিতেই শয্যা গ্রহণ করিলেন, সে শয্যা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। গুরুপ্রসাদের স্বর্গারোহণের কয়েকদিন পরেই তিনিও পরলোক-গমন করিলেন।

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে রজনীকান্তের এই দুই মহাগুরু নিপাত হইয়াছিল। যে দুই জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সেন-পরিবার আলোকিত হইতেছিল, তাহা চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল। তখন সেনপরিবারের মধ্যে রহিলেন—গোবিন্দনাথের কনিষ্ঠ পুত্র উমাশঙ্কর আর গুরুপ্রসাদের একুশ বৎসর বয়স্ক পুত্র রজনীকান্ত।

রজনীকান্ত তখনও ছাত্র, তাই সংসারের সমস্ত গুরুভার উমাশঙ্করের উপর পড়িল। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের তুলনায় বিষয়-সম্পত্তির আয় অতি সামান্যই ছিল। সেই সামান্য আয়ে তিনি সংসারের সমস্ত গুরু-ভার মাথায় লইয়া রজনীকান্তকে কলেজে পড়াইতে লাগিলেন।

বি এ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে রজনীকান্ত হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। উমাশঙ্কর ভ্রাতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার যত্নে ও সুচিকিৎসায় কবি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত উত্থান-শক্তিহীন হইয়া রহিলেন। তবুও পরীক্ষার সময়ে সবল ও সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন, এই আশায় তিনি পরীক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

তিনি বি এ পরীক্ষায় ইংরাজি-সাহিত্যে, সংস্কৃতে ও দর্শনে 'অনার্স' লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে অনার্স ছাড়িয়া দিতে হয়। এই সময়ে তিনি উমাশঙ্করকে একদিন বলিলেন,—"অনার্সের প্রয়োজন নাই। ইংরাজি যে রকম তৈয়ারি আছে, তাহাতেই

চলিবে, কিন্তু দর্শনের এখনও যথেষ্ট বাকি আছে, তাহার কি করি? আমার ত উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই।" উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এক কাজ কর—আমি বই পড়িয়া যাই, তুমি শোন।" এস্থলে বলা আবশ্যক যে, উমাশঙ্কর এফ্ এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

নিজ স্মৃতি-শক্তির উপর রজনীকান্তের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিন মাস ধরিয়া এই ভাবে সমস্ত পাঠ্য বিষয় উমাশঙ্করের মুখে শুনিয়া গেলেন। পরীক্ষা আসিল; তখনও তিনি সম্পূর্ণ সবল হন নাই, কোন রকমে পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল,—তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নম্বর আনাইয়া দেখা গেল,—তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃতে পাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিন নম্বরের জন্য দর্শন-শাস্ত্রে ফেল হইয়াছেন। যাহা হউক আর এক বৎসর পড়িয়া ১২৯৫ সালে (১৮৮৯ খৃঃ) তিনি সিটি কলেজ হইতেই বি এ পাশ করেন।

সংসারের অবস্থা বুঝিয়া রজনীকান্ত অর্থকরী বিদ্যায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার আয় যৎসামান্য। তিনি বি এল্ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। যখনই কলেজের ছুটীতে ভাঙ্গাবাড়ী আসিতেন, তখনই তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী প্রাচীনগণের সহিত এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেন। সুপ্রাচীন পুরাণ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া, এবং রুসো প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের মত তুলিয়া নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার ঔচিত্য সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তীক্ষ্ণধী রজনীকান্তের যুক্তিতে প্রতিবাদিগণের কূট তর্ক ভাসিয়া যাইত এবং তাঁহার যুক্তির সারবত্তাই

বিরোধীদিগকে স্বীকার করিতে হইত। শেষে তিনি তাঁহাদিগেরই সহায়তায় গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রথমতঃ রজনীকান্ত গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে সকলের অমত দেখিয়া, পাবনা অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষা-সম্মিলনীর সভ্য হইয়া, তিনি গ্রামের গৃহে গৃহে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য যত্ন করেন। এই গৃহশিক্ষা-প্রথা হইতে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রচলন-কার্য্যে তাঁহাকে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীর মত সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে বহু যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ এবং তর্ক-বিতর্ক করিতে হইয়াছে। তাহার পর বহু পরিশ্রমে যদি বা তাঁহাদের অনুমতি পাইলেন, তখন ছাত্রীদের লইয়া বিপদে পড়িলেন—তাঁহারা সহজে পাঠের আবশ্যকতা বুঝিতে চাহেন না। তখন তাঁহাদের নিকট আবার নূতন করিয়া যুক্তি, তর্ক ও নূতন নূতন প্রলোভন দেখাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। যখন অভিভাবক ও ছাত্রীদের মত হইল, তখন আবার দুইটি নূতন সমস্যা উপস্থিত—পুস্তক কোথায় পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষাই বা কে দিবেন? অধিকাংশ স্থলে এই উভয় সমস্যার সমাধান রজনীকান্তকেই করিতে হইত। তিনিই পুথি যোগাইতেন এবং শিক্ষকতাও করিতেন। ক্বচিৎ কোন পরিবারের কর্ত্তা বা গৃহিণী এই বিষয়ে রজনীকান্তকে সাহায্য করিতেন। বৎসরাধিক কাল পরিশ্রমের পর যখন ছাত্রীগণের পরীক্ষা গৃহীত হইল, উত্তীর্ণা বালিকা ও বধূগণের নাম কার্য্য-বিবরণে প্রকাশিত হইল এবং তাঁহারা গুণানুসারে পুরস্কৃত হইলেন, তখন হইতে আর রজনীকান্তকে ছাত্রী-সংগ্রহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। রজনীকান্তের পত্নী উপর্য্যুপরি তিন বৎসর এই সকল পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

আর রজনীকান্ত-প্রবর্ত্তিত স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বোত্তম ফল—তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাশ গুপ্তা। ইনি সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রজনীকান্ত বি এল্ পরীক্ষা দিবার কিছু পূর্ব্বে—১২৯৭ সালের ভাদ্রমাসে পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ হইতে কুঞ্জবিহারী দে বি এল্ মহাশয়ের সম্পাদকতায় "আশালতা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে রজনীকান্তের "আশা" নামে একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। ইহাই কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা। তাই সমগ্র কবিতাটি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

আশা

১

এখনো বলগো একবার!
নরকের ইতিহাস,
দুষ্কৃতির চির দাস,
মলিন পঙ্কিল এই জীবন আমার—
আমারো কি আশা আছে বল একবার।

২

এই শেষ, আর নয়,—
বাঁধিয়াছি এ হৃদয়,
প্রতিজ্ঞা, পাপের পানে চাহিব না আর ;
করিব না ব'লে, পাপ করেছি আবার

৩

বুকের ভিতর সদা,
কে যেন কহিত কথা,
ব'লেছিল বহুদিন ; বলে নাকো আর ;
ব'লে ব'লে থেমে গেছে, ছিঁড়ে গেছে তার।

৪

নিত্য "আজ কাল" বলি,
বসন্ত গিয়াছে চলি,
কাল-মেঘ ঘিরিয়াছে করেছে আঁধার.

৫

সম্বল-বিহীন পান্থ,
পাপ-পথে পরিশ্রান্ত,—
পড়ে আছি পথ-প্রান্তে, অবশ, অসাড় ;
মুছাইতে নাহি কেহ অশ্রু-বারি-ধার।

৬

পথ ব'য়ে যায় যারা,
উপহাস করে তারা,
সবাই আমায় কেন করে গো ধিক্কার ;
নিদয় কঠিন মরু হ'য়েছে সংসার।

৭

দংশে অতীতের স্মৃতি,
সম্মুখে কেবল ভীতি,
চারিদিক্ হ'তে যেন উঠে হাহাকার !
আমারো কি আশা আছে ? বল একবার।

---

* ইহার পরের ছত্রটি পাওয়া যায় নাই। 'আশা'র প্রথম সংখ্যাতেও এই ছত্রটি ত হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মজীবন

১২৯৭ সালে (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রজনীকান্ত রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। যেখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত এক সময়ে সর্ব্বপ্রধান উকিল ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রেরাও ওকালতিতে এককালে পসার-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেইখানে তিনিও অল্পদিনের মধ্যে কতকটা পসার করিয়া লইলেন।

ওকালতি আরম্ভ করিয়া তিনি যেন জীবনে স্ফূর্ত্তি পাইলেন। রাজসাহীর বাসায় তাঁহার দিনগুলি আমোদ-প্রমোদে কাটিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গীতের স্রোতে বাড়ীর ভাবনা পর্য্যন্তও ভাসিয়া গেল। তখন ভাঙ্গাবাড়ীর সমস্ত ভার উমাশঙ্করেরর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি রজনীকান্তের নিকট কিছু সাহায্যও চাহিতেন না। রজনীকান্ত যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, বন্ধু-বান্ধবের সহিত আমোদ-প্রমোদে এবং লোক লৌকিকতায় ব্যয় করিতেন।

এই সময় রাজসাহীতে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ডাক্তার অক্ষয়চন্দ্র ভাদুড়ী প্রভৃতির চেষ্টায় নাট্যামোদের তরঙ্গ বহিতে থাকে। মহাকবি কালিদাস-প্রণীত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটক অভিনয়ের জন্য স্থির হয়। নাটকোক্ত নটীর গানটি কিরূপ সুরে গীত হইলে শ্রুতিমধুর হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য মৈত্রেয় মহাশয় রাজসাহীর তৎকালীন সুগায়কগণকে আহ্বান করেন। সকলেই নিজ নিজ সুরে নটীর গানটি গাহিলেন, কিন্তু কাহারই সুর মৈত্রেয় মহাশয়ের

রজনীকান্তের আনন্দ-নিকেতন

মনের মত হইল না। অবশেষে রজনীবাবুর কণ্ঠে গানটি শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"কালিদাস জীবিত থাকিয়া যদি এই সভায় উপস্থিত হইতেন এবং রজনীকান্তের কণ্ঠে এই গানটি শুনিতেন, তবে তিনিও আমার সহিত এই সুরই পছন্দ করিতেন।"

রজনীকান্তের অভিনয়-ক্ষমতার কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। 'রাজসাহী-থিয়েটারে'ও তিনি অভিনয় করিতেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটকে তিনি "রাজার" ভূমিকা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এই অভিনয়ের কথা তিনি হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজসাহীতে এত দিন তাঁহারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বা পিতা কেহই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই। রজনীকান্ত নিজে একটি বাড়ী তৈয়ার করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং উমাশঙ্করের মত লইয়া বড় কুঠির (মেসার্স ওয়াটসন্ এণ্ড কোম্পানির রেশমের কারখানার) খানিকটা জমি পত্তনী লইলেন। প্রথমতঃ এই জমির উপরে কয়েকখানি টিনের ঘর তৈয়ার হইয়াছিল; পরে টিনের ঘর ভাঙ্গিয়া পাকা কোঠা তৈয়ার হয়। তখন তাঁহার পসার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আনুমানিক ২০০৲ টাকা মাসিক উপার্জ্জন করেন।

কিন্তু ভগবান্ তাঁহার উন্নতির পথে কাঁটা দিলেন। হঠাৎ বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল যে, উমাশঙ্করের গলায় ঘা হইয়াছে। ইহার কয়েক দিন পরেই উমাশঙ্কর টেলিগ্রাম করিলেন, "No improvement, starting Rajshahi for treatment. (একটুও ভাল হয় নাই, চিকিৎসার জন্য রাজসাহী যাত্রা করিলাম)।" উমাশঙ্কর রাজসাহী আসিলেন; কিন্তু স্থানীয় চিকিৎসকগণ কিছুই করিতে পারিলেন না। কাজেই

রজনীকান্ত তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পটলডাঙ্গায় বাসা লওয়া হইল। উমাশঙ্করের বাল্যবন্ধু রাজসাহীর অন্তর্গত পুটিয়া নিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগ্‌চি মহাশয় রোগীকে পরীক্ষা করিয়া রজনীকান্তকে বলিলেন, "ভাই, তোমার দাদার cancer (ক্যান্‌সার) হইয়াছে, আর নিস্তার নাই।"

ফলেও তাহাই হইল। মাসখানেক পরে একদিন হঠাৎ উমাশঙ্করের গলা দিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল। সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কলিকাতাতেই ১৩০৪ সালের পৌষ মাসে মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার এক পুত্র, দুই কন্যা ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। রজনীবাবুর রোজনাম্‌চা হইতে জানা যায় যে, উমাশঙ্করের চিকিৎসার জন্য ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। রজনীকান্ত ১৩১৬ সালে ১৭ই ফাল্গুন তারিখে লিখিয়াছেন,—"কলিকাতায় এসে ওকেনলি সাহেব ডাক্তারকে দেখান মাত্রই সে বল্লে, ডবল cancer (ক্যান্‌সার)। আর আমার প্রাণ চম্‌কে উঠল। সর্ব্বনাশ! দাদার জন্য ৫০০০৲ টাকা খরচ ক'রে তাঁকে বাঁচাতে পারি নাই।"

ভ্রাতার মৃত্যুর পর বাড়ী ও ওকালতি দুই রক্ষার ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি উমাশঙ্করের নাবালক পুত্র গিরিজানাথকে পড়াইবার জন্য রাজসাহীতে আনিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীত-চর্চ্চা ও সাহিত্য-সেবা

প্রথম প্রথম রজনীকান্ত কবিতা লিখিয়া প্রকাশ করিতেন না এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে কেহ অনুরোধ করিলে বলিতেন,—"Love is blind.' (ভালবাসা অন্ধ)। বন্ধুবর্গের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে তাঁহার 'আশা' নামক কবিতা—"আশালতা" মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের উৎসাহে রাজসাহী হইতে "উৎসাহ" নামক মাসিক পত্র বাহির হইল। প্রথম বৎসরের "উৎসাহে" রজনীকান্তের নিম্নলিখিত কবিতা কয়টি প্রকাশিত হয়—

বৈশাখে—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
জ্যৈষ্ঠে—তিনটি কথা
আষাঢ়ে—রাজা ও প্রজা (গাথা)
আশ্বিনে—তোমরা ও আমরা
অগ্রহায়ণে—যমুনা-বক্ষে

পৌষের "উৎসাহে" "জুনিয়ার উকিল" নামক একটি কবিতা আছে। কবিতার শেষে নাম আছে "জনৈক জুনিয়ার উকিল"। লেখাটি পড়িয়া মনে হয়, উহা রজনীকান্তের রচনা।

ঠিক কোন্ সময় হইতে রজনীকান্ত কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা বলা যায় না। ছেলেবেলায় তিনি প্রায়ই পয়ার লিখিতেন,

আর মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিতেন। কলেজে পড়িবার সময় বিবাহের প্রীতি-উপহার প্রভৃতি লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। আর সভা-সমিতির অধিবেশনের উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং বিদায়-সঙ্গীত লেখাটাও তাঁহার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর রাজসাহীতে অনুষ্ঠিত স্মৃতি-সভায় তাঁহার রচিত যে উদ্বোধন-সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল,—

> "নিষ্প্রভ কেন চন্দ্র তপন,
> স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন,
> ধীর তটিনী মন্দ গমন,
> স্তব্ধ সকল পাখী।"

এমন গান তিনি অনেক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেগুলি প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার একখানি চিরপরিচিত আবেগপূর্ণগান-রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়-প্রদত্ত মনোজ্ঞ বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি,—

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরীতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন

টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি ত অবাক্। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্ব্বজন-পরিচিত—

"তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।"

এমন সুন্দর গান রজনীর কলম দিয়া খুব কমই বাহির হইয়াছে। যেমন ভাব, তেমনই ভাষা।"

একবার রাজসাহী-একাডেমির ছাত্রগণ-মধ্যে পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে, রাজসাহী বিভাগের তৎকালীন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর প্রথেরো সাহেবের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, সেই সভার প্রারম্ভে আমাদের কবি-রচিত যে সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার কয়েক ছত্র নিম্নে তুলিয়া দিলাম,—

"নীল-নভ-তলে চন্দ্র-তারা জ্বলে,
হাসিছে ফুল-রাণী ফুল-বনে ;
হরষ-চঞ্চল, সমীর-সুশীতল,
কহিছে শুভকথা জনে জনে।"

'উৎসাহ' পত্রের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সাহা ১৩০৭ সালের ২৯এ ফাল্গুন বসন্ত-রোগে অকালে কাল-কবলে পতিত হইলে, রজনীকান্ত তাঁহার শোকে ১৩০৭ সালের চৈত্র মাসের 'উৎসাহে'

"অশ্রু" নামক কবিতায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। এই অশ্রু দেখিয়া আমাদেরও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে,—

অশ্রু

"ফুল যে ঝরিয়া পড়ে—কথা নাহি মুখে!
তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ বিনাশ,
তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস,
র'য়ে গেল কিনা এই মর-মর্ত্ত্য-বুকে,
সে কি তা দেখিতে আসে? হেসে ঝরে যায়।
বন-দেবী তার তরে নীরব সন্ধ্যায়,
প্রশান্ত-প্রভাতে বসি' একান্তে নির্জ্জনে
নির্ম্মল স্মৃতির উৎস—নয়নের নীর
ফেলে যায় প্রতিদিন পবিত্র শিশির।
অতি জীর্ণ পত্রাবৃত সমাধি-শিয়রে,
ভ্রমর ফিরিয়া যায় নিরাশ হইয়া,
শেষ মধু গন্ধটুকু কুড়ায়ে যতনে,
ব্যথিত সমীর ফিরে আকুল ক্রন্দনে।
লুপ্তপ্রায় জনশ্রুতি সমাধির পাশে।
কভু যদি কোন পান্থ পথ ভুলে আসে,
কহে তার কাণে কাণে বিষাদ-স্পন্দনে,—
'তোমরা এলে না আগে দেখিলে না তারে,
ছোট ফুল—ঝরে গেল সৌরভের ভরে'।"

সুরেশচন্দ্রের শোকসভায় গীত হইবার জন্য তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অপূর্ব্ব—

"অস্ফুটন্ত মন্দার-মুকুল ;
সে কেন ফুটিবে হেথা ?—বিধাতার ভুল !
কোন্ অভিশাপভরে, ধরায় পড়িল ঝ'রে,
শচীর কুন্তলর[illegible]ী বিলাসের ফুল।"—ইত্যাদি।

কবি [illegible] কিছু লিখিতেন, তাহাই গম্ভীর ভাবের হইত। রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করিবার পর, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আবগারি বিভাগের পরিদর্শকরূপে ১৩০১ কি ১৩০২ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রাজসাহী গমন করেন এবং তথায় এক সভায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত মুগ্ধ হন। তাহার পর হইতেই তিনি হাসির গান লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩০২ সালের কার্ত্তিক মাসের "সাধনা"য় দ্বিজেন্দ্রবাবুর "আমরা ও তোমরা" নামক একটি হাস্যরসাত্মক কবিতা বাহির হয়। রজনীবাবু ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসের "উৎসাহে", "তোমরা ও আমরা" নামক একটি কবিতা লিখিয়া উহার পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন। নিম্নে উভয় কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

" 'আমরা' খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই গো,
আর, 'তোমরা' বসিয়া খাও ;
আমরা দু'পরে আপিসে লিখিয়া মরি গো,
আর, তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে 'আমরা'ই পড়ে লড়ি গো,
'তোমরা' গহনাপত্র ও টাকাকড়ি গো
অমায়িক ভাবে গুছায়ে, পাল্কি চড়ি' গো,
ধীরে চম্পট্ দাও।

*   *   *   *

*   *   *   *

আমরা বে[illegible]রী—ব্যবসা ও চাকরি ক[illegible] গো,—

আর, [illegible]মরা কর [illegible]গো 'আয়েস' ;

আমরা সাহেবমু[illegible]ববকু[illegible]

আর তোমরা খাও গো—'পায়েস' ;

তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত গো

কার্য্য করিয়া না পূরাই মনোরথ গো,

অবহেলে চলি যাও নাড়ি দিয়া নথ গো

অথবা মারিতে ধাও।

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতি বাড়ে গো—

রোজ, জ্বালাতন হ'য়ে মরি ;

তোমরা—সে ভোগ ভুগিতে হয় না—থাক গো

খাসা, বেশবিন্যাস করি ;

আমরা দু'টাকা জোড়ার কাপড় পরি গো—

তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি গো—

'বোম্বাই' 'বারাণসী' বছর বছরই গো—

তবু মন উঠে নাও।"

দ্বিজেন্দ্রলালের—"আমরা ও তোমরা"।

"আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,

আর তোমরা বসিয়া খাও,

আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,

আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও ;

আজ এ বিপদ, কাল ও বিপদ করি গো,
হাতের দু'খানা গহনা ও টাকা কড়ি গো,
'না দিলে পরম প্রমাদে প্রেয়সি, পড়ি গো'
বলি', লয়ে চম্পট দাও।

*

*   *   *   *

আমরা মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো,
আর তোমাদের চাই গদি ;
আমাদের শাক-পাতাটা হ'লেই চলে গো,
আর তোমরা বোলাও দধি !
তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ত্রুটি গো,
স্বাস্থ্যে হালুয়া লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো,
না হ'লে আমরি ! কর কি সুভ্রূকুটি গো,
কিংবা চড় চাপড়টা দাও।

আমরা একটি চুলের বোঝার ভরে গো,
সদা জ্বালাতন হ'য়ে মরি,
তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হয় না, থাক গো,
সদা এল্‌বার্ট টেরি করি।
আমরা দু'খানা শাঁখা ও লোহার খাড়ু গো
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয় না কারু গো,
তোমাদের চটী, চুরুট ও চেন চারু গো,
তবু খুঁত খুঁতি মেটে নাও।"

রজনীকান্তের—"তোমরা ও আমরা"।

এই স্থলে বলা ভাল যে, দ্বিজেন্দ্রলালের "আমরা ও তোমরা" প্রকাশিত হইবার পূর্বে ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের "সাধনা"য় কবীন্দ্র রবীন্দ্রের "তোমরা এবং আমরা" নামে একটি অপূর্ব্ব গীতি-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেটি সম্পূর্ণ করুণ-রসাত্মক। তাহাতে ঠাট্টা বা বিদ্রূপের লেশমাত্র নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই "[illegible]না"তেই হাস্যরসে করুণরসের উত্তর দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতেও কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ তিনটি কবিতার উদ্ধৃত অংশসমূহ পাঠ করিয়া এবং তুলনায় সমালোচনা করিয়া আনন্দ উপভোগ করুন—

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলকুল কল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কাণাকাণি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল-চরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

*   *   *   *

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভ'রে,
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে?

রজনীকান্তের হাতের লেখা ও স্বাক্ষর।

তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি !
কোন সুলগনে হ'ব না কি কাছাকাছি !
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে !"

রবীন্দ্রনাথের "তোমরা এবং আমরা"।

এই হাসির গান লেখা আরম্ভ করা অবধি তিনি ক্রমাগতই উহা লিখিতে থাকেন, ক্রমে গভীর ভাবাত্মক গান লিখিবার শক্তি তাঁহার নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। উত্তরকালে তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দুই দিক্ বজায় রাখিয়া মাতৃবাণীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

ওকালতিতে রজনীকান্তের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। যাহা কিছু উপায় করিতেন, তাহাতে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত বটে, কিন্তু প্রাণের টানে তিনি কোন দিনও কাছারি যাইতেন না। কাশীধাম হইতে তিনি ১৩১৭ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়কে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ওকালতি-ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা জানাইতেছি ;—

"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম ; আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদরান্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য অর্থ দেয় নাই।" না গেলে উপায় নাই, তাই রজনীকান্তকে

কাছারি যাইতে হইত। যখনই অবসর পাইতেন, তখনই তিনি বন্ধু-বান্ধব-পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্গীতের নির্ম্মল আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। রাজসাহীতে তাঁহার গৃহখানি সঙ্গীতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া থাকিত। কবিতা বা গান-রচনায় তিনি অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। কখনও ভাবিয়া লিখিতে তাঁহাকে দেখি নাই। কাগজ-পেন্সিল লইয়া অনবরত দ্রুতগতিতে লিখিয়া যাইতেন। বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিলে দুই তিন মিনিটের মধ্যেই নির্ব্বাচিত বিষয়ে কবিতা লিখিয়া শেষ করিতেন। মনে মনে কবিতা রচনা করিয়া অনর্গল বলিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

যখন ওকালতিতে তাঁহার পসার একরকম জমিয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। রাজসাহীর প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ সমবেত চেষ্টা করিয়াও বালককে বাঁচাইতে পারিলেন না। Capillary Bronchitis-এ তাহার মৃত্যু হইল। কবি হৃদয়ে কঠিন আঘাত পাইলেন। বুক দমিল, তবু মুখ ফুটিল না। ভগবদ্‌বিশ্বাসী কবি নীরবে এই নিদারুণ শোক কেবল যে জয় করিলেন, তাহা নহে; পুত্রশোক-দগ্ধ হৃদয়ে তিনি কি অপূর্ব্ব সান্ত্বনা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহার তৎকাল-রচিত নিম্নলিখিত গানখানি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়,—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে, তোমারি শোক-বারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া,

তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত,
আমারি ব'লে কেন ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।"

পুত্রের মৃত্যুর একদিন পরে এই গান রচিত হইয়াছিল। ইহা গাহিতে গাহিতে অনেকবার রজনীকান্তকে কাঁদিতে দেখিয়াছি।

সাধারণ দশজনের মত নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার না দিয়া, তিনি পুত্রশোক ভুলিবার জন্য আবার সংসারে মন দিলেন। ইহার কিছু পরে তিনি নাটোর ও নওগাঁওতে কিছু দিনের জন্য অস্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত হন।

রজনীকান্তের গান গাহিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ক্রমাগত পাঁচ ছয় ঘণ্টা এক সঙ্গে গান গাহিয়াও কখনও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তন্ময় হইয়া যখন তিনি স্বরচিত গান গাহিতেন, তখন তিনি আহার-নিদ্রা, জগৎ-সংসার সবই ভুলিয়া যাইতেন, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইতেন।

পরিচিত বা অপরিচিত যিনিই তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতেন। সংসারে তাঁহার সাহায্য করিবার কেহ ছিল না। তাহার উপর ওকালতিতে ঐকান্তিক অনুরাগ না থাকায় তিনি সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের পরিত্যক্ত যৎকিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জমিদারীর বন্দোবস্ত করিতে মহলে গিয়াও তিনি কেবল গান-বাজনায় সময় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিতেন,—এমনই তাঁহার গানের নেশা ছিল।

মক্কেলেরা তাঁহার দ্বারা সময় সময় কাজ পাইত না। প্রত্যেক প্রীতিভোজে, পারিবারিক বৈঠকে ও সাধারণ সম্মিলনে রজনীবাবুকে গান রচনা করিতে ও গাহিতে হইত। ব্রজে যেমন কানু ছাড়া গীত নাই, তেমনি রজনীকান্ত ছাড়া রাজসাহীর আনন্দোৎসব পূর্ণ হইত না। তিনি কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন না। প্রথমে পুস্তক ছাপাইতে রাজী হন নাই। কিন্তু শেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নির্বন্ধাতিশয়ে উহা ছাপাইতে বাধ্য হন। কান্তকবির প্রথম গ্রন্থ "বাণী"র প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের "মানসী"তে যে মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—

"কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনা-প্রতিভা-বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সঙ্গীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে, অন্যকে শুনাইবার পূর্ব্বে আমাকে শুনান হইয়াছে; মজ্‌লিসে সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে। তথাপি সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সরলতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনা-প্রতিভা ছিল, কিন্তু আত্মপ্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের একটি জ্ঞাতব্য কথা।

সে বার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্য একখানি ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে তীর হইতে রজনী ডাকিলেন,—

"দাদা! ঠাঁই আছে?"

তাঁহার স্বভাব এইরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্পকাল পূর্ব্বে "সোণার তরী" বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; হয় ত আশা ছিল, আমি বলিয়া উঠিব—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী,
আমারই সোণার ধানে গিয়াছে ভরি!'

আমি বলিলাম,—'ভয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে পার, আমি ধানের ব্যবসায় করি না।' এইরূপে দুইজনে কলিকাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বোলপুরে যাইবার সময়ে, রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকটে উৎসাহ পাইয়াও, রজনীকান্তের ইতস্ততঃ দূর হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্ত বলিল,—"সমাজপতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না!"

মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালোচনার ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল, তাহার এইরূপ অভ্রান্ত পরিচয় পাইয়া, প্রিয়বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া, নূতন কবির পরিচয় না দিয়া, গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গীত-সুধাপানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না; সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ইহার পর এলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের পরে রজনীর সঙ্গীত যখন দশজনে কাণ পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গিয়া আমার ইতস্ততের আরম্ভ হইল।

আমার ইতস্ততের যথেষ্ট কারণ ছিল। আমাকে পুস্তকের ও পুস্তকে মুদ্রিতব্য প্রত্যেক সঙ্গীতের নামকরণ করিতে হইবে, গানগুলির শ্রেণী-বিভাগ করিয়া, কোন্ পর্য্যায়ে কোন্ শ্রেণী স্থান পাইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতে হইবে এবং গ্রন্থের ভূমিকাও লিখিতে হইবে,—এই সকল সর্ত্তে রজনীকান্ত গ্রন্থ-প্রকাশের অনুমতি দিয়া, আমাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। তবে আমার পক্ষে দুই একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাম হইল—"বাণী"। সঙ্গীতগুলিরও একরূপ নামকরণ হইয়া গেল। শ্রেণীবিভাগও হইল, তাহারও নামকরণ হইল—'আলাপে, বিলাপে, প্রলাপে'।" ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্তের ত্রিধা-বিভক্ত "বাণী" প্রকাশিত হইল।

ইহার পরবৎসরে কবি আবার এক শোক পাইলেন। তখন তিনি সস্ত্রীক ভাঙ্গাবাড়ীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রথমা কন্যা শতদলবাসিনী ও দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র পীড়িত হইয়া পড়ে। জ্ঞানেন্দ্র রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু শতদলবাসিনী বাপ-মায়ের বুকে শেল হানিয়া অকালে চলিয়া গেল। শতদলের মৃত্যুর সময় কবির বাল্যসুহৃদ্ ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবির গৃহে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রজনীকান্ত তাঁহাকে লইয়া বাহির-বাটীতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "যাঁহার দান তিনিই লইয়াছেন"। তাহার পর হার্ম্মোনিয়াম লইয়া সেই গান,—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।"

যে গান তাঁহার তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রাণ

ফাটিয়া বাহির হইয়াছিল—সেই গানটি করুণ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য অনেকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। আনমনে বিভোর হইয়া গানটি গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে অন্তঃপুরে কান্নার রোল বর্দ্ধিত হইলে, রজনীকান্তের চৈতন্য হইল। তখন তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন, "শতদলের বিয়ের জন্য যে সমস্ত গহনা ও কাপড়-চোপড় কেনা হইয়াছে, সব ওর সঙ্গে দাও।"

তখনও জ্ঞানেন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। রজনীকান্ত সতীশবাবুকে বলিলেন, "চল সতীশ, ভিতরে যাই, একটিকে ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন; এটিকে কি করেন, দেখা যাক্।" তাঁহারা রোগীর শয্যাপার্শ্বে গমন করিয়া দেখিলেন, তখন জ্ঞানেন্দ্র সংজ্ঞাহীন। গভীর রাত্রিতে জ্ঞানেন্দ্র 'শতদল' 'শতদল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন তাহার ঘোর বিকার। কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে জ্ঞানেন্দ্র সে যাত্রা আরোগ্য লাভ করিল।

১৩১২ সালের ভাদ্রমাসে কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ "কল্যাণী" প্রকাশিত হইল। রজনীকান্ত এই গ্রন্থখানি তাঁহার বাল্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করেন। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের অনুরোধে কবি "কল্যাণী"র সঙ্গীতগুলিতে রাগরাগিণী ও তাল সংযুক্ত করিয়া দেন। এই বৎসরের মাঘ মাসে "বাণী"র দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে গানগুলিতে রাগিণী ও তাল দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে কবি সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নূতন গানও গ্রন্থ-মধ্যে সংযুক্ত করা হয়।

জনসাধারণে আগ্রহ করিয়া উহার অধিকাংশ সংখ্যা ক্রয় করিয়া—

ছিল। কিন্তু তিনি তখনও সাহিত্য-জগতে বিশেষ পরিচিত হন নাই। কবির ললাটে যশের টীকা পরাইয়া দিবার জন্য বঙ্গভারতী শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইহারই পরে কবির একখানি গানে বাঙ্গালার নগর-পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভক্তিনম্র হৃদয়ে কবিকে শ্রদ্ধাচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। ইহারই বিবরণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

কান্তকবি রজনীকান্ত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

স্বদেশী আন্দোলনে

যখন দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল যে, সমগ্র বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে, তখন বাঙ্গালীর চিত্তে একটা গভীর বিষাদের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। একই ভাষাভাষী, একই মাতার সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার সঙ্কল্পে বাধা দিবার নিমিত্ত সমগ্র বঙ্গদেশ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বদ্ধপরিকর হইল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির কোলে যাঁহারা একত্র মানুষ হইয়াছেন, যাঁহারা এক সঙ্গে হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক স্বতন্ত্র ও পৃথক্ করিবার জন্য রাজপুরুষেরা যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেই চেষ্টার মূলে, তাঁহাদের যতই শুভ ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকুক না কেন, তবুও সমগ্র বাঙ্গালীজাতি তাহার প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না।

লর্ড কর্জন বাহাদুর তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। বাঙ্গালীরা সকলে একযোগে নানাপ্রকার আলোচনা ও আন্দোলন করিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সে আকুল আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না— বাঙ্গালী তাঁহার স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার বশে এই ব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছেন। কর্ম্মী ইংরাজ ভাব অপেক্ষা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই চিরদিন স্বীকার করেন, ভাবের উৎপত্তি যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, প্রাণের স্পন্দন যে ভাবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়, তাহা সহজে তাঁহাদের ধারণায় আসে না। তাঁহারা মনে করিলেন, শাসনকার্য্যকে সুকর

করিবার জন্য তাঁহারা যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, বাঙ্গালী মাত্র ভাবের আতিশয্যে তাহাতে বাধা দিয়া দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছে। তাই রাজপুরুষেরা বাঙ্গালীর এই ভাবাধিক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য ১৩১২ সালের ৩০এ আশ্বিন (১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর) বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।*

পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী,—এই পাঁচটি বিভাগ লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত ছিল। বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পর, প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান, এই দুই বিভাগ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ এবং ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম,—এই তিন বিভাগ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ গঠিত হইল। বিহার প্রদেশ পশ্চিম-বঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইল এবং আসাম প্রদেশকে পূর্ব্ববঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা হইল। দুই বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র দুইজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন এবং রাজ্য-শাসনেরও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল।

ফলতঃ রাজপুরুষগণ এই বঙ্গ-ভঙ্গ-ঘোষণাদ্বারা দেশময় একটা ভাবের বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। বাঙ্গালীর প্রাণ ভাবের উন্মাদনায় অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই ঘোষণার কিঞ্চিদধিক দুই মাস পূর্ব্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার টাউন-হলে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদের জন্য একটি বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সমগ্র বাঙ্গালী একযোগে প্রতিজ্ঞা করে,—"যত দিন না বঙ্গ-ভঙ্গ

* সুখের বিষয়, গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর (২৬এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৮) যে দিন দিল্লীতে আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জের শুভ অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সে দিন তিনি স্বয়ং দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গদেশকে পূর্ব্বের ন্যায় এক করিয়া দিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

রহিত হয়, তত দিন আমরা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার ত দূরের কথা, স্পর্শও করিব না।" বঙ্গ-বিভাগ-ঘোষণার পর বাঙ্গালীর এই বিদেশী পণ্যবর্জ্জন-প্রস্তাব রাজপুরুষগণের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিল।

যাহা হউক, বঙ্গ-ভঙ্গের সংবাদে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে যেন এক গভীর বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বাঙ্গালার সেই দুর্দ্দিনকে (৩০এ আশ্বিন) স্মরণীয় করিবার জন্য, বঙ্গ-জননীর স্নেহাঞ্চল-ছায়া-বাসী একই ভাষাভাষী সন্তানগণের মধ্যে বহির্বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে অন্তর্মিলন গাঢ়তর করিবার মানসে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল বাঙ্গালীই সেই দিন অরন্ধনব্রত অবলম্বন করিয়া শুদ্ধচিত্ত ও সংযমী হইলেন এবং পরস্পরের মণিবন্ধে 'রাখী' বন্ধন করিয়া প্রাণের টান দৃঢ়তর করিলেন।

শক্তিমান্ রাজপুরুষগণের বঙ্গবিভাগ-আদেশ রহিত করিবার জন্য বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে এই যে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিয়াছিল, তাহাই 'স্বদেশী আন্দোলন' বলিয়া প্রখ্যাত। এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশের ও দশের মঙ্গলকামনায় এই কর্ম্মে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন লোকের মন দেশীয় শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইল—যখন দেশের লোক দেশজাত বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি দেশীয় কাপড়ের কল বাঙ্গালীর জন্য মোটা কাপড় বয়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মিহি বিলাতী বস্ত্র-পরিধানে অভ্যস্ত, বিলাসী বাঙ্গালী এই মোটা বস্ত্রের শুভাগমনকে যথোচিত স্বাগত-সম্ভাষণ করিতে পারিল না। দেশের সর্ব্বত্র একটা বিরাগের সুর ধ্বনিত হইল—"মোটা কাপড়"। ঠিক এই সময়ে সারাদেশ মুখরিত করিয়া সুদূর রাজসাহীর পল্লীবাসী কবি রজনীকান্ত মোহমুগ্ধ

বাঙ্গালীকে তাহার পবিত্র সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন,—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তু'লে নেরে ভাই ;
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।

ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু তাই বেচে, কাচ, সাবান, মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।

আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই,—
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মা'য়ের ঘরের জিনিস পাই।"

এই গানের সঙ্গে সঙ্গে কবি রজনীকান্তের নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর বহু দিনের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। কবির এই গান অলস, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল—তাহাকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তানের মত যে দিন রজনীকান্ত

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের বোঝা—মায়ের অনাবিল স্নেহাশিস-ভরা দান অতি যত্নে বাঙ্গালীর মাথার উপর তুলিয়া দিলেন, সেই দিন বাঙ্গালী রজনীকান্তকে আরও ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাইল। তাহার মানসনেত্রে কবির সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় ছবি প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মোটা সূতার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহের যে নয়ন-মনোরঞ্জন আলেখ্য তিনি ফুঁটাইয়া তুলিলেন, তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী-হৃদয় ভক্তিবিহ্বল ও পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিল।

কবি তাঁহার রোজনাম্‌চায় ১৩১৭ সালের ১৮ই বৈশাখ তারিখে লিখিয়াছেন,—"স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসে। আমি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'র কবি ব'লে তারা আমাকে ভালবাসে।" পুনরায় ২১এ বৈশাখ তারিখে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়কে তিনি লিখিয়াছেন,—"আমার মনে পড়ে, যে দিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে procession (শোভাযাত্রা) বের ক'রে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সে দিনের কথা মনে করে আমার আজও চক্ষে জল আসে।"

এই গান সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বঙ্গসাহিত্যের অকপট এবং নিষ্ঠাবান্ সেবক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, উল্লেখযোগ্য-বোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজা-পতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল-বাগানে প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুকিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত

নহে। যে গান দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,—নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের অশ্রু—বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।

স্বদেশীর সূচনাকালে লোকান্তরিত পশুপতিনাথবাবুর বাড়ীতে যে দিন এই গান প্রথম শুনিলাম—সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে এই অগ্নিময়ী বাণীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলাম।"

এই গান-রচনার ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। তাই সেই সম্বন্ধে আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"তখন স্বদেশীর বড় ধূম। একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' আফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং রাজসাহীর খ্যাতনামা আমার পরমশ্রদ্ধেয় ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সরকার আফিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জ্জিলিং মেলে বেলা এগারটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল হইয়া যাইত। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানের জন্য উৎসুক; সে বলিল,—'এই ত গান হইয়াছে, চল জল'দার ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা

হউক।' এই জন্য তাহারা সেই বেলা একটার সময় আসিয়া উপস্থিত। অক্ষয়কুমার আমাকে গানের কথা বলিলে—রজনী গানটি বাহির করিল। আমি বলিলাম "আর কৈ রজনী?" সে বলিল, "এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাইবে।" সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে না করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুই জনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল; রজনী ও অক্ষয় ৩০।৪০খানা গানের কাগজ লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দলের অন্যান্য ছেলেরা আসিয়া ক্রমে (ছাপা) কাগজ লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আমি সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বিডন্ ষ্ট্রীটের বাড়ীর উপরের বারান্দায় প্রমথবাবু ও আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত উপবিষ্ট আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। তখন আমরা শুনিলাম, ছেলেরা গাহিতেছে—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।" এইটি রজনীকান্তের সেই গান—যাহা আমি কয়েক ঘণ্টা আগে ছাপিয়া দিয়াছিলাম। গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল; তাহার পর ঘাটে, মাঠে, পথে, নৌকায়, দেশ-বিদেশে কত জনের মুখে শুনিয়াছি,—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই'।

এই গান সম্বন্ধে দেশের আরও দুইজন স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবরের উক্তি উদ্ধৃত করিব। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রদ্ধেয় সার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন,—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথম যে দিন আমার কাণে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতেই গীত-রচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।"

স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনও মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।"

বস্তুতঃ কান্তকবি এই একটিমাত্র গানে বাঙ্গালীর হৃদয়ে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কবির স্বদেশ-প্রীতি ও দেশাত্মবোধ যে কেবল এই গানটিতেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। কান্তকবি লোক-দেখান স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয় দেশের দুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়াছিল। গানের ভিতর দিয়া, কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার মর্ম্মভেদী অবরুদ্ধ অশ্রু ভাষায় রূপান্তরিত হইত। সভ্যতা ও সামাজিকতার প্রবীণতমা ধাত্রী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-জননী ভারতভূমির সন্তানগণ স্বাবলম্বনবিহীন হইয়া পড়িয়াছে—এই দৃশ্যে তাঁহার তেজস্বী হৃদয় ক্ষুব্ধ ও অধীর হইয়া উঠিত। তাঁহার 'বাণী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই, কিন্তু কবি কল্পনা-প্রসূত 'কাব্যনিকুঞ্জে'—

"ভারতকাব্যনিকুঞ্জে,—
জাগ সুমঙ্গলময়ি মা!"

বলিয়া তিনি জননীকে জাগাইলেন। তাহার পর তিনি দেশবাসীকে অঙ্গুলি-সঞ্চালনে দেখাইলেন—

"ওই সুদূরে সে নীর-নিধি—
যার তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ হৃদি,
কাঁদে ঐ সে ভারত, হায় বিধি!"

*　　　*　　　*

"জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ, 'জয় মা বরদে!'
দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি!"

কবি বুঝিলেন, সে যোগ্যতা দেশবাসীরা হারাইয়াছে;—তাই নিদারুণ অবসাদে গভীর মর্ম্মবেদনায় কবি গাহিলেন,—

"আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?"

তবে কি সত্য সত্যই মা আর ধূলিশয্যা হইতে উঠিবেন না? কবি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভৎ'সনা করিয়া কহিলেন—

"ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে;
নিদ্রালস নয়নে, এখনও র'বে কি শয়নে?
জাগাও বিশ্ব পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।"

পরে রজনীকান্ত মায়ের 'বোধন' করিলেন,—

"ঐ অভ্রভেদী ধবলশৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ,—
তাহে চরণযুগল রাখ্।
শুভ্র সুষমা চাহি না,—ভীম ভৈরবী রূপে জাগ্।

*　　　*　　　*

ধর ভৈরবরাগ, বিশ্ব হ'য়ে অবাক্,
চমকি ফিরিয়া চাক্।
সেই মত্ত তীব্র গান, গরলদিগ্ধ বাণ,
বিঁধিবে অবশ প্রাণ, হবে সুপ্তির অবসান;
কোটি শৃঙ্গ অধীর রঙ্গে বোধনগীতি গাক্;
নূতন জীবন পাক্ সিন্ধু তটিনী লাখ্,
পল্লী, বন, তড়াগ!"

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষের ন্যায় বঙ্গভঙ্গ-জনিত আর্ত্তনাদ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া এই সুদীর্ঘ সুপ্তির অবসান সূচিত করিল। বাঙ্গালী উঠিয়া বসিল; কিন্তু তখনও তাহার ঘুমঘোর কাটে নাই। সে ভাল করিয়া চাহিয়া নিজের গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারিতেছে না! কান্তকবি তাহা বুঝিলেন। তিনি নিদ্রা-মুক্ত ভাই-ভগিনীগণকে পথ দেখাইতে—তাহাদের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিতে চলিলেন; সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—

"আর, কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা, প্রেমেরি গঙ্গা বো'ক্;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ্।

একই লক্ষ্য, প্রীতি সখ্য, প্রাণের ঐক্য হোক্।

*　　　　*　　　　*

হবে সমৃদ্ধি, শক্তি-বৃদ্ধি, ছেড় না সিদ্ধিযোগ !"

আর সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলেন—

"হও কর্ম্মে বীর, বাক্যে ধীর, মনে গভীর ভাব ;
সে অপদার্থ—যে পরমার্থ ভাবে স্বার্থ-লাভ।"

কবি আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় মায়ের পূজার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন ;—

"তোরা আয় রে ছুটে আয় ;
ঘুমের মা আজ জেগে উঠে ছেলে দেখ্‌তে চায় !
সরা' ফুল বেলের পাতা, নোয়া সাত কোটি মাথা,
প্রাণের ভক্তি, দেহের শক্তি ঢাল্‌রে মায়ের পায়।"

দেশবাসী এইবার শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুগ-যুগ-সঞ্চিত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দীর্ঘসুপ্তির অবসানে কর্ত্তব্যের সন্ধানে চলিল। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে যেন কেমন আশঙ্কা, অবসাদ ও অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়—অর্দ্ধ পথেই যেন চরণ আর চলিতে চাহে না। কবির হৃদয়েও এই অবিশ্বাসের ও নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি অমনই দেশবাসীকে অভয়-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া উৎসাহ-ভরে গাহিলেন,—

"আর কি ভাবিস্ মাঝি বসে ?
এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে,
হাল ধরে থাক্ ক'সে।

এই হাওয়া পড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি,
মর্‌বি রে মনের আপশোষে।

* * *

এমন বাতাস আর ব'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না;
মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে,
পড়্‌বি রে নিজ কর্ম্মদোষে।"

* * *

"আজ, এক করে দে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে, আজ বেদ-কোরাণ!
(জাতিধর্ম্ম ভুলে গিয়ে রে)
(হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে)
থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্য পান।

* * * *

আমরা পাশাপাশি প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
এক ভাই না খেতে পেলে
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ?
বিলাত ভারত দুটো বটে—
দুয়েরি এক ভগবান্।"

আর চাষী ও তাঁতী, ভাই! তোমরাও কবির সেই অমর উক্তি মন দিয়া শোন,—

"ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান
মোটা হোক্, সে সোণা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় প'রব না আর যেচে পরের কাছে;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে;
দেখ্‌তো প'র্‌লে কেমন সাজে!"

*　　*　　*

"এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা;
ওদের কলের কাপড় বিশ হ'বেরে,—
না হয় তোদের হবে উনিশ।

তোদের সেই পুরাণো তাঁতে
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে;
আমরা মাথায় করে নিয়ে যাব রে,—
টাকা ঘরে ব'সে গুণিস্!"

স্বদেশীযুগে এমনি করিয়া কান্তকবি দেশবাসীকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শেষকথা' বাঙ্গালীকে আশায়, আশ্বাসে ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত করিয়াছিল,—

"বিধাতা আপ্‌নি এসে পথ দেখালে,
তাও কি তোরা ভুল্‌বি?
বিধাতা আপ্‌নি এসে জাগিয়ে দিলে,
তাও কি ঘুমে ঢুলবি?

বিধাতা পণ করা আজ শিখিয়ে দিলেন ;
তবু কি ভাই ভুল্‌বি ?
বিধাতা এত মানা ক'চ্ছে, তবু
দুধে তেঁতুল গুল্‌বি ?
বিধাতা ধান দিয়েছে, উপোস থেকে
পথে পথে বুল্‌বি ?'

রজনীকান্তের স্বদেশ-বিষয়ক সকল সঙ্গীতেই এমনি দেশাত্মবোধের ব্যঞ্জনা বিরাজমান। তাই কান্তকবির স্বদেশী গান বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সে যুগে অনেক ভগ্নহৃদয়, দুর্ব্বল ও নৈরাশ্যকাতর প্রাণে আশা, উৎসাহ ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু কান্তকবি শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা-সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি স্বয়ং অনুগত সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া সুদূর পল্লীতে—হাটে, মাঠে, ঘাটে সকলকে এই অভিনব অনুষ্ঠানের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা সরল ও সহজ ভাবে বুঝাইয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শান্তসুন্দর আকৃতি ও স্বভাবদত্ত সুমধুর কণ্ঠস্বর এ কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল। স্বদেশীর উন্নতিবিধায়ক সভা, সঙ্কীর্ত্তন, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে রজনীকান্ত সর্ব্বদাই অগ্রণী ছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাওয়া নিষিদ্ধ হইল, তখন রজনীকান্ত দৃপ্তকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন,—

"মা ব'লে ভাই ডাক্‌লে মাকে, ধর্‌বে টিপে গলা ;
তবে কি ভাই বাঙ্গালা হ'তে উঠ্‌বে রে 'মা' বলা ?

—মাল্লে কি আর 'মা' ডাক ছাড়্‌তে পারি ?
হাজার মার, 'মা' বলা ভাই কেমন ক'রে ছাড়ি ?"

তাঁহার "কেমন বিচার কচ্ছে গোরা," "ফুলার কল্লে হুকুম জারি" প্রভৃতি গান পূর্ব্ববাঙ্গালায় এক অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি দেশের চিন্তা নিমেষের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই হাসপাতালে রোগযন্ত্রণার কাতর অবস্থায় দীঘাপতিয়ার মহাপ্রাণ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়কে তাঁহার 'অমৃত' নামক গ্রন্থ-উৎসর্গকালে এই 'মন্দভাগিনী' জন্মভূমির স্নেহের দুলাল বলিয়াছিলেন,—

"কুমার! করুণানিধে! দেখো র'ল দেশ।"

কবি রজনীকান্ত দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ ভক্ত ও অকপট সেবক ছিলেন। কে আর এমন কায়মনোবাক্যে দীন-দুঃখিনী বঙ্গজননীর সেবা করিবে? কে আর এমন মর্ম্মস্পর্শী গানে এমন সঞ্জীবনী ও প্রাণোন্মাদকরী শক্তি সারা বাঙ্গালায় সঞ্চারিত করিবে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভগ্ন স্বাস্থ্যে

১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে ৪১ বৎসর বয়সে ৺পূজার ছুটির চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে রজনীকান্ত হঠাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার দেহে রোগের সূত্রপাত হইল; এই কাল ব্যাধি তাঁহাকে শেষদিন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নাই।

ঔষধ-সেবন আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী উপকার হইল না। অবশেষে শলা দিয়া মূত্রনালী পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা হইল; কিন্তু ইহা ত চিকিৎসা নয়—আসুরিক ব্যবস্থা, রোগের উপশম হইল না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জ্বর দেখা দিল। পরে ইহা ম্যালেরিয়ায় পরিণত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের যেমন স্বভাব সেইরূপ পাঁচ সাত দিন অতি প্রবল বেগে জ্বরভোগ হইত, আবার পাঁচ সাত দিন বেশ ভালই যাইত। এই জ্বরে তিনি বহুদিন ভুগিয়াছিলেন এবং ইহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। নানাবিধ চিকিৎসাতেও যখন কোন ফল হইল না, তখন চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি নৌকা ভাড়া করিয়া একমাস কাল পদ্মাগর্ভে নৌকাবাস করিলেন। ইহাতেও আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। কলিকাতায় তাঁহার আত্মীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া তিনি রোগের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইল না; শেষে তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কটকে

গমন করিলেন। সে সময়ে তাঁহার শ্যালিকা-পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ মহাশয় কটকের পোষ্ট অফিস-সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি অতি যত্নের সহিত রজনীকান্তকে নিজের বাসায় রাখিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মহানদী ও কাটজুড়ীর সঙ্গমের উপর অবস্থিত নয়নমনোহারী কটক নগরের সুবিমল বায়ু সেবনে এবং নিয়মিত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবহারে তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বস্বাস্থ্যও ফিরিয়া পাইতে লাগিলেন ; আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সরস কৌতুকামোদে ও গান-গল্পে কটক সহর মুখরিত করিয়া তুলিলেন। কটক-প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইল, তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইল ; সম্মুখে আনন্দের সুধা-ভাণ্ড পাইয়া তাহারা আকণ্ঠ পান করিতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা, বারটা পর্য্যন্ত সুরেশবাবুর বাসায় অবিশ্রান্ত গানের তরঙ্গ বহিত, আর সেই তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া রজনীকান্তের আত্মীয় ও বান্ধববর্গ অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেন। এই সময়ে দেশমান্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কটকে গিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য স্থানীয় টাউন হলে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় রজনীকান্তের সহিত বিপিনবাবুর প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সভার প্রারম্ভে এবং কার্য্যাবসানে রজনীকান্ত স্বরচিত গান গাওয়া হইতে নিস্তার পান নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "সদ্ভাব-কুসুম"-গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা তিনি কটকে অবস্থানকালে রচনা করেন। "সদ্ভাব-কুসুমের" কবিতাগুলি গল্পাকারে ছেলেদের জন্য রচিত।

দুই মাস কাল জ্বর একেবারেই আসিল না, মূত্রকৃচ্ছ্রতাও অনেকটা কমিল, তাঁহার দেহও সবল হইল ; চিকিৎসক বলিলেন,—আর

দুই এক মাস কটকে থাকিলেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন অপরিহার্য্য কার্য্যের জন্য তাঁহাকে রাজসাহীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। পথশ্রম, রেলপথে রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অনিয়মে তাঁহার শরীর আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজসাহীতে ফিরিবার দুই তিন দিন পরেই তাঁহার পূর্ব্ব বৈরী ম্যালেরিয়া আসিয়া আবার দেখা দিল।

ইহার পর রজনীকান্ত আবার কটকে গমন করিলেন; কিন্তু এবার আর পূর্ব্বের ন্যায় নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। কিছু দিন কটকে থাকিয়া, বিফলমনোরথ হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া প্রথমে ৫৫ নং কর্পোরেসন্ ষ্ট্রীটে ও পরে ৪২ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সপরিবার বাস করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ ছয় মাস কাল রোগের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি 'জুবিলি আর্ট একাডেমী'র অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় কিছুকাল ছিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া তিনি ডাক্তার ইউনান্‌কে দিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হইল না। তিনি রোজনাম্‌চায় লিখিয়াছেন—"আমি ম্যালেরিয়াতে তিন চার বৎসর ভুগে রাগ ক'রে ক'লকাতায় বাসা ক'রে ডাঃ ইউনানকে call (কল) দিয়ে সমস্ত history (ইতিহাস) বলি, সে বল্‌লে, 'তুমি patiently stick ক'রে (ধৈর্য্য ধ'রে) থাক্‌তে পার তো, সার্‌বে। But all your symptoms will reappear.'

(কিন্তু আপনার রোগের সমস্ত লক্ষণ আবার দেখা দেবে) reappear না reappear (দেখা দেবে না দেখা দেবে) ।—এক ডোজ্ ওষুধ খেয়ে এক মাসে চার বার জ্বর, সেই জ্বরেই যাই। নমস্কার ক'রে হোমিওপ্যাথিক্ ছাড়ি।" অবশেষে কবিরাজী চিকিৎসা করান স্থির হইল। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস সেন মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় রোগী একটু সুস্থ হইলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভের পূর্ব্বে আবার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া রাজসাহীতে ফিরিয়া যাইতে হইল।

১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে রাজসাহীতে ফিরিয়া গিয়া তিনি নিয়মমত কাছারীতে যাইতে আরম্ভ করিলেন ও পূর্ব্বের ন্যায় সকল কাজই করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এক এক দিন কাছারী হইতে জ্বর লইয়া তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিতেন; দশ বার দিন শয্যাগত থাকিয়া আবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। উপর্য্যুপরি জ্বর ভোগ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইল বটে, কিন্তু তবুও তাঁহার মানসিক প্রফুল্লতার হ্রাস হইল না। তখনও কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গান-বাজনা করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। কখন কখন কবিতা ও গান রচনা করিয়া অবসর-সময় যাপন করিতেন।

কার্ত্তিকমাসের প্রারম্ভে তিনি বিষয়কর্ম্মের জন্য ভাঙ্গাবাড়ীতে গমন করেন। তখন সেখানে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। জ্বরের উপর জ্বর আসিতে লাগিল। অগত্যা চিকিৎসার জন্য তিনি সিরাজগঞ্জে যাইতে বাধ্য হইলেন এবং একটি বাসা ভাড়া করিয়া তথায়

সপরিবার বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর কবিশিরোমণি মহাশয়ের সুচিকিৎসাগুণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করেন এবং রাজসাহীতে ফিরিয়া আসেন।

ফাল্গুনমাসে তিনি দেশে গিয়া আবার জ্বরে পড়িলেন, এবারও পূর্ব্বের ন্যায় কবিশিরোমণি মহাশয়ের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশে

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশোৎসব ১৩১৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইল। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা হইতে এ আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাহিত্যসেবিগণ কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। রাজসাহী হইতে বাণীভক্ত রজনীকান্ত বাণীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

তিনি কলিকাতায় আসিয়া রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। উৎসবের পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নে আমি হঠাৎ দীনেশবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে রজনীবাবুকে আমি কখন দেখি নাই, পত্রবিনিময়ে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম মাত্র। ইহার প্রায় চারি বৎসর আগে আমার সম্পাদিত "জাহ্নবী" পত্রিকায় "সিন্ধুসঙ্গীত" ও "আয়ু-ভিক্ষা" নামক তাঁহার দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনেশ-বাবু তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ইনিই রাজসাহীর কান্তকবি।" পরিহাস-প্রিয় কবি তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"রাজসাহীর সকলের নয়, তবে একজনের বটে।"

দেখিলাম তিনি একটি হার্ম্মোনিয়ম্ লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি যে একজন সুগায়ক তাহা আমি জানিতাম না। তখন জানিতাম না যে, "বাণী"র কবি 'সুরসপ্তকে' বীণা বাঁধিয়া গভীর পূর্ণওঙ্কার সাম-

ঝঙ্কারে দূর বিমান কাঁপাইয়া তোলেন; তখন জানিতাম না যে, শ্বেত-পদ্মাসনা বাগ্দেবীর রাতুল চরণকমলে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার অমৃতোপম স্বরলহরী মূর্ত্তিমতী রাগরাগিণীর সৃষ্টি করে; তখন বুঝি নাই যে, তাঁহার কণ্ঠামৃতপানে হৃদয়ের পরতে পরতে মুরলীরবপূরিত বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জের নয়নমনোহর ভুবনমোহন ছবি ফুটিয়া উঠে; তখন বুঝি নাই যে, সেই জনপ্রিয় রসরাজ রজনীকান্তের মনোরম ভগবান্-টলানো—সেই মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ হরিনামগান-শ্রবণে জগৎ ভুলিতে হয়, সংসার ভুলিতে হয়, আত্মহারা হইতে হয়, আর ভগবদ্-রসে আপ্লুত হইয়া আমার ন্যায় অভাজনের মাথাও আপনা হইতে মাটীতে লুটাইয়া পড়ে।

কবি প্রথমেই গাহিলেন ;—

"তুমি, নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছা'য়ে ;
তব, পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্, মোর মোহ-কালিমা ঘুচা'য়ে।"

এই গানটি পূর্ব্ব হইতেই আমার জানা ছিল, দুই একজন সুকণ্ঠ বন্ধুর কণ্ঠ হইতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কবির নিজের কণ্ঠে যাহা শুনিলাম, তাহা অপূর্ব্ব,—অবর্ণনীয়। গান শুনিয়া আমার নীরস, শুষ্কপ্রাণে প্রীতির মন্দাকিনীধারা ছুটিল; আঁখির কোল আর্দ্র হইয়া উঠিল। "গানাৎ পরতরং নহি" যে কেন তাহা বুঝিলাম, আর জগৎ-কবি শেক্‌সপীয়রের সেই উক্তি—

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils.
* * * * * *
Let no such man be trusted."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির

INDIA PRESS, CALCUTTA.

এবং তাহার যাথার্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু সে কোন্ গান যাহা জগতে অতুল্য, সে কোন্ গান যাহা শুনিয়া মুগ্ধ না হইলে বুঝিতে হইবে শ্রোতার আপাদমস্তক সয়তানিতে ভরা? ইহা সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত যাহা গায়কের—ভক্তের হৃদয় নিংড়াইয়া কমকণ্ঠ হইতে ধীরে ধীরে বহির্গত হয় এবং বিন্দু বিন্দু বারিপাতের ন্যায় শ্রোতার অজ্ঞাতসারে তাহার দেহ, মন, প্রাণ আপ্লুত করে। গানের মত গান হইলে, আর আপনমনে প্রাণ ঢালিয়া গাহিতে পারিলে, তবে না লোকের মন ভিজে?

এই সঙ্গীতই জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তাই এই সঙ্গীত-শ্রবণে একদিন নদীয়ার মহাপাপী জগাই-মাধাইয়ের পাষাণ-প্রাণে ভক্তির পীযূষধারা পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল অমৃতবর্ষণের পর রজনীকান্ত ক্ষান্ত হইলেন—আমিও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার বচন-সুধা পান করিয়া বিদায় লইলাম।

পরদিন ২১এ অগ্রহায়ণ রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশদিন—বাঙ্গালীর সারস্বত সাধনার শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার মঙ্গলবাসর। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় কার্য্যারম্ভ হইবার কথা, কিন্তু চারিটার মধ্যেই পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতলের হল জনসঙ্ঘে ভরিয়া গেল। সেদিন লোকের কি উৎসাহ! কি আনন্দ! সকলের চোখে মুখে আনন্দের কি অপরূপ দীপ্তি! এখনও চোখের উপর সে দিনের সেই ছবি ভাসিতেছে। পরিষদের তৎকালীন সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে উপরে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইল। নিম্ন-তলের হলও লোকে ভরিয়া গিয়াছে—বাহিরে রাস্তায়ও লোকে লোকারণ্য। নিম্নতলের হলেও একটি স্বতন্ত্র সভার অধিবেশন হইল এবং

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। রজনীকান্ত বিপুল জনতা ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারিলেন না, নিম্নতলের সভায় রহিয়া গেলেন। রবীন্দ্রবাবু সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে রজনীকান্তের পরিচয় দিলেন এবং সঙ্গীতালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। সভাপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রজনীকান্ত সেই সভায় নিম্নলিখিত দুইখানি গান গাহিয়াছিলেন,—

সৃষ্টির বিশালতা

লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ
নীল-গগন-গর্ভে ;
তীব্রবেগ, ভীমমূর্ত্তি,
ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।

কোটি-কোটি-তীক্ষ্ণ উগ্র
অনল-পিণ্ড-তারা ;
দৃপ্তনাদে. ঝলকে ঝলকে,
উগরে অনল-ধারা।

এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
প্রকটে শক্তি-বিন্দু ;
নমি সে সর্ব্বশক্তিমান্
চির কারণ-সিন্ধু !

সৃষ্টির সূক্ষ্মতা

স্তূপীকৃত, গণন-রহিত
ধূলি, সিন্ধু-কূলে ;
কোটি কীট করিছে বাস,
এক সূক্ষ্ম ধূলে।

কীট-দেহ-জনম-মৃত্যু,
নিমিষে কোটি, লক্ষ ;
ভুঞ্জে দুঃখ, হরষ, রোষ,
প্রীতি, ভীতি, সখ্য।

এই সূক্ষ্ম-কৌশল, রটে
যাঁর জ্ঞান-বিন্দু ;
নমি সে চির-প্রমাদ-শূন্য
চিৎ-স্বরূপ-সিন্ধু !

সেই বিপুল জনসঙ্ঘ ধীর, স্থির, গম্ভীরভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় সে দিব্য-সঙ্গীত শুনিতেছিলেন ; হঠাৎ গান থামিয়া গেলে তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল, আর সমস্বরে শতকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—"এ গান কোথায় ছাপা হয়েছে ?" কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিলেন যে, গান দুইটি ছাপা হয় নাই। পরক্ষণেই সকলে সেই দুইটি মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এ সঙ্গীত ত একবারমাত্র শুনিলে আশা মিটে না, তৃপ্তি হয় না, প্রাণ ভরে না,—বার বার শুনিতে ইচ্ছা করে, পুনঃ পুনঃ

পড়িতে ইচ্ছা করে, ভাল করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করে। তাই গান দুইটি মুদ্রিত দেখিবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীর এত আগ্রহ!

রজনীকান্ত তাঁহার রোজনাম্‌চায় লিখিয়াছেন—"এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে বলেন, আমি দীনেশকে সঙ্গে ক'রে রবি ঠাকুরের বাড়ী তার পরদিন সকাল বেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।"

পরিষদের এই সভাস্থলে এবং এই সময় কলিকাতায় অবস্থানকালে রজনীকান্তের সহিত বঙ্গের বহু সাহিত্যসেবক ও সাহিত্য-বন্ধুর পরিচয় হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী-অধিবেশনে

পরিষদের গৃহপ্রবেশোৎসবের প্রায় দুইমাস পরে, ১৩১৫ সালের ১৮ই ও ১৯এ মাঘ রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন-উপলক্ষে রাজসাহীতে কলিকাতা এবং বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহু সুধী ও সাহিত্যিকের সমাগম হইয়াছিল। এই সময়েই শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য্য ৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি দেশমান্য ব্যক্তির সহিত রজনীকান্তের পরিচয় হয়। সকলকেই তিনি তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে, অমায়িক ব্যবহারে এবং সরল কথাবার্ত্তায় একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। এই সম্বন্ধে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"সেই সময়ে (রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে) রজনী-বাবুর সহিত পরিচয়ের প্রথম সুযোগ ঘটে। সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা-সঙ্গীত প্রভৃতি করাইবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন,—তিনি থাকিতে এ ভার আর কে লইবে? সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে রাজ-সাহীর সাধারণ পুস্তকাগারে সম্মিলনে উপস্থিত সাহিত্যিকগণের আনন্দ-বিধানার্থ আয়োজন হয়। সম্মিলনের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে

রজনীবাবুই অভ্যর্থনা-ব্যাপারের প্রাণস্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া স্বরচিত হাসির গান এক একটা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; সভাস্থল হাস্যরবে মুখরিত হইয়া উঠিল, নির্ম্মল হাস্য-রসের উৎস হইতে নিঃসৃত সুধাপান করিয়া সকলেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন। জানিতাম, আমাদের এই দুর্দ্দিনে প্রাণে প্রফুল্লতা সমাগম করিয়া সজীব রাখিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের এক দ্বিজেন্দ্রলালই আছেন, জানিলাম, উভয়ে সহোদর—রজনীকান্ত তাঁহার যোগ্যতম সহকারী।

সভাভঙ্গের পর রজনীবাবু আমার নিকট আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন। এরূপ সাদর সানুরাগ সম্ভাষণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁহার গানে ও কবিতায় যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার সহৃদয়তায় ততোধিক মুগ্ধ হইলাম।”

প্রথম দিনের সকাল বেলার সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রজনীকান্ত আসিয়া আমাকে তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

সভারম্ভের পূর্ব্বে রজনীকান্ত নিজ রচিত নিম্নের গানখানি গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে অন্য কয়েকজনকে এই গানটি শিখাইয়াছিলেন, তাঁহারাও কবির সহিত এই গানে যোগ দিয়াছিলেন।

“স্বস্তি! স্বাগত! সুধী, অভ্যাগত, জ্ঞান-পরব্রত,
পুণ্য-বিলোকন;
বিদ্যা-দেবী-পদ-যুগ-সেবী লোক নিরঞ্জন,
মোহ-বিমোচন।
লহ সব শাস্ত্রবিশারদবর্গ,—
দীন-কুটীরে প্রীতির অর্ঘ্য;
দেব-প্রভাময় অতিথি-সমাগমে, জীর্ণ উটজ, মরি,
আজি কি শোভন!

হে শুভ-দরশন, ভারত-আশা !
মুগধ প্রাণে নাহিক ভাষা ;
ধন্য, কৃতার্থ, প্রসন্ন, বিমোহিত, দীন হৃদয় লহ,
হৃদয়-বিরোচন !”

তাঁহার স্বাগত-সঙ্গীতে সমবেত সকলে মুগ্ধ ও বিমোহিত হইলেন। আনন্দ-বিস্ফারিত সহস্র চক্ষুর কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপে তিনি যেন কেমন একটু জড়সড় হইয়া পড়িলেন।

বেলা প্রায় বারটার সময় প্রথম অধিবেশন ভঙ্গ হইল। আমি কিন্তু মহা ভাবনায় পড়িলাম। এইবার আমাকে রজনীকান্তের আতিথ্য গ্রহণ করিতে যাইতে হইবে। আমি ত তাঁহার বাড়ী চিনি না, লোক-সমুদ্রের মধ্য হইতে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া নিজ-গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার সেদিনকার আদর-আপ্যায়ন, সেবা-যত্ন এবং আদর্শ আতিথেয়তার কথা আমি আমরণ ভুলিতে পারিব না। যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সহজ-সরল ব্যবহার আমি সে দিন তাঁহার কাছে পাইয়াছি, তাহা অপ্রত্যাশিত, অপূর্ব্ব। রাজসাহীতে সমাগত শত শত মনস্বী ও সুধীবর্গের মধ্য হইতে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে গৃহে লইয়া গিয়া তিনি যে মধুর আদর-যত্নে আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা আজ লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিতে আমি শ্লাঘা বোধ করিতেছি। সেই দিন কবির হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভাবের পরিচয় পাইয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।—সেটি তাঁহার উচ্চ-নীচ-অভেদ-জ্ঞান—সাম্যভাব। এই আন্তরিকতাশূন্য সমাজে, এই ইংরাজি-শিক্ষিত আত্মম্ভরিতাভরা ইঙ্গবঙ্গ বাবু-মহলে, এই ‘হামবড়াই’য়ের যুগে, এই ‘ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই’য়ের

দিনে যিনি বড় ও ছোটকে, ধনী ও নির্ধনকে, পণ্ডিত ও মূর্খকে, গুণী ও গুণহীনকে, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমান চক্ষে দেখিয়া, সমানভাবে হৃদয়ের উৎসনিঃসৃত প্রীতি-ধারা দ্বারা অভিষিক্ত করিতে পারেন, দ্বিধাশূন্যভাবে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন, আবেগভরে জড়াইয়া ধরিতে পারেন, আপন জন ভাবিয়া কোলে টানিয়া লইতে পারেন, তিনি বিধাতার সার্থক সৃষ্টি, তিনি অ-মানুষ —তিনি দেবতা।

রজনীকান্তের স্নেহ ও যত্ন, প্রীতি ও ভালবাসা, আদর ও অভ্যর্থনা, সৌজন্য ও আতিথেয়তা এমনই অকৃত্রিম, এমনই আন্তরিক, এমনই সরল যে, তাহা কেবল আত্মারই উপভোগ্য, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, অন্ততঃ সে ক্ষমতা আমার নাই। নিজে কাছে বসাইয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করান,' স্নেহময়ী জননীর মত কোলের কাছে আহার্য্য বস্তুগুলি একটি একটি করিয়া আগাইয়া দিয়া 'এটা খান', 'ওটা খান' বলিয়া সেই যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাহার পর আহারান্তে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গান শোনাইয়া মধুরেণ সমাপন—সে সব আজ একটি একটি করিয়া চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিতেছে, আর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছে। তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিবালাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের কমকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত শোনাইয়া দেন। আপনহারা হইয়া তন্ময়চিত্তে সেই গান শুনিয়াছিলাম।

তাহার পর কত হাস্য-পরিহাস, কত গল্প-গুজব, কত আলোচনা দ্বারা গৃহসমাগত বন্ধু-হৃদয়ে আনন্দ-ধারা ঢালিয়া দিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যিনি রজনীকান্তের সহিত অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই আমার এ সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিবেন। সর্ব্বশেষে তিনি আমাকে তাঁহার পিতা ৺গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়-প্রণীত "পদচিন্তামণিমালা" দেখাইলেন। ইহা ব্রজ-ভাষায় রচিত কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সমষ্টি।

বৈকালের অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে রজনীকান্ত স্বরচিত—

"তিমিরনাশিনী, মা আমার!
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ-কমল ধরি,
চিন্ময়ী মূরতি অখিল-আঁধার!" ইত্যাদি

"বাণীবন্দনা" গাহিয়াছিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে রাজসাহীর সাধারণ পুস্তকাগারে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য একটি সান্ধ্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। সেখানেও রজনীকান্ত সমভাবে বিরাজমান্—তাঁহার হাসির গান, স্বদেশ-সঙ্গীত ও রহস্যাবৃত্তি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল, আর তাঁহার সুধাকণ্ঠ পুত্রকন্যাদ্বয়ের 'সে আমাদের হিন্দুস্থান' নামক গানের ঝঙ্কারে শ্রোতৃমণ্ডলীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন-প্রারম্ভেও রজনীকান্ত তাঁহার 'জ্ঞান' নামক নিম্নলিখিত গান গাহিয়া জন-সাধারণের চিত্ত বিনোদন করেন—

"জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান সেব্য, জ্ঞান পুরুষকার,
জ্ঞান কুশল-সার;
জ্ঞান ধর্ম্ম, জ্ঞান মোক্ষ, জ্ঞান অমৃত-ধার;
জড় জীবন যার, অলস অন্ধকার,
জ্ঞান বন্ধু তার।" ইত্যাদি

দ্বিতীয় দিনে সম্মিলনের কার্য্য-সমাপ্তির পূর্ব্বে যখন কবি "বিদায়-সঙ্গীত" আরম্ভ করিলেন, যখন গাহিলেন,—

"সুখের হাট কি ভেঙ্গে নিলে !
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে রইল গাঁথা,
(এই) ভাঙ্গা বীণায় কি সুর দিলে !
দুঃখ দৈন্য ভুলে ছিলাম,
ডুবে আনন্দ সলিলে ;
(ওগো) দুদিন এসে দীনের বাসে,
আঁধার ক'রে আজ চলিলে।
(মোদের) কাঙ্গাল দেখে দয়া ক'রে
নয়নধারা মুছাইলে ;
(আমরা) জ্ঞান-দরিদ্র দেখে বুঝি,
দু'হাতে জ্ঞান বিলাইলে !
(এই) শ্রেষ্ঠ দানের বিনিময়ে,
কি পাইবে ভেবেছিলে ?
(ওগো) আমরা ভাবি দেবতা তুষ্ট,
প্রীতিভরা প্রাণ সঁপিলে !
পাওনি যত্ন পাওনি সেবা,
কষ্ট পেতে এসেছিলে !
(মোদের) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখ্‌বো বেঁধে,
রইবে না হাজার কাঁদিলে ;
(সুধু) এই প্রবোধ যে হর্ষবিষাদ,
চিরপ্রথা এই নিখিলে !"

তখন বিজয়া-দশমীর প্রতিমা-বিসর্জ্জনান্তে সানাইয়ের চিরপরিচিত করুণ রাগিণী হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইয়াছিল।

অপরাহ্নে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের ভবনে বিদায়-সভাস্থলেও রজনীকান্ত সঙ্গীত-সুধা-বিতরণে কার্পণ্য করেন নাই।

বিদায় লইলাম, গাড়ীতে উঠিলাম, কিন্তু প্রাণটুকু রজনীকান্তের কাছেই ফেলিয়া আসিলাম। নাটোর যাইবার সমস্ত পথটা—জ্যোৎস্না-বিধৌত-দীর্ঘ পথে কেবলই মনে হইতে লাগিল—রজনীকান্তের কথা। একজন লোক যে এমন করিয়া নানা মূর্ত্তিতে এত আনন্দ দিতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। একজন লোকের ভিতর একাধারে কবি, সুগায়ক ও কর্ম্মবীরের ত্রিমূর্ত্তি যে সমভাবে পূর্ণরূপে বিকসিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহাও আমি পূর্ব্বে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

বাস্তবিকই এই রাজসাহী-সম্মিলনে রজনীকান্তের প্রকৃত চিত্র, তথা প্রকৃতি-চিত্র আমরা স্পষ্টীকৃতভাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম—পবিত্রতা ও সরলতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে বিরাজমান্, আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম, যিনি পরকে এইরূপ আপন করিতে পারেন তিনি মহতো মহীয়ান্। তাই রাজসাহী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ 'বসুমতী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"আর আমরা ভুলিতে পারিব না—রাজসাহীর—সুধু রাজসাহীর কেন, বঙ্গের কবি রজনীকান্তকে। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'র কবির সাক্ষাৎ সন্দর্শনে ও সৌজন্যে আমরা আমাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছি। রজনীকান্তের মোহ এখনও আমাদের ছাড়ে নাই।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জীবন-সন্ধ্যায়

কালরোগের সূত্রপাত

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজসাহীতে একদিন পান চিবাইতে চিবাইতে চূণে রজনীকান্তের মুখ পুড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সেই পান ফেলিয়া দিয়া তিনি মুখ ধুইলেন। ইহার দুই তিন দিন পরে তাঁহার গলার ভিতরে কেমন সুড় সুড় করিতে লাগিল, অল্প ব্যথা বোধ হইল। যখন উহা অল্পে সারিল না, তখন তিনি ডাক্তারদের দেখাইলেন এবং নিয়মিত ভাবে ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা তখন ইহাকে'ফ্যারিন্‌জাইটিস্‌,' 'ল্যারিনজাইটিস্‌' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। ইহা যে রোগই হউক না কেন, সেই রোগ সম্পূর্ণ ভাল না হইতেই কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রজনীকান্তকে রঙ্গপুর যাইতে হয়।

সেখানে গিয়া তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি রঙ্গপুরে পৌঁছিলেন, সেই দিনই হার্ম্মোনিয়ম লইয়া রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত গান করেন। পরদিন জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহে সন্ধ্যার সময় স্থানীয় সরকারী উকীল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে তাঁহাকে গান গাহিতে হইল। আমি নিজে একবার রঙ্গপুরে গিয়াছিলাম, তখন রায়বাহাদুর আমাকে বলিয়াছিলেন,—"সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১টা, ১॥টা পর্য্যন্ত রজনীবাবু একা অক্লান্তভাবে হার্ম্মোনিয়ম

বাজিয়ে গান করেন। আমার এই দুইটি ঘরে প্রায় দু'শর উপর লোক জমা হ'য়েছিল—মশা মাছি যাবার পর্য্যন্ত স্থান ছিল না। এই গান গে'য়ে তিনি রঙ্গপুরের বহু লোককে এক মুহূর্ত্তে আপনার ক'রে ফেলেন।"

রঙ্গপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্তের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবিশ্রান্ত গান গাওয়া এবং অতিরিক্ত রাত্রিজাগরণই এই বৃদ্ধির কারণ। ক্রমে তাঁহার স্বরভঙ্গ হইল এবং গলার ব্যথা দিন দিন বাড়িতে লাগিল; পরিবারবর্গ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুই তিন মাস নিয়মমত ঔষধ-সেবন, প্রলেপ-প্রয়োগ এবং 'স্প্রে' ব্যবহার করিয়াও যখন রোগের উপশম হইল না, তখন আত্মীয়-স্বজনের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল—বুঝি বা এই ব্যাধি মারাত্মক ক্যান্সারে পরিণত হয়। তাঁহাদের নয়নের নিধি উমাশঙ্কর যে এই দুষ্ট রোগেই কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে!

এই রোগ-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া রজনীকান্ত কিন্তু প্রায় প্রত্যহই কাছারী যাইতেন, মোকদ্দমার সওয়াল-জবাব ইত্যাদি করিতেন। বিকালে বাসায় ফিরিয়া তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, এমন কি সময়ে সময়ে কথা কহিতে তাঁহার খুব কষ্ট বোধ হইত। অতিরিক্ত স্বর-চালনায় এবং গুরু পরিশ্রমে, তাঁহার রোগ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, স্বর বিকৃত হইল এবং খাদ্যদ্রব্য-গ্রহণে কষ্ট হইতে লাগিল; আর সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঘা দেখা দিল। কবি তাঁহার রোজনাম্‌চায় ১৫ই মার্চ্চ তারিখে লিখিয়াছেন,—"হঠাৎ হাস্‌তে হাস্‌তে গলায় ঘা হ'ল, তাই নিয়ে রংপুরে গি'য়ে তিন দিন গান ক'রতে হ'ল। তারপর থেকেই এই দশা"। পুনরায় ২৬এ মার্চ্চ তারিখে তিনি লিখিয়াছেন,—"First historyটা (প্রথম কথাটা) তোদের মনেই থাকে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে পান খেয়ে মুখ পুড়ে,

তারপর জিভের বাঁ ধার দিয়ে মটরের মত গুড়ি গুড়ি হয় ও বেদনা, গাল ফুলা; ক্রমে সেই যন্ত্রণা বাড়ে; ক্রমে তা থেকে ঘা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। গলনালী আর শ্বাসনালী দুটো জিনিষ আছে। আমার ভাত খাবার নালীর মধ্যে ঘা নয়, নিঃশ্বাসের নালীর মধ্যে ঘা, সেখানে কোনও ঔষধ লাগান যায় না। এই সময়ে জিভের বাঁ পাশ দিয়ে বরাবর ছোট ছোট মটরের মত গোটা, ব্যারামের সূত্রপাত থেকেই আছে।"

যে সময়ে রজনীকান্তের গলায় ঘা দেখা দেয়, সেই সময়ে তাঁহার ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী তাঁহার জন্য রাজসাহীতে কিছু ভাল ছাঁচি পান এবং উৎকৃষ্ট চিঁড়া পাঠাইয়া দেন। সেইগুলি পাইয়া তিনি ক্ষীরোদবাসিনীকে লিখিয়াছিলেন,—

"ভগ্নি, তোমার প্রেরিত পান ও চিঁড়া পাইলাম। উহারা আমার অতি প্রিয় হইলেও পরিত্যাজ্য; কারণ চিকিৎসকগণ আমাকে ঐ দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কয়েকদিন হইল আমার গলার ভিতর একটু ঘা দেখা দিয়াছে। ডাক্তারেরা ঠিক্ বলিতে পারিতেছেন না উহা কি রোগ। যদি 'ক্যান্সার' হয়, তবে সত্বরই তোমাদের মায়া কাটাইতে পারিব।"

রোগের বৃদ্ধি ও কলিকাতায় আগমন

হঠাৎ রোগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, মাস ও তিথি বিচার না করিয়াই রজনীকান্ত ১৩১৬ সালের ২৬এ ভাদ্র, পরিবারবর্গের সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা—নিজের প্রিয় কর্ম্ম-ভূমি রাজসাহীর নিকট হইতে ইহাই তাঁহার চিরবিদায়-গ্রহণ! যে রাজসাহীর কোমল অঙ্কে উপবেশন করিয়া কবি নব নব প্রাণোন্মাদকর গীত রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, যেখানে তাঁহার কবি-প্রতিভা

বালার্কের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার, সুখ ও সৌভাগ্যের লীলা-নিকেতন, সেই আত্মীয়-স্বজন-সুহৃৎ-শোভিত, সঙ্গীত-তরঙ্গ-পরিপ্লাবিত আনন্দ-ক্ষেত্র রাজসাহী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। যখন মেডিকেল কলেজের 'কটেজ'-গৃহে দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন তিনি একদিন উন্মত্তের ন্যায় বিচলিতভাবে লিখিয়াছিলেন,—"তোরা আমাকে রাজসাহী নিয়ে যা, আমি সেইখানে ম'রব।" এই সময়ে তাঁহাকে লিখিতে দেখিয়াছি—"রাজসাহীর লোক দেখ্‌লে মনে হয় আমার নিজের মানুষ।" হায় রাজসাহী! কোন্‌ অপরাধে তোমার স্নেহ-পীযূষ-বর্দ্ধিত সন্তানের প্রাণের কামনা মৃত্যুকালেও পূর্ণ করিলে না? সে ত চিরদিন কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিয়াছিল!

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কটক হইতে কলিকাতায় বদলী হইয়া ৫৭ নং সার্পেণ্টাইন্‌ লেনে বাস করিতেছিলেন। রজনীকান্ত কলিকাতায় আসিয়া সপরিবার তাঁহার বাসাতেই উঠিলেন।

প্রথমে ডাক্তার ওকেনেলি সাহেবকে দেখান হইল। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক বৈদ্যুতিক আলো ও বহুবিধ যন্ত্র-সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিলেন এবং ইহা ক্যান্‌সার প্রতিপন্ন করিয়া বলিলেন যে, অতিরিক্ত স্বরচালনাই (Overstraining of the voice) বোধ হয় এই রোগের উৎপত্তির কারণ। এই রোগের চিকিৎসার এখনও কোন প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবিত হয় নাই। এই রোগের অনিবার্য্য পরিণাম যে মৃত্যু, তাহা ডাক্তার সাহেব রোগীর নিকট ব্যক্ত না করিলেও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি রজনীকান্ত ডাক্তারের মুখ-ভাব দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিলেন এই মারাত্মক রোগের কবল হইতে তাঁহার আর নিস্তার নাই। তাই

তিনি ডাক্তার সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন,—"বলুন এটা মারাত্মক—সাদা কথায়—ক্যান্সার কি না? (Tell me sir, if it is malignant or plainly, cancer ?) তখন অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তার উত্তর করিলেন, "মারাত্মক একথাও বলিতে পারি না, আর মারাত্মক নয় তাও বলিতে পরি না।" (I cannot say it is malignant. I cannot say it is not malignant.) তবে রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

ওকেনেলি সাহেবের চিকিৎসা ও ব্যবস্থা চলিতে লাগিল; ইহার পরে সাহেব আরও দুইবার পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু রোগের হ্রাস হইল কৈ? কাজেই কলিকাতার প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণকে দেখান হইল, রোগী তাহাদের ব্যবস্থামত ঔষধাদি ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল,—আহার করিতে যন্ত্রণা হইতে লাগিল, মাঝে মাঝে জ্বর হইতে লাগিল, গলার বেদনা ও ফুলা বৃদ্ধি হইল এবং অনবরত কাশিতে কাশিতে রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল।

সেই সময়ে ৺কাশীধামে বালাজি মহারাজ নামে একজন অবধূত চিকিৎসক ছিলেন। রজনীকান্তের স্বগ্রামবাসী আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু বহরমপুরের বিখ্যাত সরকারী উকীল রাধিকামোহন সেনের উৎকট দুরারোগ্য-ব্যাধি তিনি নিরাময় করেন এবং আরও অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরাম করিয়াছিলেন। এ সকল কথা রজনীবাবু পূর্ব্বাবধিই জানিতেন। কাজেই যখন তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, কলিকাতার চিকিৎসা তথা পার্থিব চিকিৎসায় তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিল না, তখন ভগবৎকৃপা-লাভের জন্য, দৈব-শক্তির সাহায্য লইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশ্বেশ্বরের চরণ-প্রান্তে গিয়া দৈব ঔষধ ব্যবহার

করিলে, তিনি রক্ষা পাইবেন—তখন ইহাই তাঁহার ধারণা। তাই স্বামীজীর চিকিৎসাধীন থাকিবার জন্য রজনীকান্তের প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি রাধিকাবাবুকে চিঠি লিখিয়া বালাজির কাশীর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন। তখন কাশী যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

কাশীধামে কয়েক মাস

কার্ত্তিক মাসে রজনীকান্ত সপরিবার ৺কাশীধামে যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত অর্থাভাব বশতঃ তিনি 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' গ্রন্থ-স্বত্ব—মায় অবিক্রীত দুইশত পুস্তক কেবল চারিশত টাকায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এই দুইটি রত্ন বিক্রয় করিয়া কবি যে মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষাতেই বলি না কেন? তিনি রোজনাম্‌চায় লিখিয়াছেন,—"আমার এমন অবস্থা হ'ল যে, আর চিকিৎসা চলে না, তাইতে বড় আদরের জিনিষ বিক্রয় ক'রেছি। হরিশ্চন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় ক'রেছিলেন। হাতে টাকা নিয়ে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। আর ত তেমন মাথা নাই। আর ত লিখ্‌তে পারব না। যদি বাঁচি জড় পদার্থ হ'য়ে রইলাম।"

কাশীতে রামাপুরায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া রজনীকান্ত প্রথমে থাকেন, তৎপরে স্বামীজীর পরামর্শে গঙ্গার তীরে মানমন্দিরের নিকট একটি বাড়ীতে তিনি অবস্থিতি করেন এবং সর্ব্বশেষে কাকিনারাজের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। প্রথমে আত্মীয়-স্বজনগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে রজনীকান্তকে অল্প কয়েকদিনের জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্টবশতঃ এই চিকিৎসায় কোন সুফল হইল না, অধিকন্তু তাঁহাকে কয়দিন অত্যধিক শ্বাসক্লেশ ভোগ করিতে হইল।

অনন্তর কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে বালাজি মহারাজ রজনীকান্তের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীর ব্যবস্থার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব এই যে, রজনীকান্তকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে হইত। এই ব্যবস্থা শুনিয়াই বাড়ীর সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। যে রোগী এই সুদীর্ঘকাল রোগ-ভোগের মধ্যে একটি দিনও স্নান করেন নাই, তাঁহা-কেই গঙ্গা স্নান করিতে হইবে! এই ব্যবস্থা যখন পরিজনগণের মনো-নীত হইল না, তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কবি নির্ভীকভাবে বলিয়াছিলেন, "ভয় করো না, দেখ, আমার আর কোন অসুখ হবে না।" বস্তুতঃ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল স্বামীজীর কৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে এবং স্বামীজী-প্রদত্ত প্রলেপ ও পাচন-ব্যবহারে বাস্ত-বিকই তিনি কিছু সুস্থ বোধ করিলেন।—সকলের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

দেবদেবী-বহুল বারাণসী রজনীকান্তের চিত্তে পবিত্র ভাব ও মনে অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা আনিয়া দিল। তিনি প্রতিদিনই কখনও বা হাঁটিয়া, কখনও বা পাল্কী করিয়া বিভিন্ন দেব-দেবী দর্শন করিতেন এবং বৈকালে নৌকা করিয়া গঙ্গা-বক্ষে বেড়াইতেন আর সন্ধ্যার সময়ে যখন আরত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টারোলে কাশীনগরী মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন তিনি ভক্তিপ্লুতচিত্তে মন্দিরে মন্দিরে দেব-দেবীর আরত্রিক দেখিয়া ধন্য হইতেন—প্রাণে নব বল পাইতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার একটু একটু জ্বর হইত এবং সময়ে সময়ে গলা দিয়া রক্তও পড়িত; তবু মোটের উপর তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইতেছিলেন।

কাশীর ভদ্রমণ্ডলী ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন তাঁহার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা রজনীকান্তকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যাতেও নিযুক্ত হইলেন। কাশীতে একটি

সেবক-সমিতি আছে। রজনীকান্ত যখন রোগযন্ত্রণায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন, তখন সেই সমিতির সেবকগণ পর্য্যায়ক্রমে রজনীকান্তের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। কবি রোজনাম্‌চায় লিখিয়াছেন,—"কাশীতে এক সেবক-সমিতি আছে। আমি যখন বড় কাতর, তখন তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে আমার শুশ্রূষা কর্‌তেন। তাঁদের অধিকাংশই কাব্যতীর্থ।"

এই সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের আন্তরিকতা, সেবা ও যত্নের গুণে বিদেশ রজনীকান্তের কাছে স্বদেশ হইয়া উঠিল। হাসির গল্প, কবিতা-রচনা ও শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি দ্বারা তিনি সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। কবির স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আবার যেন একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মাঘ মাসের প্রথমে হঠাৎ একদিন রজনীকান্তের প্রবল জ্বর হইল, এবং সেই সঙ্গে গলা ফুলিয়া তাঁহার গলায় খুব ব্যথা হইল; তিনি খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। বালাজির ঔষধে আর কোন ফল হইল না। তাঁহার চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি কিছুদিন এক প্রসিদ্ধ ফকীরের প্রদত্ত ঔষধ সেবন করেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই সময় হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল; অথচ ইহার কোন প্রতিকার কাশীতে কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। একবার আগ্রায় গিয়া রেডিয়াম্ (Radium) চিকিৎসা করিবার জন্য অনেকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্বাসকষ্ট দিনদিন এতই বাড়িতে লাগিল এবং জ্বরের প্রকোপ, অনিদ্রা, খাদ্যগ্রহণে কষ্ট এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, প্রাণরক্ষার জন্য অতি শীঘ্রই তাঁহাকে কলিকাতায় আনা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না।

কলিকাতায় পুনরাগমন

রজনীকান্তের কাশী-ত্যাগ এক মহা হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য। প্রাণ অন্নপূর্ণার কোল ছাড়িতে চাহে না, কিন্তু না ছাড়িলেও যে প্রাণ রক্ষা হয় না! আর কবিকে ছাড়িতে চাহেন না—কাশীর ভদ্রমণ্ডলী; তিনি যে এই কয়মাসে তাঁহাদিগকে নিতান্ত আপন জন করিয়া তুলিয়াছেন। কাশী হইতে ট্রেণ ছাড়িল—কিন্তু যাঁহারা কবিকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলেন না,—মোগলসরাই পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। তাহার পর বিদায়-মুহূর্ত্তে রোদনের পালা—আমরা লিখিতে পারিব না।

কবির পরিবারবর্গ তাঁহাকে লইয়া ২১এ মাঘ কলিকাতায় সার্পেণ্টাইন্ লেনের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতার প্রধান প্রধান কবিরাজগণ রজনীকান্তের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার রোগের উপশম নাই, জ্বরের বিরাম নাই, যন্ত্রণার লাঘব নাই, অধিকন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট তাঁহাকে উত্তরোত্তর ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ শঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি ও কবিরাজি—সকল চিকিৎসাই ব্যর্থ হইল।

ক্রমে নিঃশ্বাস ফেলিতে এবং শ্বাস গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। বহুক্ষণ অক্লান্ত চেষ্টা করিলে তবে অল্প একটু নিঃশ্বাস বাহির হইত। তখন সেই বিষম যন্ত্রণায় রজনীকান্ত কখন বসিয়া পড়েন, কখন ছুটিয়া বেড়ান, কখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া যুক্তকরে দয়ালকে ডাকেন, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পান না। তখন কাতরকণ্ঠে তিনি লিখিয়া জানাইতে লাগিলেন—"হয় মৃত্যু, নয় শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার

ক্ষমতা দাও ঠাকুর!" 'দিন যায় ত ক্ষণ যায় না'—প্রতি মুহূর্ত্তেই সকলের মনে হইতে লাগিল—এই বার বুঝি প্রাণ বাহির হইয়া গেল!

২৭এ মাঘ বুধবার বৈকালে সাড়ে চারিটার সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত মহাশয় ডাক্তার বার্ড সাহেবকে লইয়া আসিলেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"অস্ত্রসাহায্যে গলায় ছিদ্র করিয়া রবারের নল বসাইয়া দিতে হইবে, সেই নলের ভিতর দিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।"

তিন দিন দিবারাত্র এই যম-যন্ত্রণার সহিত প্রাণান্ত যুদ্ধ করিয়া ২৮এ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতে মৃত্যু অবধারিত ও সন্নিকট দেখিয়া রজনীকান্ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার যাবতীয় বিষয় স্ত্রীর নামে লিখাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তখন তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা ছিল না—অতিকষ্টে কোন রকমে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিদারুণ প্রাণান্তকর অবস্থা দেখিয়া এবং ইহার কোন প্রতিকারই নাই বুঝিয়া আত্মীয়-স্বজনের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সকলের চোখের সম্মুখে কবি একটু নিঃশ্বাসের জন্য ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। হাসপাতালের রোজনামচায় তিনি এই নিদারুণ প্রাণান্তকর অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"হাসপাতালে আস্বার আগে তিন দিন তিন রাত কেবল একটু নিঃশ্বাসের জন্য ভয়ানক হাঁপিয়েছি।"

যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য অক্সিজেন দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না। বেলা এগারটার সময়ে তাঁহার একেবারে দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। যতীন্দ্রবাবু রজনীকান্তের সেই অবস্থা লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার কণ্ঠদেশে শীঘ্র অস্ত্র করা ভিন্ন আর কোন

উপায় নাই—এই কথা পরিজনবর্গকে জানাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য মেডিকেল কলেজে চলিয়া গেলেন। কবির আত্মীয়-স্বজন ও পুত্রগণ সেই কণ্ঠাগত-প্রাণ রোগীকে অতি সন্তর্পণে গাড়ীতে তুলিয়া মেডিকেল কলেজে যাত্রা করিলেন। পাঠক, এইবার প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম দেখিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

২

হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায়

"অন্তকালে আমাকেই স্মরি দেহমুক্ত হয়—
যে জন আমার ভাব প্রাপ্ত হয় অশংসয়।
যে যে ভাব স্মরি মনে ত্যজে অন্তে কলেবর,
সে সে ভাব পায়, পার্থ! সে ভাবভাবিত নর॥"

—গীতা।

হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গলদেশে অস্ত্রোপচার

এইবার অস্ত্রোপচার! সুকণ্ঠ কবির কমনীয় কণ্ঠে অস্ত্রোপচার! এই কথা মনে হইলেই হৃৎকম্প হয়, আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে, অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। কি নিদারুণ ভবিতব্য, নিয়তির কি প্রাণঘাতী লীলা! দেহে এত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিতে গায়কের গলদেশেই আক্রমণ! বিচিত্রময়ের এই কঠোর বিচিত্রময় লীলাখেলার মর্ম্মভেদ রহস্য বুঝিবার শক্তি বা সামর্থ্য আমাদের নাই।

কিন্তু আর সময়ক্ষেপের অবকাশ নাই, ভাবিবার সময় নাই, যুক্তিতর্কের অবসর নাই! কবির কণ্ঠে অনতিবিলম্বে অস্ত্রোপচার করিলে হয় ত তিনি এ যাত্রা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। জানি,—কবির কলকণ্ঠ চিরতরে নীরব হইবে,—জানি, তাঁহার প্রাণোন্মাদকর সঙ্গীত-সুধা আর পান করিতে পারিব না;—জানি, তাঁহার সুধাসিক্ত চিত্তাকর্ষক আবৃত্তি আর শুনিতে পাইব না,—জানি, তাঁহার হাস্য-

মুখর, প্রাণভরা, প্রাণখোলা কথা আর উপভোগ করিতে পারিব না,—জানি সব, বুঝি সব,—কিন্তু তবু যদি তিনি রক্ষা পান, তাঁহাকে ত বুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিব, কবি বলিয়া, রস-রসিক বলিয়া, সুগায়ক বলিয়া, প্রাণের মানুষ বলিয়া মাথায় করিয়া রাখিতে পারিব,--এই আশা আমাদিগকে কঠোর হইতে কঠোরতর করিল। আর ভাবিবার সময় নাই—অচিরে কবিকণ্ঠ নীরব করিতেই হইবে। তাহাই হউক।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি মেডিকেল কলেজে চলিয়া গিয়া অস্ত্রোপচারের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। ইতিমধ্যে কবিকে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া; তাঁহার মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিজাশঙ্কর এবং শ্যালীপতি-পুত্র সুরেশচন্দ্র হাসপাতাল-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। পথে গাড়ীর মধ্যে অক্সিজেন-যন্ত্র (Oxygen Cylinder) লওয়া হইল, সমস্ত পথ কবির নাকের ও মুখের কাছে অক্সিজেন গ্যাস (Oxygen gas) প্রবেশ করান' হইতে লাগিল। অন্য একখানি গাড়ীতে কবির পত্নী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে হাসপাতালে চলিলেন।

সার্পেণ্টাইন্ লেন হইতে মেডিকেল কলেজ অতি সামান্য পথ, কিন্তু এই পথটুকুই কত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। গাড়োয়ান দ্রুতগতি গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল, কিন্তু সে পথ যেন আর শেষ হয় না। কবির অবস্থা তখন এতই সঙ্কটাপন্ন যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা হইতে লাগিল, এই বুঝি প্রাণ বাহির হইয়া যায়! গাড়ী যখন বহুবাজার ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল, তখন সত্য সত্যই কবির অন্তিম মুহূর্ত্ত আসন্ন বলিয়া সকলের মনে হইল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে নিদারুণ মুহূর্ত্ত একটু পিছাইয়া গেল। বেলা ১১টার পর কবিকে

লইয়া সকলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। যতীন্দ্রমোহন পূর্ব্ব হইতেই রোগীর আগমন-প্রতীক্ষায় ছিলেন। রজনীবাবু উপস্থিত হইবামাত্রই উত্তোলন-যন্ত্রের (Lift) সাহায্যে তাঁহাকে একেবারে ত্রিতলে অস্ত্র করিবার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় কাপ্তেন ডেনহাম হোয়াইট সাহেব (Resident Surgeon Captain Denham White) ২৮এ মাঘ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ১২টার সময় রজনীবাবুর কণ্ঠদেশে ট্রাকিওটমি-অস্ত্রোপচার (Tracheotomy operation) দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের জন্য ছিদ্র করিয়া দিলেন। প্রথমে সেই ছিদ্র দিয়া ঝড়ের মত কতকটা বাতাস, তৎপরে শ্লেষ্মা, শেষে রক্ত বাহির হইয়া গেল। শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের জন্য ছিদ্রপথে প্রথমতঃ একটি রূপার নল বসাইয়া দেওয়া হইল এবং ৭।৮ দিন পরে ঐ স্থানে রবারের নল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উপস্থিত কোনপ্রকারে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু হায়! জন্মের মত তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল! যে অমৃতনিঃস্যন্দী, অক্লান্ত কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত-সুধাধারা নির্গত হইয়া সারা বাঙ্গালাদেশ প্লাবিত করিয়াছিল,—যে কণ্ঠোচ্চারিত প্রাণোন্মাদ-কর ভগবৎসঙ্গীতে শ্রোতার চক্ষে দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িত,—যে কণ্ঠ সাধন-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ভাবে গদগদ গম্ভীর হইত,—আর সঙ্গে সঙ্গে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া পুলক ও রোমাঞ্চে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিত—সেই কণ্ঠ—মধুময় সঙ্গীতসুধার সেই অফুরন্ত প্রস্রবণ চিরতরে শুষ্ক ও নীরব হইয়া গেল!

কবির কণ্ঠ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ আপাততঃ রক্ষা পাইল। আর অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইলে তাঁহার মৃত্যু হইত। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে কথা কহিবার সামান্য যে একটু শক্তি ছিল, অস্ত্রোপচারের পর তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। রক্তাক্তদেহে যখন তাঁহাকে অস্ত্র

করিবার গৃহ (Operation room) হইতে বাহিরে আনা হইল, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পরিবার ও আত্মীয়বর্গ একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। রজনীকান্তের জ্ঞান কিন্তু লুপ্ত হয় নাই, তিনি বেশ স্পষ্টভাবে সকলের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদের মনোগত ভীতিভাব বুঝিতে পারিয়া অঙ্গুলিদ্বারা হস্ততালুতে লিখিলেন,—"ভয় নাই, বেঁচেছি।" তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাগণ সার্পেণ্টাইন্ লেনের বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

প্রথম দিন মেডিকেল কলেজের ত্রিতলের কাউন্সিল ওয়ার্ডে (Council Ward) তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। পরে দুই দিন তিনি জেনারেল ওয়ার্ডে (General Ward) ছিলেন।

অল্প একটু জ্বর হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁহাকে দ্বিতলের জেনারেল ওয়ার্ডে (General Ward) স্থানান্তরিত করা হইল। এই দিন তাঁহার সহিত মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়ের পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের দিন হইতে মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত হেমেন্দ্রবাবু কবির সহচররূপে তাঁহার কাছে কাছে থাকিতেন। ২৪এ বৈশাখ শ্রীযুক্ত চন্দ্রময় সান্যাল মহাশয়কে রজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন—"ওর নাম হেমেন্দ্রনাথ বক্সী। আমার যেদিন Operation (অস্ত্রোপচার) হয়, তার পরদিন আমি হাসপাতালে জেনারেল ওয়ার্ডে (General Ward), হেমেন্দ্র কি কাজে সেই ঘরে গিয়ে আমাকে দেখে চিন্‌তে পারে না,—এমন reduced (রোগা) হয়ে গেছি। আমার অসুখের টিকিট দেখে বল্লে—'আপনি রাজসাহীর উকীল রজনীবাবু?' আমি বল্লাম—'হাঁ'। ও বল্লে, 'কোনও ভয় নাই। যত যা কর্ত্তে হয়—আমরা কর্চ্ছি।'—সেই যে আমার শুশ্রূষায় লেগে

রজনীকান্তের রুগ্নশয্যার প্রধান বন্ধু ও সহচর
উদারহৃদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বক্সী

গেল,—এ পর্য্যন্ত একভাবে।" রজনীকান্ত 'কটেজ' ভাড়া করিবার পরেও হেমেন্দ্রবাবু নিজের মেসে যাইতেন না। কেবল কলেজের সময় কলেজে যাইতেন, আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্তের নিকট থাকিতেন। তাঁহার আহারাদিও রজনীকান্তের 'কটেজে'ই হইত।

————"আমার নিজহাতে-গড়া বিপদের মাঝে
বুকে ক'রে নি'য়ে র'য়েছ।"————

করুণাময় শ্রীহরি কান্তকবির এই বিপদের সময়ে—তাঁহার অপরিসীম ব্যথা ও বেদনার মাঝখানে বন্ধুরূপী হেমেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিলেন। ভগবৎপ্রেরিত হেমেন্দ্রনাথ রোগ-যন্ত্রণা-প্রপীড়িত কান্তকবির দেহ কোলে করিয়া লইলেন। এই দারুণ বিপৎকালে কান্তের ভাগ্যে যে বন্ধুলাভ ঘটিল, সেই বন্ধুই পরামর্শ দিয়া মেডিকেল কলেজের অধীন একটি 'কটেজ'-গৃহে (Cottage Ward) পরিবার সহ কান্তের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অস্ত্রচিকিৎসার তৃতীয় দিনে,—১৩১৬ সালের ৩০এ মাঘ শনিবার (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০) তাঁহাকে খাটে (stretcher) করিয়া 'কটেজে' লইয়া যাওয়া হয়।

মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স্‌ হাসপাতালের দক্ষিণে ইডেন হাসপাতাল রোডের উপর তিনখানি সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে,—এই তিনখানি বাড়ীই মেডিকেল কলেজের অন্তর্ভুক্ত 'কটেজ-ওয়ার্ডস্‌'। তিনজন বদান্য মহাত্মা এই তিনখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া, সাধারণ ভদ্রলোকের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

চারিটি পরিবার থাকিতে পারে, এইরূপ ভাবে প্রত্যেক বাড়ীটিকে উপরে এবং নীচে সমান চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি অংশে তিনখানি শয়ন-গৃহ এবং রান্না ও ভাঁড়ারের জন্য দুইখানি ঘর

আছে। রুগ্ন ব্যক্তি অনায়াসে সপরিবারে প্রতি অংশে বাস করিতে পারেন। দৈনিক ভাড়া উপরের অংশে সাড়ে পাঁচ টাকা এবং নীচের অংশে সাড়ে চারি টাকা।

রজনীকান্ত ১২নং 'কটেজে' থাকিতেন, তাহার চিত্র দেওয়া হইল। এই 'কটেজে'ই সাত মাস কাল রোগশয্যায় থাকিয়া রজনীকান্ত প্রাণত্যাগ করেন।

রজনীকান্ত যে বাড়ীটির নিম্নতলের একাংশে থাকিতেন—সেই বাড়ীটি রায় বাহাদুর শিউপ্রসাদ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা সুরজমল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সমস্ত রোগী 'কটেজ-ওয়ার্ডসে' বাস করেন, তাঁহারাও বিনা ব্যয়ে মেডিকেল কলেজ হইতে চিকিৎসার সমস্ত সাহায্যই (ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি) পাইয়া থাকেন। 'কটেজে'র প্রত্যেক প্রকোষ্ঠই দেখিতে সুন্দর এবং বৈদ্যুতিক আলো, পাখা ও রোগীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামে সজ্জিত।
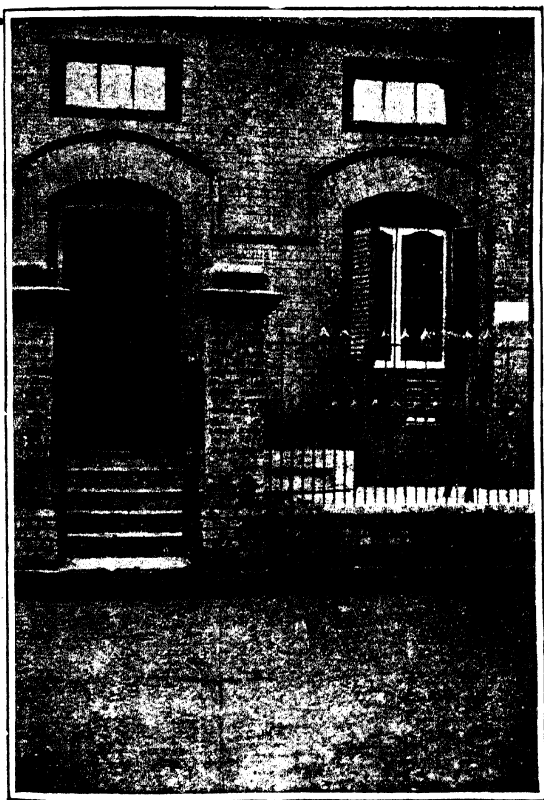
কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কটেজ-ওয়ার্ড

(কান্তকবির মৃত্যু-স্থান)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কটেজে

চির-হাস্যময় কলকণ্ঠ কবির যন্ত্রণাদায়ক হাসপাতাল-জীবন আরম্ভ হইল। যিনি হাসিয়া হাসাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদাইয়া, কণ্ঠের সুমধুর স্বরহিল্লোলে জনসাধারণের প্রাণে বিভিন্ন ভাববন্যার সৃষ্টি করিতেন, নবীন বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণের মত যাঁহার কণ্ঠোত্থিত রসাত্মক বাক্য ও সঙ্গীত-তরঙ্গ বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পুলকিত করিত,—কাব্যকাননের সেই কলকণ্ঠ পিক আজ নীরব, মূক। প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যাইত, তবুও যাঁহার গান থামিত না, যাঁহার রসাল গল্প-শ্রবণে বন্ধুবর্গ আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইত, সেই অক্লান্ত ভাষণ-পটুর নির্ব্বাক্ জীবন আরম্ভ হইল। তখন রজনীকান্তকে মনের ভাব লেখনী-সাহায্যে ব্যক্ত করিতে হইত। এই সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং ২রা ফাল্গুন তারিখে হেমেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়কে লেখেন,—"তবু যা হোক, যে লোকটা 'লেখা' আবিষ্কার করেছিল, তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। নইলে আমার দশা কি হ'ত! এই ইসারা বোঝে না, আর রেগে মেগে মাণ্ডে যাই আর কি! 'লেখা'টা যেমন perfect (পূর্ণভাবব্যঞ্জক), তে কিছু হ'তে পারে না, কারণ ইসারাকে infinite (অনন্ত) না কর্লে infinite (অনন্ত) কি ক'রে বুঝাতে? কিন্তু লেখাতে অসীমকে সসীমের মধ্যে এনে ফেলা গেছে।" ৬ই ফাল্গুন রজনীকান্ত মুরারিমোহন বসু ও বিধুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী নামক কলেজের দুইটি ছাত্রকে 'লেখা'র অসুবিধা বিষয়ে লেখেন,—"আর সকল মনের কথাই কি লিখে প্রকাশ করা যায়?

লেখাটা কি elaborate dilatory process (বিশদ বিলম্বকর পদ্ধতি)। একজন একটা কথা বলে গেল, তার দশগুণ সময় লাগে তার উত্তর দিতে। আর সমস্ত দিন লিখ্‌তেই বা কত পারি ?”

ঐ দিনই তাঁহার শুশ্রূষাকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তকে বলেন,—“দেখ সুরেন্, আমার কথা ব'লবার শক্তি নাই, সব লিখে দেখাতে হয়। কি ভয়ানক পরিশ্রম আর অসুবিধে! একজন একটা কথা ব'লে গেলে তার জবাব দিতে আমার লাগে ১০ মিনিট। লেখাটা ভয়ানক dilatory process (বিলম্বকর পদ্ধতি) কিনা।”

হাসাইয়া যাঁহার পরিচয়, কাঁদাইয়া তাঁহার শেষ জীবন আরম্ভ হইল।

বড় আদর করিয়া প্রাণের প্রবল আবেগে কবি তাঁহার দয়াল শ্রীহরির উদ্দেশে একদিন গাহিয়াছিলেন,—

———“সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে!
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি
(অম্‌নি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।”

ঠিক তাহারই চারি বৎসর পরে তাঁহার দয়াল শ্রীহরি দুঃখ-যন্ত্রণার স্তূপীকৃত ভারে তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিয়া, তাঁহারই মুখ দিয়া বলাইলেন,—

“আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছে—
গর্ব্ব করিতে চুর।”

প্রকৃতই দয়াল তাঁহাকে সকল রকমে কাঙ্গাল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর চিরতরে নীরব হইয়াছে, জীবন-রক্ষা হইলেও সে স্বর—সে ধ্বনি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না!

তিনি এখন সম্পূর্ণ বাক্‌শক্তিরহিত। যিনি 'মূকং করোতি বাচালম্' তিনিই রজনীকান্তকে—সেই কলকণ্ঠ, কলহাস্যপ্রিয়, সঙ্গীতপটু রজনীকান্তকে নীরব—নির্ব্বাক্ করিয়াছেন। জীবন-রক্ষার আশাও ত ক্রমে ক্ষীণতর হইতেছে, রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। আর সেই সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব রজনীকান্ত আজ রোগশয্যায় ঋণজালে জড়িত, ———মহাব্যয়সাধ্য চিকিৎসা, নিজের দেহে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় অবস্থান, বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ বিদেশে কটকে গমন, তাহার পর কালব্যাধির উপশমের জন্য কাশীতে অবস্থান প্রভৃতি নানাবিধ কারণে তিনি ঋণগ্রস্ত। কাশীপ্রবাসের সময় হইতেই তাঁহাকে পরের অর্থসাহায্য লইতে হইয়াছে। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় কাশীতেই রজনীকান্তকে প্রথম অর্থসাহায্য করেন, আর এই 'কটেজে' অবস্থানকালে তাঁহাকে ত কুমারেরই মাসিক সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে। তাঁহার নিয়মিত সাহায্য ভিন্ন রজনীকান্তের ত 'কটেজে' থাকাই হইত না। তাই বলিতেছিলাম, বাস্তবিকই হাসপাতালে রজনীকান্ত সকল রকমে কাঙ্গাল হইতে বসিয়াছেন। ইহা ভক্তের উপর ভগবানের লীলা হইলেও—অতিশয় তাণ্ডব লীলা বলিয়া বোধ হয়।

মনে হয়, তাঁহার মত খাঁটি সোনাকে উজ্জ্বলতর করিবার জন্য ব্যাধিরূপ অগ্নিতে ভগবান্ সম্পূর্ণ দগ্ধ করিয়া লইলেন। এই দারুণ উৎকট ব্যাধিতে কবি যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন,—সে যন্ত্রণা শুধু রোগযন্ত্রণা নহে—সে এক মহা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা,—সে যন্ত্রণায় চির-হাস্যময় চিরমুখর সঙ্গীতময় কবি নির্ব্বাক্ ও মূক হইয়া সুদীর্ঘ সাত মাস কাল নীরবে কালযাপন করিয়াছিলেন। কণ্ঠের সুমধুর সুর-হিল্লোলে হাসির গান ও কবিতা আবৃত্তি করিতে এবং অন্তরের অন্তস্তল হইতে

সরল প্রীতিপূর্ণ বাক্যরাজি উপহার দিতে যে কবি এই বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সদানন্দ কবিকে নীরবে কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইল!

জানি না, ভগবান্! এ কেমন তোমার রীতি! এ কেমন তোমার দয়া—দুঃখের মাঝে না ফেলিয়া তুমি কি কাহাকেও নিজের কোলে লও না? জানি না, এটা দুঃখ কি সুখ? তবে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কাল ব্যাধির কথা যখনই মনে পড়ে, তখনই রজনীকান্তের এই নিদারুণ দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, দুঃখের ভিতরেও সুখ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে—মনে হয়, তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ—তোমার করুণার কোমল করস্পর্শ ঐ পীড়নের মধ্য দিয়াও পীড়িতকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে, তোমার শান্তির বিমল জ্যোতিঃ তাহার মন-প্রাণ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। আমরা মূর্খ, মোহান্ধ জীব, শুধু দূরে দাঁড়াইয়া দুঃখটুকুই দেখিতে পাই। তাই আমরা দেখিয়াও দেখি না, আমরা বুঝিয়াও বুঝি না—

"শান্তিসুধা যে রেখেছ ভরিয়া
অশান্তি ঘট ভরি।"

——— সরলাবালা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ

রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। তিনি যখন উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, হাসপাতালে শয্যাগত, যখন কাল ব্যাধি তাঁহার দেহের উপর উত্তরোত্তর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তাঁহাকে মরণের মুখে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, যখন তাঁহার জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে,—তখন সেই শয্যাগত, মৃতকল্প, মুমূর্ষু পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ! এই ঘটনা বিশেষ বিসদৃশ, যৎপরোনাস্তি অস্বাভাবিক এবং অতিশয় অশোভন বলিয়া বোধ হইবার কথা। বাস্তবিকই এ যেন সেই বাসরগৃহে 'ভাব সেই শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' গানের পাল্টা জবাব।

এই বিবাহ-ব্যাপার বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্ব বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে,—রজনীকান্তের ধর্ম্ম ও সামাজিক মতের আলোচনা করিতে হইবে। আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হইলেও, 'জজের উকীল' হইলেও, 'conscience to him is a marketable thing, which he sells to the highest bidder' (তাঁহার নিকট বিবেক একটি পণ্যদ্রব্য, আর সেই পণ্যদ্রব্য তিনি নিলামে চড়াদামে বিক্রয় করেন) * হইলেও, সব্ জজের সন্তান হইলেও এবং বিদুষী পত্নীর স্বামী হইলেও,—রজনীকান্ত বেশ একটু 'সেকাল-ঘেঁসা' লোক ছিলেন। যাহাকে আজকালকার সভ্যভাষায় বলে 'স্থিতিশীল' বা 'রক্ষণশীল' ব্যক্তি—তিনি তাহাই

---

* "কল্যাণী"—'উকীল' পদ্য।

ছিলেন। এই সনাতন সমাজের অনেক পুরাণ প্রথা তিনি মানিতেন এবং সেইগুলি পালন করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহা তাঁহার কুসংস্কার বলিতে হয় বলুন, তিনি উচ্চশিক্ষা পাইয়াও সুশিক্ষিত হন নাই বলিতে হয় বলুন বা তাঁহার বিবেকবুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই বলুন,— তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু এ কথা সত্য যে, রজনীকান্ত একটু 'সেকেলে' ধরণের লোক ছিলেন—সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁহার চিন্তার ধারা অনেকটা 'সেকেলে' লোকের মত ছিল।

তাই তিনি হিন্দুর বিবাহকে একটা ছেলেখেলা, একটা আইনের চুক্তি—একটা দৈহিক যোটনা বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বেশ ভালরূপেই জানিতেন,—

"এ নহে দৈহিক ক্রিয়া, চিরবিনশ্বর
বিলাস-লালসা-তৃপ্তি, এ নহে ক্ষণিক
মোহের বিজলিপ্রভা, নহে কভু সুখ-
দুঃখময় দু'দিনের হরষ-ক্রন্দন—
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয়।"

কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুর বিবাহ—'গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য,' 'সচ্চিদানন্দ-লাভের সোপান,'—'এ মিলন ল'য়ে যাবে সেই মিলনের মাঝ।' ইহাই তাঁহার একটি 'সেকেলে' ভাব।

তাহার পর পুত্রের বিবাহ দেওয়া যে পিতার একটি প্রধান কর্ত্তব্য, ইহাও তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। তিনি এই সংসারকে 'আনন্দবাজার' বা সুখের হাট মনে করিতেন। অসহ্য রোগযন্ত্রণায় যখন তিনি কাতর, সাত মাস শয্যাগত, সেই দারুণ জ্বালা, সেই অসহ্য কষ্ট, সেই তীব্র যাতনায় যখন তিনি মুমূর্ষু, দীর্ঘ অনাহার ও অনিদ্রায় জর্জ্জরীভূত, তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ—তখনও তিনি বার বার প্রকাশ করিয়াছেন

যে, এ 'সুখের হাট' ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ চাহে না—ইচ্ছা হয় না। এই সুখের হাট, এই সৌন্দর্য্যের মেলা বুঝাইতে হইলে পুত্রকে সংসারী করিতে হইবে, তাহাকে দারপরিগ্রহ করাইতে হইবে, তবে ত সে সংসার চিনিবে, সমাজ চিনিবার সুযোগ পাইবে, গৃহস্থ হইবে, আর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইবে এবং পিতৃপুরুষগণকে ধন্য করিবে। তিনি অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করিতেন, শুধু পুত্রের প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্য পিতা দায়ী নহেন,—পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলেই পিতার কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হয় না,—যাহাতে পুত্র সংসারী হইয়া বংশের বিশেষত্ব, বংশের ধারা, পিতৃ-পিতামহের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সেই বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা ও সাহায্য দান করাও পিতার অন্যতর প্রধান কর্ত্তব্য—মহাধর্ম্ম। ইহা না করিতে পারিলে পিতার জীবনই বৃথা। ইহাই তাঁহার আর একটি 'সেকেলে' ভাব।

আর তিনি বাল্য-বিবাহের একটু পক্ষপাতী ছিলেন—তা' ছেলে উপার্জ্জনক্ষম (আজকালকার সভ্যভাষায় self-supporting) হউক বা না হউক। ভাবটা এই—বিবাহিত না হইলে নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ব—সভ্যভাষায় responsibility ফুটিয়া উঠে না, যেন কেমন উড়ো উড়ো ভাব, কেমন ভবঘুরে ধরণ—'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে!' এও তাঁহার একটা পূতিগন্ধময়ী পৌরাণিকী ধারণা। আধুনিক অনূঢ় যুবক নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, "ঘোর কুসংস্কার! ভয়ানক অন্ধ বিশ্বাস! যে উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করে, সে মহামূর্খ, আর তা'কে সেই মূর্খতার ফলও পরিণামে ভোগ করিতে হয়।" প্রাচীন বহুদর্শী বৃদ্ধ উত্তরে বলিবেন,—"কেন বাপু, তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই ত বলেন, তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতাই ত শিক্ষা দেয় যে, অষ্টপ্রহর—

অনবরত অভাব বাড়াইবার চেষ্টা কর, try to create, to increase your wants, তবে সেই অভাব দূর করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইবে, চেষ্টা হইবে—নতুবা তুমি আরও 'অনড়', অসাড়, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে, উদ্যমহীন হইবে, উৎসাহরহিত হইবে,—জীবনে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। তাই রজনীকান্তের ধারণা ছিল, বিবাহিত জীবনে দায়িত্বজ্ঞান অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য বিবাহিত ব্যক্তির চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে,—সে তখন উৎসাহভরে, হাসিমুখে সেই সকল কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ইহাও তাঁহার আর একটি 'সেকেলে' ভাব।

তাই রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্র আই এ পরীক্ষা দিবার পরেই তিনি পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। রাজসাহীর প্রসিদ্ধ জমিদার, তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহাস্পদ সুহৃদ্ যাদবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। তখন রজনীকান্ত রাজসাহীতে ওকালতি করিতেছেন, তখনও তাঁহার কালরোগের সূত্রপাত হয় নাই। কিন্তু কালের গতি বুঝা দায়—তাহার পর নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, কিন্তু তবুও তাঁহার পরিত্রাণ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। "Misfortune never comes single but in battalions."—দুর্ভাগ্য কখন একাকী আসে না—দলবদ্ধ হইয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া আসে।—ক্রমে কালরোগের সূচনা, বৃদ্ধি, কলিকাতায় আগমন ও কাশীযাত্রা। কাজেই পুত্রের বিবাহের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল।

যখন তিনি কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উৎকট ব্যাধিতে যখন তিনি পূর্ণমাত্রায় আক্রান্ত, মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়ের একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন।

তিনি লিখিতেছেন, যাদববাবু বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন,—তাঁহার তৃতীয়া কন্যা গিরীন্দ্রমোহিনী চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। যাদববাবুর একান্ত ইচ্ছা, শ্রীমান্ শচীনের সহিতই সত্বর তাহার বিবাহ হয়। রজনীকান্ত তাঁহার স্নেহাস্পদ সুহৃদের অবস্থা অনুভব করিলেন এবং সেই দিনই টেলিগ্রামে উত্তর দিলেন যে, তিনি সে বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিবেন।

জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে রজনীকান্ত কলিকাতায় ফিরিলেন.' গলায় অস্ত্র করা হইল, 'কটেজে' অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, পরানুগ্রহে সেবা, শুশ্রূষা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা চলিতে লাগিল—চিকিৎসক, পরিবার ও বন্ধুবর্গ অসাধ্যসাধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রজনীকান্ত বেশ বুঝিলেন যে, কিছুতেই কিছু হইবে না,—এ যে 'ভগবানের টান',—কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না,—জগতের আলো ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, আর অন্ধকার ঘনায়মান হইতেছে। তাই তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আর ত কালক্ষেপের অবসর নাই—জীবনের কর্ত্তব্য বুঝি সম্পন্ন হয় না, শচীন্‌কে বুঝি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারি না। এই সব চিন্তায় তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি ভাবিলেন,—শীর্ণা, সেবা-পরায়ণা, দুশ্চিন্তাভারাক্রান্তা, শুশ্রূষাকারিণী পত্নীর একটি 'দোসর' জুটাইয়া দিই, নববধূর সাহায্যে যদি পতিপ্রাণা একটু 'আসান' পান, তাঁহার আগমনে যদি একটু শান্তি পান; আর হয় ত পুত্রবধূর শুভাগমনে—লক্ষ্মীর আবির্ভাবে তাঁহার অমঙ্গলও দূর হইবে। এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিলে, রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ-ব্যাপার অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই উপলব্ধি হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়,

রজনীকান্ত আদর্শ জনক, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা,—যমযন্ত্রণার মধ্যেও, মুমূর্ষু অবস্থাতেও তিনি তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি ধন্য!

১৯৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল,১৬ই ফাল্গুন শ্রীমান্ শচীন্দ্রের বিবাহ স্থির হইল, রজনীকান্তের স্ত্রী ও দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞান রাজসাহী যাইবেন। শচীন্ তখন রাজসাহীর বাটীতেই থাকিত। বিবাহের পর তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বহুবাজারের বাসায় উঠিবেন। স্ত্রীকে রাজসাহী যাইবার জন্য রজনীকান্ত বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না, পতিপ্রাণা সাধ্বী কিরূপে মৃতকল্প স্বামীকে ছাড়িয়া যাইবেন? জ্ঞানও মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিলেন না। ফলে তাঁহারা উভয়েই রাজসাহী গেলেন না।

রজনীকান্তকে বহুবাজারের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। ১৬ই তারিখেই শ্রীমান্ শচীন্দ্রের বিবাহ হইল, শচীন বিবাহের পর দিনই নববধূ লইয়া কলিকাতায় পুনরাগমন করিলেন। এত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও পরিবারমধ্যে আনন্দের ক্ষীণ রেখাপাত হইল। মুমূর্ষু রজনীকান্তের মনে একটু প্রফুল্লভাব পরিলক্ষিত হইল—যেন একটা মহা দায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। তিনি রোজনাম্চায় লিখিয়াছেন,—"ছেলের বিয়ে দিয়ে একটু হাত নাড়্‌বার যো হ'য়েছে।"

রজনীকান্ত কিন্তু পুনরায় 'কটেজে' ফিরিয়া যাইতে চাহেন না,—একেবারে অসম্মত। তিনি বলিলেন যে, কুমার শরৎকুমার যে অর্থসাহায্য করিতেছেন, তাহাতে আর 'কটেজে' থাকা চলে না,—সেই সাহায্যে তিনি বরং অধিকতর স্বচ্ছলভাবে বাসায় থাকিতে পারিবেন। কিন্তু চিকিৎসকগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না,—বাসায় তাঁহার চিকিৎসা ও সেবার ত্রুটি হইবে। কিন্তু তবুও তিনি 'কটেজে' যাইতে অস্বীকৃত হইলেন; শেষে কুমার শরৎ-

কুমারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয্যে ২৪এ ফাল্গুন তাঁহাকে 'কটেজে' যাইতে হইল। কুমার মাসিক সাহায্য বাড়াইয়া দিলেন।

পুত্রবধূ লাভ করিয়া রজনীকান্তের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল,—মনে হইল এই কল্যাণীর কল্যাণে তাঁহার আনন্দের ভাঙ্গাহাট আবার যোড়া লাগিবে,—বুঝি কল্যাণীর পদ্মহস্ত তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিবে। তাই রজনীকান্ত তাঁহার শয্যাপার্শ্বোপবিষ্টা, লাজনম্রা, সাক্ষাৎ সাবিত্রীরূপিণী, শুশ্রূষাকারিণী পুত্রবধূকে লক্ষ্য করিয়া রোজনাম্‌চায় লিখিলেন,—"তুমি লক্ষ্মী, ঘরে এয়েছ,—তোমার পুণ্যে যদি বাঁচি। যত সুন্দরী বউ দেখি—তোমার মত ঠাণ্ডা, তোমার মত লজ্জাশীলা, তোমার মত বাধ্য কেউ না। সাদা চামড়ায় সুন্দর করে না—স্বভাবে সুন্দর করে। যে তোমাকে দেখে, সেই তোমার প্রশংসা করে। এমনি প্রশংসা যেন চিরদিন থাকে। ভাল ক'রে তোল; ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর সেরে উঠি।" কিন্তু বালিকার কোমল হস্ত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই,—বালিকার সকল প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল।

বিবাহের পরেই বন্ধু-বান্ধবে, আত্মীয়-স্বজনে 'কাণাঘুষা' করিতে লাগিলেন, রজনীকান্ত নাকি পুত্রের বিবাহে 'পণ' লইয়াছেন। ক্রমে সংবাদটা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের ও সমাজ-সমালোচকের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা ত একটু হুজুগ পাইলেই হয়—তাঁহারা অমনি লেখনী-চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন।—এই রজনীকান্তই না "বরের দর," "বেহায়া বেহাই" প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক পদ্য লিখিয়াছিলেন?—এই রজনীকান্তই না 'পণ'-গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজ-শাসকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন?—এই রজনীকান্তই না 'পণ'-গ্রহণকারী পুত্রের পিতার পৃষ্ঠে মিষ্ট মধুর চাবুক চালাইয়াছিলেন?—এখন বুঝা গেল, রজনীকান্তের

মুখে এক আর কাজে আর! এমন লোক বাঙ্গালার কলঙ্ক! রজনী-কান্তের আচরণে সম্পাদক স্তম্ভিত, 'বাঙ্গালী' বিস্মিত!

আমরা সাহিত্য-সম্রাটের ভাষায় বলি,—"ধীরে রজনি! ধীরে।"—মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়াই পুরুষার্থ নয়। হাঁ, এই রজনীকান্তই পণপ্রথা-লক্ষ্য করিয়া তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন,—আর সে কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। তিনিই পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে বৈবাহিক যাদববাবুর নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা লইয়াছিলেন,—এ কথাও সত্য। কিন্তু সে পণ নয়,—সে দান; সে 'জুলুম-জবর্‌দস্তি' নয়—বেহায়ের বুকে বাঁশ নয়,—সে ধনী, বিত্তশালী বৈবাহিকের অযাচিত, অপ্রার্থিত, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাহায্য—যিনি মনে করিলে অনায়াসে অক্লেশে, অকাতরে সহস্র কেন শত সহস্র প্রদান করিতে পারিতেন রজনীকান্ত স্বয়ং তাঁহার বৈবাহিককে কি লিখিয়াছিলেন পড়ুন,—

"দেখ, একটা কথা বলি। আমার এই বাঙ্গালা দেশে যেটুকু সামা[ন্য] পরিচয় তা আমি ছেলের বিয়েতে টাকা নিয়ে প্রায় নষ্ট ক'রেছি শিক্ষিত সম্প্রদায় ব'লেছে—রজনীবাবু মুখ হাসিয়েছেন, তা আমি না শুন্‌তে পাচ্ছি এমন নয়। তবে আমি যে আজ এগার মাস জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে প'ড়ে ঘোর বিপদ্-সাগরে ভাস্‌ছি,—তা তোমা[র] না-জানা আছে, তা নয়—নইলে টাকা নিতাম কিনা সন্দেহ।"

এই কৈফিয়তেও যদি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় সন্তুষ্ট না হন যদি আমাদের বিচক্ষণ সম্পাদকগণ শিরঃ সঞ্চালন পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে বলেন,—"তা—তা বটে, তবু কাজটা ভাল হয় নাই,"—তাহা হইলে সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে, সেই বিজ্ঞ সমালোচককে আমরা অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিব,—"আচ্ছা, বুকে হাত দিয়া বলুন ' দাদারা, ঘটনাচক্রে, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, গ্রহবৈগুণ্যে—একান্ত অনিচ্ছা

সত্ত্বেও আমাদের সকলকেই নিজ নিজ মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয় কি না? আপনি আমি, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, কবি অকবি, কুলগৌরব কুলাঙ্গার—এমন কি যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ—কাহারও চরিত্রে কি ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছেন?" তবে এ অনর্থক দোষারোপ কেন? মানব ত মানবের মালিক নয়,—আমরা ত আমাদের কর্ত্তা নই যে, যাহা মনে করিব তাহাই করিব, আর যাহা করিব না মনে করিব তাহাই অকৃত থাকিবে। আমরা যে নেহাৎ অবস্থার দাস—"তোমার কাজ তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

হে শিক্ষিত সম্প্রদায়! জিয়ান্ ভাল্‌জিনের (Jean Valjean) সেই পাঁউরুটি অপহরণের চিত্র মনে পড়ে কি? সেই—"The family had no bread. No bread—literally none—and *seven children.*" (সংসারে অন্নাভাব। চাল নাই—সত্যই চাল বাড়ন্ত—আর সাতটি সন্তান।) সেই করুণ দৃশ্য মনে করুন, আর সঙ্গে সঙ্গে মানস-নেত্রে একবার হাসপাতালে রজনীকান্তের রোগশয্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।—সেই একাদশ-মাস-ব্যাপী জীবন-মরণের মহা সংগ্রাম, সেই যমে মানুষের ভীষণ টানাটানি, সেই আপাদ-মস্তক ঋণজাল, সেই পরানুগৃহীত শতধাবিচ্ছিন্ন মরণোন্মুখ জীবন, সেই অশীতিপর বৃদ্ধা জননীর ক্রন্দনকাতর মলিনমুখ, সেই শীর্ণ, কঙ্কালসার সহধর্ম্মিণীর সদা সশঙ্কভাব,—আর সর্ব্বোপরি সাতটি সন্তানের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখশ্রী—সেই সব একে একে স্মরণ করুন; তবুও যদি বলেন যে, না—কাজটা ভাল হয় নাই, তবে আমরা পুনরায় ভিক্টর হুগোর উক্তি স্মরণ করাইয়া দিব, বলিব,—"Whatever the crime he had committed, he had done it to feed and clothe *seven little children.*"—সে যে অপরাধই করুক না কেন—সে ইহা করিয়াছিল সাতটি শিশু সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হর্ষে বিষাদ—ভগিনীপতির মৃত্যু

জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রের বিবাহ-উপলক্ষে রজনীকান্ত তাঁহার প্রায় সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। এই কাল-ব্যাধির করাল-কবল হইতে তাঁহার উদ্ধারের আর আশা নাই—ইহা স্থির জানিয়া তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, কাজেই বাধ্য হইয়া রজনীকান্তকে এই বিবাহ-উপলক্ষে তাঁহাদের সকলকে আহ্বান করিয়া কলিকাতায় আনিতে হইয়াছিল। তাঁহার সহোদরা ক্ষীরোদবাসিনীও কলিকাতায় আগমন করেন। বিবাহের সাত দিন পরে রজনীকান্ত পুনরায় 'কটেজে' প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আত্মীয়-কুটুম্বগণ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন, কেবল ক্ষীরোদবাসিনী ও কবির জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী রাধারমণী দেবী কলিকাতায় রহিলেন।

'কটেজে' ফিরিবার কয়েক দিন পরেই রজনীকান্তের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পায়। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভগিনীপতি রোহিণীকান্ত দাশ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাশয়-রোগে ভুগিতেছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইল যে, সুচিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজে আশ্রয় না লইলে আর চলিল না। একটি (কেবিন) ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহাকে তথায় রাখা হইল। প্রায় দুই মাস কাল হাসপাতালে থাকিবার পর

তিনি কঠিন আমাশয়-রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু হাসপাতাল ত্যাগ করিবার চারি পাঁচ দিন পরেই তিনি জ্বরে পড়িলেন এবং সেই জ্বর পরিশেষে ডবল নিউমোনিয়া রোগে দাঁড়াইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া—তাঁহাকে আবার হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, কিন্তু চিকিৎসায় এবার আর কোন উপকার হইল না। ৮ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটার সময়ে অনন্তসন্তানবতী বৃদ্ধা জননী, পতিগত-প্রাণা সাধ্বী পত্নী, অশীতিবর্ষীয়া শ্বশ্রূ, মুমূর্ষু শ্যালক এবং অসহায় পুত্রকন্যাগণকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া তিনি পরলোকে গমন করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ-উৎসবে আনন্দ করিতে আসিয়া রজনীকান্তের একমাত্র ভগিনী বিধবা হইলেন,—এই দুর্ঘটনা কবির বুকের মধ্যে নিদারুণ শেলাঘাত করিল। কবি বুঝিলেন, এইবার তাঁহারও ডাক পড়িবে। পরদিন তাঁহার লেখনী-মুখে বাহির হইল,—"কাল রাত্রিতে এক ভয়ানক দুর্ঘটনা হ'য়ে গেল। আমার ভগিনী বিধবা হ'ল। আমার মা'র বয়স আশী বছর। এখন আমার পালা।"

হাতের নোয়া ও সিঁথীর সিঁদুর খুয়াইয়া সেই বিষাদ-প্রতিমা যখন 'কটেজে' আসিলেন, তখন রজনীকান্ত কম্পিত হস্তে লিখিলেন,—"আমার যে অবস্থা তা'তে আমার মনে হয়, এ শরীরে ওকে দেখে বুঝি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। উত্তেজনা বোধ করিলেই গলা বেদনা করে। নির্দ্দোষ পুণ্যবতী বালিকা আমার পিঠের বোন—ওর সব সুখ গেল! মনে হ'লে আমার দুর্ব্বল শরীর কেঁপে কেঁপে উঠে। আমি বসে বসে দেখি—একটু মাছ হ'লে ও এতটি ভাত খায়। চির-জীবনের জন্য সে মাছ উঠে গেল। এ ত মনে কর্‌তেই আমার বুক কেঁপে উঠে।"

রজনীকান্তের বৃদ্ধা জননী এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় একেবারে হত-

জ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে দিবারাত্র ছট্‌ফট্ করিতেছে—অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস ইহাতেও সমাপ্ত হইল না—নিষ্ঠুর কাল একমাত্র প্রাণপ্রিয় জামাতাকে চোখের সাম্‌নে আচম্বিতে কাড়িয়া লইয়া গেল।

পতিহারা ক্ষীরোদবাসিনী দেশে যাইবার পূর্ব্বে যখন রজনীকান্তকে প্রণাম করিতে গেলেন, তখন রজনীকান্ত ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন,—"ক্ষীরো, তুই ত চল্লি, কিন্তু আমাকে চিতার আগুনে তুলে রেখে গেলি! রোহিণীর শোক আমার ম'রবার দিন অনেকটা আগিয়ে এনেছে। ভগবান্ শীঘ্রই তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবেন।" নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও পুত্রের বিবাহ দিয়া, সাক্ষাৎ সাবিত্রীসম পুত্রবধূ লাভ করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজনগণের সন্দর্শনে রজনীকান্ত একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন, রোহিণীকান্তকে অকালে কাড়িয়া লইয়া সমস্ত আনন্দকে চিরতমসায় আবৃত করিয়া দিলেন।

সহ্য কর রজনীকান্ত, সহ্য কর,—অকাতরে সহ্য কর,—হাসিমুখে সহ্য কর। সহ্য করিবার জন্যই ত তোমার জন্ম। শৈশবে নয়নতারা-সম জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র বরদাগোবিন্দ ও কালীকুমারকে হারাইয়াছ; বাল্যে স্নেহের দুলাল কালীপদ আর একমাত্র সহোদর জানকীকান্তকে কাল-সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছ; কৈশোরে একপক্ষমধ্যে পিতা ও জ্যেষ্ঠ-তাত—দুই মহাগুরুনিপাত দেখিয়াছ; যৌবনে পুত্রশোক পাইয়াছ; জ্যেষ্ঠা কন্যা শতদল তোমার চক্ষের সম্মুখে শুকাইয়া গিয়াছে; আর অগ্রজ-প্রতিম উমাশঙ্কর তোমারই কোলে মাথা রাখিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছেন! বর্ষের পর বর্ষ গিয়াছে, আর তোমার বুকে বজ্রাঘাত হইয়া এক একখানি পাঁজরা ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে! তবু

তুমি 'অচল-সম অটল স্থির!' তোমার সেই শৌর্য্য, সেই বীর্য্য, সেই গাম্ভীর্য্য মানবজীবনে অদ্বিতীয়—জগতে অতুল। কিন্তু তুমি এখন স্বয়ং মৃত্যুশয্যাশায়ী, রোগ-যন্ত্রণায় প্রপীড়িত, নির্য্যাতিত, ক্লিষ্ট—তোমার একমাত্র সহোদরার বৈধব্যদশা সহ্য করিতে পারিবে কি?

লীলাময়ের এই রহস্যময় প্রাণঘাতী লীলা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে, গুরু গুরু করিয়া বুক কাঁপিতে থাকে। যাহাকে তিনি আপনার করিয়া কোলের কাছে অল্পে অল্পে টানিয়া লন, উপর্য্যুপরি আঘাতের দ্বারা তাহাকে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তাহার সংসার-মায়া-পাশ এই ভাবেই ছিন্ন করেন। সাংসারিক যাবতীয় সুখ ও শান্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করিয়া, মর্ম্মন্তুদ রোগ-যন্ত্রণার আগুনে পুড়াইয়া—পরমাত্মীয়ের অসহনীয় বিয়োগ-বেদনায় ব্যথিত করিয়া, শ্রীভগবান্ রজনীকান্তের সংসারাত্মিকা মতিকে ধীরে ধীরে অন্তর্ম্মুখী করিতেছেন,—ইহা বুঝিয়া আমাদিগকে অশ্রুসংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কালরোগের ক্রমবৃদ্ধি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রজনীকান্তের গলদেশে দুরারোগ্য ক্যান্‌সার (Cancer) ক্ষত হইয়াছিল। এই ক্যান্‌সার ক্ষত তাঁহার গলদেশের কোন্ স্থান আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে মরণের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহা একটু বিশদভাবে এখানে বলা আবশ্যক।

আমাদের গলদেশে দুইটি নালী আছে; একটি শ্বাসনালী (Respiratory passage) অপরটি অন্ননালী (Gullet)। প্রথমটির দ্বারা আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে আমাদের ভুক্তদ্রব্যসমূহ পাকস্থলীতে গিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের গলদেশের সম্মুখভাগে শ্বাসনালী এবং ঠিক তাহার পশ্চাতে অন্ননালী অবস্থিত। শ্বাসনালী তিন অংশে বিভক্ত; উপরের অংশকে লেরিঙ্কস্ (Larynx), মধ্যের অংশকে ট্রাকিয়া (Trachea) এবং নীচের অংশকে ব্রঙ্কাস্ (Bronchus) বলে। লেরিঙ্কসে ভোকাল্ কর্ডস্ (Vocal chords) নামে এক যোড়া যন্ত্র আছে, ইহাদের সাহায্যে আমরা কথা কহি।

রজনীকান্তের লেরিঙ্কসে ক্যান্‌সার হওয়ায় সেই স্থানটি ফুলিয়া উঠে, তাহার ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে তাঁহার খুবই কষ্ট হইত। ক্রমে ক্রমে এই ক্যান্‌সার যখন প্রবলাকার ধারণ করিয়া রজনীকান্তের শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের পথটিকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করে, সেই সঙ্কট-সময়ে তাঁহার শ্বাসনালীর ট্রাকিয়া অংশে ট্রাকিওটমি অস্ত্রোপচার (Tracheotomy Operation) করা হয়। এই অস্ত্রোপচার

দ্বারা তাঁহার শ্বাসনালীর ট্রাকিয়া অংশে যে ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়, তাহার সাহায্যে রজনীকান্ত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে রজনীকান্ত লিখিয়াছেন,—"যখন Operation tableএ (অস্ত্র করিবার টেবিল) শুইয়ে আমার গলায় ছেঁদা ক'রে দেওয়া হ'ল ও নিঃশ্বাস ঝড়ের মত গলা দিয়ে বেরুল, তখন মনে হ'ল যে, দয়াময় বুঝি নিজ হাতে নিঃশ্বাসের কষ্ট ভাল ক'রে দিলেন।"

"অস্ত্র করাতে আমি বেশি ব্যথা পাই নাই ; কিন্তু বড় ভয় হ'য়েছিল। আমার তিন দিন তিন রাত্রি ঘুম ছিল না, ঐ অস্ত্র করা হ'লে হাস-পাতালে এলাম, আর সমস্ত দিন ঘুম।"

এই অস্ত্রোপচার দ্বারা রজনীকান্তকে আশু মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আসল রোগের কোন প্রতিকার হইল না। রজনীকান্তের গলদেশের যে স্থানে অস্ত্র করা হইল, তাহার উপরিভাগে লেরিঙ্কসের চারিধারে ক্ষত অল্পে অল্পে ছড়াইয়া পড়িতে-ছিল। এ সম্বন্ধে রজনীকান্তও লিখিয়াছেন,—"নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাচ্ছিলাম ; গলায় একটা ছিদ্র ক'রে দিয়েছে। সেইখান দিয়ে নিঃশ্বাস চল্‌ছে। গলার ক্যান্‌সার যেমন, তেম্‌নি গলার মধ্যে ব'সে রয়েছে। তার ত কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না।" কথাটা খুবই ঠিক, আর চিকিৎসকগণও অস্ত্র করিবার সময়ে এই কথার সমর্থনে বলিয়াছিলেন,—"অস্ত্র করিয়া কিছুদিন জীবন রক্ষা করা হইবে মাত্র। আসল রোগের প্রতিকার কিছুই হইবে না।" তাঁহাদের মতে—"The treatment would be simply palliative" (এখনকার চিকিৎসা হবে, একটু শান্তি দেওয়া মাত্র।)

হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রজনীকান্ত সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক মেজর বার্ড (Major Bird) সাহেবের অধীনে রহিলেন।

জ্বর কমাইবার জন্য ঔষধ ও ব্যথা কমাইবার জন্য গলার উপর প্রলেপ (Paint) দেওয়া হইল, কিন্তু ক্ষত-চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হইল না।*

অস্ত্রোপচারের কয়েক দিন পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত মহাশয় 'কটেজে' রজনীকান্তকে দেখিতে আসিলেন। কৃতজ্ঞ রজনীকান্ত তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন,—"সেদিন আপনি ত আমার মায়ের কাজ ক'রেছিলেন। আপনি না থাক্‌লে, আমি তখনই ঐ বাড়ীতে মর্‌তাম। আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি,—সে কেবল আপনার কৃপায়। আপনি উৎসাহ দিলেন, কোন ভয় নাই জানালেন, তাই আমি মেডিকেল কলেজে আস্‌তে পেরেছিলাম।"

'কটেজ'গুলির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মথুরামোহন ভট্টাচার্য্য ও গিরিশচন্দ্র মৈত্র মহাশয়গণ প্রতিদিনই রজনীবাবুর তত্ত্বাবধান করিতেন, তা ছাড়া স্বয়ং বার্ড সাহেব এবং ডাক্তার সারওয়ার্দ্দি (Dr. Suhrawardy) অন্যান্য চিকিৎসকগণের সহিত রজনীকান্তকে দেখা-শুনা করিতেন। কিন্তু হেমেন্দ্রবাবুর সেবা, শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানে রজনীকান্ত ও তাঁহার পরিজনবর্গ বিশেষ ভরসা পাইতেন। মাঝে মাঝে হেমেন্দ্রবাবুর সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত বিজিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এ বিষয়ে এই বিপন্ন পরিবারকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। কবি তাঁহার রোজনাম্‌চার একস্থলে বিজিতেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"This boy is named Bijitendra Nath Bose, a fourth year medical student, a Barisal man, knows me and is doing all possible nursing. He is an acquisition sent by God." (এই ছেলেটির নাম বিজিতেন্দ্রনাথ বসু, ইনি বরিশালবাসী, মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, আমার পরিচিত। ইনি আমার যথাসাধ্য সেবা করিতেছেন। ইনি ভগবানের দান।)

অস্ত্রোপচারের পর রজনীকান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন; অল্প জরও দেখা দেয়। ৭।৮ দিন পরে যখন তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করেন, সেই সময়ে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীনের বিবাহের দিন স্থির করিয়া ১৬ই ফাল্গুন তাহার বিবাহ দেন। রজনীকান্তের গলদেশে অস্ত্রোপচারের যোল দিন পরে এই শুভকার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রজনীকান্তকে কয়েকদিনের জন্য 'কটেজ' ত্যাগ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুত্রের বিবাহ দিয়া রজনীকান্ত পুনরায় ২৪এ ফাল্গুন 'কটেজে' ফিরিয়া আসেন, এবং ঐ দিন হইতে মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত তিনি 'কটেজে' ছিলেন।

অস্ত্রোপচারের পর হইতে আহার-গ্রহণে তাঁহার কষ্ট হইত। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত, এ অবস্থায় বেশির ভাগই তাঁহাকে তরল খাদ্য-দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"পরশু কি তার আগের দিন ভাত ঠেকে একেবারে অজ্ঞানের মত হ'য়ে গিয়েছিলাম। এম্‌নি ক'রে একদিন হয়ে যাবে। ক্রমে দুধও বাধ্‌বে।"

পুত্রের বিবাহ দিয়া 'কটেজে' ফিরিবার পর হইতেই রজনীকান্তের রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একদিকে তাঁহার আহার করিবার শক্তি কমিতে লাগিল, অপরদিকে তাঁহার নিদ্রাও কমিয়া আসিল। এই সময়ে গলার বেদনা বেশি হইলে তিনি ভাত, রুটি প্রভৃতি মোটেই খাইতে পারিতেন না; খাইবার চেষ্টা করিলে কণ্ঠনালীতে বাধিয়া সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। সাধারণ আহার্য্য গলাধঃকরণ করা যখন অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তিনি তরল খাদ্য দ্রব্য,—দুধ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ

করিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এই তরল খাদ্যও নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়িত।

রজনীকান্তের গলদেশে ছিদ্রমুখে শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের জন্য যে রবারের নল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, গলার ভিতর হইতে শ্লেষ্মা ও রক্তের ডেলা (Blood clot) আসিয়া মাঝে মাঝে সেই ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিত। তখন শ্বাসপ্রশ্বাস চলাচলের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইত, এবং রজনীকান্তের প্রাণও সেই সঙ্গে হাঁপাইয়া উঠিত। এই জন্য প্রথম প্রথম দিনে দুইবার এবং শেষাশেষি দিনে তিন চারিবার করিয়া নল বদলাইয়া দেওয়া হইত। এই নল বদলাইয়া দিবার জন্য হেমেন্দ্রবাবুকে অধিকাংশ সময় 'কটেজে' থাকিতে হইত। তিনি না থাকিলে কবির মধ্যম পুত্র জ্ঞানও নল বদলাইয়া দিত।

বহুবাজারের বাসায় থাকিবার সময় একদিন একটি জমাট বাঁধা রক্তের ডেলা নলের মুখে আট্‌কাইয়া গিয়া রজনীকান্তের জীবনকে বিশেষ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তখন জ্ঞান ও হেমেন্দ্রবাবু কেহই বাসায় ছিলেন না, নল বদ্‌লাইয়া দিবার জন্য কাহাকেও কাছে না পাইয়া দারুণ যাতনায় দুর্ব্বল শরীরে রজনীকান্ত একজন সহচর-সমভিব্যাহারে হাসপাতালের অভিমুখে কম্পিত চরণে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। দুর্ব্বল শরীর লইয়া তাঁহাকে পুনরায় বাসায় ফিরিতে হইল। প্রাণ যায়। তখন অগত্যা রজনীকান্তের পতিগতপ্রাণা সাধ্বী পত্নী, অতি সাবধানে পুরাতন নলটি খুলিয়া লইয়া একটি নূতন নল ছিদ্রপথে পরাইয়া দিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিলেন। রজনীকান্ত এই সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছেন,—"আজ সকালে tube (নল) এর মধ্যে blood clot (জমাট বাঁধা রক্ত) আট্‌কে প্রাণ যাবার মত হয়েছিল। আমার

wife (স্ত্রী) সাহস করে tube (নল) খুলে নূতন tube (নল) পরিয়ে দিলে তবে বাঁচি। সে blood clot (জমাট বাঁধা রক্ত) যদি, দেখ তবে অবাক্ হবে। একেবারে tube (নল) এর মুখ block (বন্ধ) ক'রে দিয়ে বসে থাকে।" এই জমাট বাঁধা রক্তের ডেলা মাঝে মাঝে রজনীকান্তের জীবন বিপন্ন করিত। আর একদিনের ঘটনার সম্বন্ধে রজনীকান্ত লিখিয়াছেন,—"একটা বড় clot (জমাট বাঁধা রক্ত) এসে বেধে গেল, তা নল দিয়ে কি গলার ছিদ্র দিয়ে বাহির হওয়া অসম্ভব; কাশ্‌তে কাশ্‌তে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম। হেমেন্দ্র এসে forcep (সন্না) দিয়ে টেনে বের কর্‌লে তবে বাঁচি।"

ঢোঁক গিলিতে রজনীকান্তের খুব কষ্ট হইত। সময়ে সময়ে কাশি এত বেশি হইত যে, সারারাত্রিই তাঁহাকে কাশিয়া কাশিয়া কাটাইতে হইত। আর এই কাশির সঙ্গে সঙ্গে গলার বেদনা খুব বাড়িয়া উঠিত। সময়ে সময়ে এই কাশির ফলে তাঁহার গলদেশের ছিদ্র দিয়া অনর্গল রক্ত বাহির হইতে থাকিত।

রাত্রিতে রোগের যন্ত্রণা এত বাড়িত যে, মোটেই তাঁহার ঘুম হইত না। এই জন্য তাঁহাকে রাত্রিতে injection (গায়ের চামড়া ফুঁড়িয়া ঔষধ) দিবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে হিরোইন (আফিং হইতে তৈরী ঔষধ) ইনজেক্‌সন দেওয়া হইত; তাহার পর যখন ইহাতে কোন কাজ হইত না অর্থাৎ নেশায় ঘুম আসিত না, তখন মরফিয়ার (morphia) ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইত। এই ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পর প্রথম প্রথম রজনীকান্তের বেশ ঘুম হইত। কিন্তু শেষে ইহাও বিফল হইত; তখন তিনি নানাপ্রকার আলাপ ও গল্প লিখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এই ইন্‌জেক্‌সন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"হাইপোডারমিক্ পিচকারী (Hypodermic Syringe) দিয়ে হিরোইন

(Heroine, a preparation of opium) inject (গায়ের চামড়া ফুঁড়ে) ক'রে না দিলে সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে নৃত্য ক'রে বেড়াই।" *

এই ইন্‌জেক্‌সন ক্রমে তাঁহার দেহের উপর নেশার মত প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ দিনে একবার করিয়া ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইত, তাহার পর দুইবার করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও রজনীকান্তের মন উঠিত না, তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ইন্‌জেক্‌সন দিবার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করিতেন। তিনি বলিতেন,—"মনে হয় যে সমস্ত দিন পিচকারী দিয়ে মড়ার মত অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকি। * * * Injection (ফুঁড়ে ঔষধ) দিতে চায় না। আরে পাগল, মাস খানেক থেকে ঐ হচ্ছে। আমার কি একটা মৌতাত হয় না? সেই মৌতাতী মানুষের আফিমটুকু কেড়ে নিয়ে সর্ব্বনাশ করতে চাও?"

২৭এ ফাল্গুন তারিখে তিনি লিখিলেন,—"আমার আজকার অবস্থা ও কালকার অবস্থা খুব নিরাশার। সব খারাপ লাগ্‌চে। খেতে ওবেলাও পারি নাই, এবেলাও বড় কষ্ট ক'রে খেয়েছি। আমার বোধ হয়, আহারের সমস্ত আয়োজন সম্মুখে নিয়ে আমি অনাহারে মর্‌ব।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল—বাস্তবিকই তিনি আহার্য্য সামগ্রী সম্মুখে রাখিয়া অনাহারে মারা গিয়াছিলেন।

একদিন রজনীকান্তের গলার ছিদ্র দিয়া খুব বেশি রক্তপাত হয়। তাঁহার পত্নী, বৃদ্ধা জননী ও পুত্রকন্যাগণ এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া খুবই ভীত হন। রজনীকান্ত তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বলেন,—"এরা (ডাক্তারেরা) বলে যে, একদিন bleeding (রক্তপাত) হ'য়ে বাসা ভেসে যাবে। সেই দিন ভয় করো না; blood stop (রক্ত বন্ধ) করো না; দুই তিন দিন ধ'রে এই রকম bleeding (রক্তপাত) হবে সমানে।".

এই রক্তপাত, জ্বর, কাশি, গলার বেদনা ও ফুলা, আহারে কষ্ট, অনিদ্রা প্রভৃতি যুগপৎ মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে টানিতেছিল।

ফাল্গুন মাসের শেষ বা চৈত্রের প্রথম হইতেই ডাক্তার বার্ড সাহেব রজনীকান্তের বৈদ্যুতিক এক্স্-রে (X-Ray) চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ইহা প্রথমে গলার বাহিরে দেওয়া হইত, পরে গলার ভিতরেও দেওয়া হয়। ডাক্তার ই, পি, কোনর (Dr. E. P. Connor) ও তাঁহার একজন সহকারী এই বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এই এক্স্-রে চিকিৎসার প্রণালী রজনীকান্তের কথায় বলিতেছি,—"X-Ray treatment (এক্স্-রে চিকিৎসা) আজ সকালে আরম্ভ হয়েছে। একখানা খাটে চিৎ ক'রে শোয়ায়, পিঠের নীচে বালিশ দেয়। মাথাটা বিছানার উপরেই নীচু হ'য়ে পড়ে—ঠিক ঝোলার মত। গলাটা stretched (লম্বা) হয়। তারই (গলার) উপর একটা বাক্স ঝুলছে, সেই বাক্সের তলায় ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে এসে ray (আলো) গলার উপর পড়ে। Connor (কোনর) সাহেব—সেই না কি এর specialist (বিশেষজ্ঞ)। সেই আলো এসে গলায় লাগে, তা টের পাওয়া যায় না।"

প্রথমে তিনি এই এক্স্-রে গলার ভিতরে দিতে চান নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"যদি গলার মধ্যে X-Ray (এক্স্-রে) দেয়, তবে ৫।৭ মিনিট হাঁ করে থাকতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব। * * * * * * Before X-Ray treatment begins I die "(এক্স্-রে চিকিৎসা আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বেই আমি মারা যাব।)" কিন্তু গলার ভিতরে এই চিকিৎসা আরম্ভ ক'রবার পর রজনীকান্ত বেশ একটু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন; তিনি লিখিয়াছিলেন,—"ডাক্তার বার্ড বলেছে,

X-Ray (এক্স্‌-রে) skin (চামড়া) আর flesh (মাংস) penetrate (ভেদ করে) ভিতরে যায়; তাতে কতক ফল হতে পারে। দুই দিন দিয়ে ব্যথা একটু কম বুঝি। কাল থেকে একটু ঘুমুতেও পার্‌ছি।" এই চিকিৎসায় ক্রমে ক্রমে তিনি আরও বেশি উপকার পাইলেন। তাঁহার রোজনাম্‌চায় দেখিতে পাই,—"X-Ray (এক্স্‌-রে) দেওয়া হচ্ছে, আর ধীরে ধীরে ভাল বোধ কর্‌ছি। বেদনা খুব কমে গেছে; ফোলাও কমে গেছে, খেতে পার্‌ছি। দুর্ব্বলতা অনেক কমেছে।" আশার এই অভিনব আলোকপাতে কবি ও তাঁহার পরিজনবর্গ অনেকটা ভরসা পাইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, ভগবানের কৃপায় হয়ত এ দারুণ ব্যাধির হাত হইতে এবার রজনীকান্ত মুক্ত হইবেন! কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে, হঠাৎ গলার বেদনা ও জ্বর বাড়িয়া গেল। ঘোর ঘনঘটার মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুদ্বিকাশ দেখাইয়া, সে আশু উপকার কোথায় অন্তর্হিত হইল। কবি লিখিলেন,—"এক্স্‌-রের উপরও ক্রমে faith (বিশ্বাস) হারাচ্ছি।"

ক্যান্‌সার ক্ষত ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল। রজনীকান্তের মুখ দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পুঁয-রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তিনি এ বিষয়ে রোজনাম্‌চায় লিখিতেছেন,—"A fluid of foul smell, mixed with blood, was coming out of the mouth, the whole night. I asked Dr. Connor, he said that it was a re-action of the X-Ray." (সমস্ত রাত্রি মুখ দিয়া রক্তমিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত একটা তরল পদার্থ বাহির হইয়াছে। ডাক্তার কোনরকে ইহার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, উহা এক্স্‌-রেরই প্রতিক্রিয়া।) কবি হতাশ হইয়া এক্স্‌-রে চিকিৎসা ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে এক দিন রজনীকান্তের নাক দিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে

লাগিল, এই রক্তপাতে তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী ও পিতৃবৎসল পুত্র-কন্যাগণও এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভীত হইলেন। রজনীকান্তের জননী তখন স্বতন্ত্র বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি লোক পাঠান হইল। সে সময়ে তিনি জপ করিতে বসিয়াছিলেন। জপে নিযুক্ত হইলে, কান্ত-জননী মনোমোহিনী দেবীর বাহ্য জ্ঞান থাকিত না, তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। আমাদের এই কথার সমর্থনে আমরা রজনীকান্তের ভগিনী শ্রীমতী অমৃতাসুন্দরীর লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি,—"সেই সময়ে দাদা মহাশয়ের নাসিকা দিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে আরম্ভ হওয়ায়, তিনি যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তদবস্থায় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে 'কটেজে' লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরিত লোক কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ জানাইল। আমার মাতা ঠাকুরাণী ও খুড়ীমাতাঠাকুরাণীর সহোদরা যথাসম্ভব শীঘ্র জপ শেষ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে উঠিবার জন্য রাস্তাভিমুখে ছুটিলেন,—দেহাচ্ছাদনের বস্ত্র পর্য্যন্ত লইতে ভুলিয়া গেলেন। আমার দশাও এইরূপই হইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া আমরা অনেকক্ষণ খুড়ীমাতাঠাকুরাণীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত বিলম্ব দেখিয়া, সকলে গাড়ী হইতে অবতরণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার নিকট গেলাম। যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর এ জীবনে ভুলিব না। তিনি কুশাসনের উপরে কালী-দুর্গা-নাম-শোভিত নামাবলী দ্বারা দেহাচ্ছাদিত করিয়া, মুদিত নেত্রে জপে মগ্না রহিয়াছেন; যেন তাঁহার উপরে কোন ঘটনা ঘটে নাই, যেন তাঁহার একমাত্র পুত্র আজ মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হন নাই, যেন তিনি চির-সুখিনী, যেন তিনি চির-ভাবনা-বিরহিতা। খুড়ী-

মাতাঠাকুরাণীর ভগ্নী ও আমার মাতাঠাকুরাণী বলিলেন,—'এ কি? এ কি? আপনার কি কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই? আপনার কি চিরকালই এক ভাব?' বলিয়া কত মন্দ বলিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু কিছু বলিতে পারিলাম না। তাঁহার তৎকালীন ভাব-গতিকে আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল, আমি জানু পাতিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তথা হইতে সরিয়া পড়িলাম।

সে দিনকার সমস্ত রজনীই সেই আলোচনায় কাটাইলাম। সেই যে—'আপনার সব সময়েই এক ভাব'—এই কথাই এখন আমার আলোচনার বিষয় হইল। মহামূল্য বসনাদি পরিধান করিয়া একমাত্র প্রিয় পুত্র আফিসে যাওয়ার সময়ে তিনি যেমন মনোযোগের সহিত জপ করিতেন, সেই পুত্র মুমূর্ষু শুনিয়া, তেমনই মনোযোগের সহিত জপ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি অশ্রুশূন্য অবস্থায় মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের চক্ষে জলের সীমা-পরিসীমা ছিল না।"

এই অপরিসীম ধৈর্য্যশীলা ও ভক্তিমতী জননীর সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াই—রজনীকান্ত হাসপাতালের নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও ধৈর্য্য ও ভগবন্নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

যখন এক্স্-রে চিকিৎসায় কোন ফল হইল না, তখন তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি তাঁহার বৈবাহিক যাদবগোবিন্দ সেন মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত এনাৎপুর-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পিতার ক্যান্সার হইয়াছিল। স্থানীয় কোন এক ব্যক্তি শৈলেশবাবুর পিতাকে নীরোগ করিয়াছিলেন। সে লোক এখন জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্যান্সার রোগের সেই অব্যর্থ ঔষধ জানে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন

সামান্য একটি তৃণের অবলম্বনে জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, রজনীকান্ত তেমনই এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যেন কতকটা ভরসা পাইলেন। টেলিগ্রাম করিয়া শৈলেশবাবু ও সেই লোকটিকে কলিকাতায় আনান হইল এবং তাঁহার দ্বারা রজনী-কান্তের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মেডিকেল কলেজের একটি নিয়ম আছে যে, কটেজে অবস্থানকালে কোন রোগী বাহিরের কোন চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারিবে না। কিন্তু বাধ্য হইয়া প্রাণের দায়ে রজনীকান্ত বন্ধু-বান্ধবগণের পরামর্শে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

চিকিৎসা আরম্ভ হইল—কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কবি জীবনে হতাশ হইয়া পড়িলেন। চক্ষুর সম্মুখে পরিজনবর্গের বিষাদ-মলিন ও চিন্তাজর্জ্জরিত মুখ তাঁহার রোগ-যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা বাড়াইতে লাগিল। সাধ্যমতে তিনি আপনার অসহনীয় যন্ত্রণা চাপিবার চেষ্টা করিতেন। ক্ষুধায় অস্থির, আহার্য্য বস্তুও সম্মুখে রহিয়াছে; কিন্তু খাইবার উপায় নাই। খাইলেই সমস্ত দ্রব্য গলায় বাধিয়া গিয়া নাক মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। পাছে তাঁহার এই কষ্ট দেখিয়া অন্য কেহ কষ্ট পায়, তাই ক্ষুধা থাকিলেও তিনি—"ক্ষুধা নাই" বলিয়া পরিজনবর্গকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই মনোভাব চাপিবার চেষ্টা পতিগতপ্রাণা পত্নীর কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। তাঁহার কাছে রজনীকান্ত হাজার চেষ্টা করিয়াও কিছু লুকাইতে পারিতেন না। পত্নীর অশ্রু-সজল বিষাদ-কালিমা-লিপ্ত মুখ দেখিয়া রজনীকান্ত যে যন্ত্রণা অনুভব করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত!

কাঁচড়াপাড়ার সিদ্ধ সন্ন্যাসী পাগ্‌লাবাবার কথা শুনিয়া, তাঁহার

ঔষধ সেবন করিবার জন্য রজনীকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিলেন, পাগ্‌লাবাবার ঔষধে অনেকে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। তাই ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের রোজনাম্‌চায় রজনীকান্তকে লিখিতে দেখি,—"আমার পাগ্‌লাবাবাকে এনে দিন, একবার দেখি। আমি ভিক্ষা ক'রে খরচ দেবো।"

এই সময়ে আর এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছিল। রজনীকান্তের বাম কর্ণের নিম্নস্থান হঠাৎ ফুলিয়া উঠে। যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। পাগ্‌লাবাবার ঔষধ আনান হইল। তিনি রজনীকান্তকে খাইবার ঔষধ এবং এই ফুলার জন্য একটি প্রলেপ দিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া এবং প্রলেপ লাগাইয়া রজনীকান্ত কতকটা সুস্থ বোধ করিলেন। ৪ঠা আষাঢ় তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি ঔষধে যে ফল পেয়েছি, তাহা দৈবশক্তির মত। আমি ম'রে গিয়েছিলাম, আমাকে বাবা বাঁচিয়েছেন। তবে এই বাঁয়ের দিকের ব্যথাটা আমার কমিয়ে দিন। ফুলো খুব কমেছে। ব্যথাটা কমিয়ে দিন।" * * *
"বেদনা একেবারে নাই। আর এই যে কাশি নিবারণ হয়, এটা একটা Blessing (আশীর্ব্বাদ)। একটিবারও কাশি নি। কত যে আরাম পেয়েছি, তা জানাবার উপায় নাই। আজ যেন সেই heavy breath (শ্বাসকষ্ট) টা নাই।"

কিছুদিন পরে, কিন্তু রোগ আবার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির দিকে যাইতে লাগিল। পাগ্‌লাবাবার ঔষধ বন্ধ হইল। বাম কর্ণমূল পূর্ব্বেই ফুলিয়াছিল, এবার দক্ষিণ কর্ণমূলও ফুলিয়া উঠিল। অসহ্য প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ, বন্ধুবান্ধব ও পরিজনবর্গের অক্লান্ত সেবা, শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা কবির এই যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিল না। অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করিবার

জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত দৈহিক কষ্ট বিস্মৃত হইবার জন্য, "দেহাত্মিকা মতি"র গতি ভগবানের চরণাভিমুখী করিয়া দিলেন। মানুষের প্রদত্ত ঔষধ ও প্রলেপ যখন তাঁহার যন্ত্রণা লাঘব করিতে পারিল না, তখন তিনি শান্তি-প্রলেপের জন্য, সেই অনন্তশরণের শরণ লইলেন। তিনি বুঝিলেন, শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন তাঁহার এ কালব্যাধির আর কোনও ঔষধ নাই। তাই কৃত-সঙ্কল্প কান্তকে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও লিখিতে দেখি,—"ভগবান্, আমার ত শারীরিক কষ্ট। আমার আত্মা ত কষ্ট-মুক্ত। দেহ-মুক্ত হ'লেই আত্মা কষ্ট-মুক্ত হবে। তবে আত্মাকে দেহ-মুক্ত কর দয়াল, আর দেহ চাহি না। দেহ আমাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। আমার আত্মাকে তোমার পদতলে নিয়ে যাও।"

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে তাঁহার রোগ খুব প্রবল হইয়া উঠিল। জ্বর, ফুলা, শ্বাস, ভোজন-কষ্ট, রক্তপাত, কাশি—এ সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন গায়ের জ্বালা আরম্ভ হইল। নিদ্রা নাই, স্বস্তি নাই, অহরহঃ কেবল যন্ত্রণা! প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়! দেহ-কারার মধ্যে সে আর কোন প্রকারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না! বাম কর্ণমূলের নীচে যে স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণা এত বাড়িল যে, শেষকালে বাধ্য হইয়া তাহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হইল। অস্ত্র করিবার পর রজনীকান্ত অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু উহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই!

একমাত্র পুত্রের জীবনে আশা নাই, চোখের সাম্‌নে প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করিতেছে,—পুত্র-গত-প্রাণা জননী কেমন করিয়া সহ্য করিবেন! মানুষের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও ঔষধ যখন বিফল হইল, তখন দৈববিশ্বাসী ভক্তিমতী রমণী দেবতার করুণা ভিক্ষার

জন্য দেব-চরণে আত্ম-নিবেদন জানাইতে ছুটিলেন। রজনীকান্তের 'আশী বছরের বুড়ো মা' পুত্রের অজ্ঞাতসারে বাবা তারকনাথের কাছে 'ধর্ণা' দিবার জন্য তারকেশ্বর গমন করিলেন। রজনীকান্ত যখন এই ঘটনার কথা জানিতে পারিলেন, তখন বুড়া মায়ের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন,—"আমার আশী বছরের মা 'ধর্ণা' দিতে গেল, ব্যাকুল হ'য়ে যে, মরি ত' শিবের পায়ে মরব * * * * * বুড়ো মার জন্য কষ্ট লাগ্‌ছে। মনে হয়, পুত্র-গত-প্রাণা বুঝি নিজের প্রাণ দিয়ে, পুত্রের প্রাণ দিতে গেল।"

তিন দিনের পর কান্ত-জননী বাবা তারকেশ্বরের স্বপ্নাদিষ্ট ঔষধ পাইলেন। ঔষধ আনিয়া পুত্রকে তিনি তাহা সেবন করাইলেন। কিন্তু এ দৈব-ঔষধ সেবনেও রজনীকান্তের কোন উপকার হইল না।

এক দিনের অবস্থা এমন হইল যে, তিনি ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিতে লাগিলেন। পরিজনবর্গ ভয়ে আকুল হইলেন। তাঁহার চারি পার্শ্বে ক্রন্দনের ভীষণ রোল উত্থিত হইল। কিন্তু এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও তাঁহাদের আশ্বাস দিবার জন্য রজনীকান্ত লিখিয়া জানাইলেন,—"ভয় নাই, এখনই প্রাণ বাহির হবে না। বড় যাতনা, লিখে জানাতে পারৃছি না।" রজনীকান্ত পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছেন, হয় খুব বেশি রক্তপাতে, নয় আহার বন্ধ হইয়া তিনি মারা যাইবেন। তাই তাঁহার এই রক্তপাত দেখিয়া পরিজনবর্গ আশু মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন।

ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহের পর হইতেই তাঁহার গায়ের জ্বালা বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ জলপিপাসা উপস্থিত হইল। এই সময়ে একদিন রজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন,—"আমার গায়ের জ্বালা নিবারণ ক'রে দিন, দোহাই আপনার। আর সহ্য কর্‌তে পারৃছি না,

আমাকে হরিনাম দিন।" তখন মাঝে মাঝে রজনীকান্তের মুখ দিয়া পচা পূঁজ নির্গত হইতে লাগিল। কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান্ একে একে রজনীকান্তের সমস্ত দৈহিক শক্তি হরণ করিয়া লইতেছিলেন, তাঁহার সমস্ত আরাম, তাঁহার পার্থিব শান্তি, পার্থিব আনন্দ সকলই হরণ করিয়া লইয়া ভগবান্ অল্পে অল্পে তাঁহাকে নিজের কোলের মধ্যে টানিতেছিলেন। রজনীকান্তের—"আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন, ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।"—এই আকুল প্রার্থনার উত্তরে ভগবান্ তাঁহার আমিত্বের বনিয়াদকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছিলেন। জগতের সমস্ত শক্তি, জগতের সমস্ত চেষ্টা, যত্ন, চিকিৎসা, বিজ্ঞানের সমস্ত আয়োজন—সেই অপরাজেয়ের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। চলিবার যে সামান্য শক্তিটুকু ছিল, তাহাও রহিত হইল। রজনীকান্তের পা দুটি ফুলিয়া উঠিল। সাধারণ আহার্য্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না; দুধ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি তরল খাদ্য—তাও অতি কষ্টে তাঁহাকে গিলিতে হইত। তাঁহার হজমের শক্তিটুকুও এই সময় হইতে কমিয়া আসিল।

গায়ের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে জলপিপাসা খুব বাড়িয়া উঠিল। নিজ গৃহের জলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি 'কটেজে'র যে অংশে ছিলেন, তাহারই পাশের অংশে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদরার পৌত্রীজামাতা রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পীড়িত হইয়া সপরিবার বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের গৃহে অতি শীতল জল থাকিত। রজনীকান্তের পরিবারবর্গ তাঁহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। সেই সূত্রে একদিন তাঁহাদের ঘর হইতে কবির জন্য জল চাহিয়া আনা হয়। সে জল রজনীকান্তের এত ভাল লাগে যে, প্রতিদিনই তাঁহাদের ঘর হইতে রজনীকান্তের জন্য সাত আট বার জল চাহিয়া আনা

হইত। এই সযত্ন-রক্ষিত শীতল জল পান করিয়া রজনীকান্ত অত যন্ত্রণার মধ্যেও কতকটা তৃপ্তি লাভ করিতেন। তাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কবি জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া কম্পিত হস্তে তাঁহার হৃদয়ের কবিত্ব-উৎসের শেষধারা উৎসারিত করিয়া লিখিলেন,—

১

বাসার কাছে, পরম সুখী দু'জন,
পরম সুখে বাঁধিয়াছিল বাসা ;
পীড়িত দেহ, নিরাশাচিত স্বামীটি,
সতীটি তবু ছাড়ে না তার আশা।

২

কত যত্ন কত পরিশ্রমে
সোনার স্বামী উঠিল তার বাঁচি,
শীতল হ'ল পত্নীগত প্রাণটি
সতী বলিত, "এখনো আমি আছি।"

৩

আগে কি জানি, শীতল কথা পাশে
রাখিত তারা এত শীতল বারি।
আমি চাহিলে দিতে বলিত স্বামীটি,
আনিয়া দিত কি আনন্দে নারী।

কবিতাটির শেষে রজনীকান্ত লিখিলেন,—

"রুগ্নের কৃতজ্ঞতার উপহার।"

এই কবিতাটি রজনীকান্তের শেষ রচনা। ১৮ই ভাদ্র তিনি ইহা রচনা করেন এবং ঐ দিনেই তিনি তাঁহার প্রতিবেশী সুখী দম্পতীকে উহা উপহার দেন।

ক্রমে গণা দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। মুমূর্ষু কান্তের ক্ষীণ লেখনীমুখে বাহির হইল,—"ভগবান্ যখন বিমুখ হন, তখন মানুষের শক্তি পরাজিত হয়।" সপ্তরথি-বেষ্টিত নিরস্ত্র অভিমন্যুর ন্যায় রজনীকান্তের ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহটুকুকে নানা ব্যাধি নানা দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। শীর্ণ দেহে রজনীকান্ত 'শেষের সে দিনের' জন্য উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণার অবধি নাই। কণ্ঠহীন, চলচ্ছক্তি-রহিত, রোগক্লিষ্ট কবির এ মর্ম্মভেদী কাহিনী আর আমরা লিখিতে পারিতেছি না। তাঁহার রোগশয্যার অন্যতর সহচর কবি সন্তোষকুমারের কয়েকটি কথা তুলিয়া দিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি।—

শয্যাপার্শ্বে বসি তব কত দিন—কত মাস ধরি,
হে ভাবুক কবি!
নিমেষ পলকহীন নয়নে হেরেছি রোগ-ক্লিষ্ট
শান্ত তব ছবি।
বুঝিয়াছি কি দাহনে দগ্ধ করি' নিশি দিন
দুরন্ত অনলে,
সর্ব্ব চেষ্টা তুচ্ছ করি, দারুণ বিরামহীন ব্যাধি
প্রতি পলে পলে,
তোমারে মৃত্যুর পথে গিয়াছে লইয়া; যাতনায়
সুশীতল জল
ল'য়েছ বদনে, তা'ও প'ড়েছে গড়ায়ে, সিক্ত করি
শুধু শয্যাতল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোজনাম্‌চা

হাসপাতালের রোজনাম্‌চা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। হাসপাতালে আশ্রয়-গ্রহণের সময় হইতে মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত বাক্যহারা রজনীকান্তকে লেখনী-সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তৃষ্ণার জলটুকু চাওয়া হইতে লোকের সহিত কথা কওয়া, রোগ-যন্ত্রণার কাতরোক্তি, বন্ধুগণের সহিত আলাপ, কবিতা ও সঙ্গীত-রচনা, ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত তাঁহার মনের সমস্ত ভাবই তাঁহাকে লেখনী-সাহায্যে জানাইতে হইত। সামান্য রহস্যালাপ হইতে আরম্ভ করিয়া, বড় বড় ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসের আখ্যায়িকা পর্য্যন্ত যিনি কথার সাহায্যে ব্যক্ত করিতেন, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই যিনি কথা কহিয়া ও গান গাহিয়া কাটাইতেন, অতিরিক্ত স্বরচালনায় যাঁহাকে কখনও কোন দিনও কাতর হইতে দেখা যায় নাই, সেই অসাধারণ-ভাষণপটু রজনীকান্তের কথা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

"যেটা যার এ সংসারে
তীব্রতম আকর্ষণ"—

তাহাই কাড়িয়া লইয়া ভগবান্ রজনীকান্তকে এক উৎকট পরীক্ষার

মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কণ্ঠহারা রজনীকান্ত লেখনীর সাহায্যে কিরূপে তাঁহার ব্যক্তিত্ব নানাভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—কি ভাবে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও ভগবানের চরণে তিনি একান্ত নির্ভর করিয়াছিলেন, কি ভাবে তিনি সমস্ত দৈহিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার রোগশয্যা-পার্শ্বে সমাগত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে রহস্যালাপে ও নানা আলোচনায় পূর্ব্বের ন্যায় পরিতৃপ্ত করিতেন, কি ভাবে শত অভাব ও দৈন্যের মধ্যেও অবিচলিত চিত্তে তিনি বঙ্গবাণীর সেবা করিতেন,—এই রোজনাম্‌চাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

রজনীকান্ত আটমাসকাল খাতায় পেন্‌সিল দিয়া লিখিয়া তাঁহার সমস্ত মনোভাব, তাঁহার যাবতীয় বক্তব্য জানাইয়া গিয়াছেন। এই খাতাগুলিতে তাঁহার সে সময়ের সকল কথাই লিপিবদ্ধ আছে। সব খাতাগুলি পাওয়া যায় নাই, যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিরও সকল স্থান পাঠ করা যায় না। এই সকল খাতায় লিখিত বিবরণের বিভিন্ন বিষয় নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া "হাসপাতালের রোজনাম্‌চা" নামে মুদ্রিত হইল। ইহা ঠিক্ রোজনাম্‌চা বা 'ডায়েরী' নহে—কারণ সকল বিবরণ পর পর তারিখ হিসাবে লিখিত হয় নাই এবং লিখিবার উপায়ও ছিল না। এই রোজনাম্‌চা হইতে নানা অংশ বিষয়-বিভাগ করিয়া বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রজনীকান্তের হাসপাতালে রচিত বহু কবিতাও লিখিত আছে। তাহার কতকগুলি বিভিন্ন পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে, কতকগুলি মাসিক ও সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, আর অনেক গান ও কবিতা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে হাসপাতালে রচিত রজনীকান্তের কবিতা ও গানের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

১। রসালাপ

Allopathরা (ডাক্তারেরা) ছাঁদা ক'র্‌বার পর আমার গলার দড়ি খুলে দিয়ে বলেছে,—এখন দুনিয়ার মাঠে চ'রে খাও গে। *

* * *

না খেয়ে একদিন রাগ ক'রেছিলাম,—কেউ আর খেতে বলে না। সন্ধ্যার সময় নিজেই চেয়ে খেলাম। সেই দিন থেকে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে, রাগ কর্‌তে হয় তবে বেশ ক'রে খেয়ে নিয়ে রাগ কর্‌ব। আর মুস্কিল কিছু নাই।

* * *

তোমাদের মতন যদি আমার আগেকার মত Loud Logic (গলাবাজির ক্ষমতা) থাক্‌তো তবে তর্ক করতেম। তোমরা চট্‌ ক'রে ব'লে ফেল, উত্তর লিখ্‌তে আমার প্রাণান্ত। যখন না পারি তখন ভাবি,—

প'ড়েছি পাঠানের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

* * *

বাবার মত ছেলে বড় হয় না। Of course there are exceptions (অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।) একজন বল্‌লে যে, তোর বাপ মুখে মুখে কবিতা ক'রে কত পয়সা উপায় করে গে'ছে, আর তুই কি করিস্‌? ছেলেটা বল্‌লে,—ঐ বাবা যা কর্‌তো, আমি তাই করি; তবে কথা কি জানেন,—

---

* এখানে 'ছাঁদা' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক রিষ্টপ্রয়োগ। গরু দুহিবার সময়ে গরুর পিছনের পা দুইটি দড়ি দিয়া বাঁধাকে 'ছাঁদা' বলে।

আমার যে কবিতে করা
সাপের যেমন ছুঁচো ধরা,
নিতান্ত পৈতৃক ধারা
না রাখিলে রয় না।
আমার যে কবিতে ভাবা
সে কেবল মিছে ভাবা
যেমন করেছেন বাবা
তেমন আর হয় না।

* * *

পরিহাস-রসিক রসময় লাহাকে রজনীকান্ত বলিয়াছিলেন,—"ছাই ভস্ম" দিয়ে "অমৃত" নিয়ে যান। *

তারপর আর একদিন তিনি যখন তাঁহার প্রণীত "আরাম" পুস্তক রজনীকান্তকে উপহার দেন, তখন রজনীকান্ত বলিয়াছিলেন—আমার এই ব্যারামে 'আরাম' দিলে বেশ।

* * *

একদিন একজনার কথকতা শুনেছিলাম; সে বল্‌লে যখন সমুদ্র ডিঙাবার question (কথা) উঠলো, তখন রাম সকলকে ডাক্‌লেন। সকলেই বল্‌লে অত বড় লম্ফ যদি দিতে না পারি, সাগরশায়ী হয়ে যাব—পারবো না—কেবল একটা ছোট বানর বল্‌লে যে, আমার সে ভয় নাই, আমি লাফ দিলে তাক্ হারিয়ে শেষে লঙ্কার ওপিঠে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, সেইটে ভয়। তারপর হনুমান্ বল্‌লে আমি ঠিক লম্ফ

---

* রসময়বাবু তাঁহার প্রণীত "ছাই-ভস্ম" পুস্তক উপহার প্রদান করেন। ইহা এই উপহার প্রাপ্তির সময়ের উক্তি।

দেব। তাই ব'ল্‌ছিলাম যে, তোমরা করতে পার সব, কেবল There is a tendency of things being overdone like that little monkey. (সেই ক্ষুদ্র বানরটির মত কাজের সীমা লঙ্ঘন করিবার ঝোঁক।) হেম ত সত্যি সত্যি over-do (বাড়াবাড়ি) কর। রাত জাগ।

* * *

আমি যখন পড়ি তখন অরুণ ব'লে একটি ছেলের Private tutor (গৃহ-শিক্ষক) ছিলাম। সে একদিন বল্‌লে—মাষ্টার মশাই! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনার সাক্ষাতেই তামাকটা খাই। ওটা খেতে বার বার বাইরে যেতে হয়, পড়ার ব্যাঘাত হয়। আমি ত অবাক্। অরুণের বাড়ী শ্রীরামপুর।

তার (অরুণের) মামা Frst Arts (এফ-এ) দেবার সময় একটা diagram (অঙ্কের নক্‌সা) আঁক্‌তে না পেরে, একটা মানুষ—মাথায় টুপী, দুই হাতে দুইটা football (ফুটবল) লি'খে দিয়েছিল। একটা Guard (পরীক্ষা-পরিদর্শক) বল্‌লে, লিখ্‌ছ না কেন, ছবি দাগ্‌ছ কেন? সে বল্‌লে,—লিখ্‌তে পার্‌লে কি আর ছবি দাগি?

Guard (পরিদর্শক)—তবে কাগজ দিয়ে উঠে যাও।

সে—এত শীগ গির যেতে লজ্জা কর্‌ছে।

Guard (পরিদর্শক)—তবে পাশের wingএ (বারান্দায়) গিয়ে ব'স।

সে—যদি এক ছিলিম তামাক পাই।

ও তারই ভাগ্‌নে।

* * *

একজন ব'ল্লে—দেখেছিলাম ব'লে জাত বেঁচে গেছে। কালীঘাটে

একটা লোক চা'র পয়সা দিয়ে একটা মেটে গেলাসের এক গেলাস মদ খেলে। সে লোকটা মুসলমান। গেলাসটার যে ধারে মুখ দিয়ে খেলে—দেখে রাখলাম। সে চলে গেলে আমি গেলাসটা ফিরিয়ে ধরে এক গেলাস খেলাম। দেখেছিলাম ব'লে জাতটা বেঁচেছে।

* * *

আপনারা কি পড়্ছেন? আমি প্রথম ভাবতাম—চড়ক বুঝি; তারপর বইতে দেখি "চরক"। ভারি শক্ত নাকি?

* * *

Average man (সাধারণ লোক) কি রকম খাইয়ে অর্থাৎ বৃকোদরও কেউ নেই, 'ত্রৈলঙ্গ' স্বামীও (অনাহারী) কেউ নেই।

* * *

সৎপথে থেকে ওকালতি করা বড় কঠিন হ'য়েছে। টাকার লোভ এতো হবে যে, সত্যাসত্য বিচার-ক্ষমতা blunt (ভোতা) হ'য়ে heart callous (হৃদয় অসাড়) হবে, তখন টাকা হ'তে পারে, অর্থ হবে, তবে তার পায়ে পরমার্থটি রেখে হবে। ইতি মে মতিঃ।

* * *

একটা রাখাল দু'টো গরু নিয়ে যাচ্ছিল—তার একটা খুব মোটা, আর একটা খুব রোগা। একজন উকীল সেই পথে যান। তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোর ও গরুটা অত মোটা কেন, আর এটা এত হাল্কা কেন? এটাকে খেতে দিস্নে না কি?" রাখাল উকীলকে চিন্ত; ব'ল্লে—"আজ্ঞে না। মোটাটা উকীল, আর রোগাটা মক্কেল,—রাগ করবেন না।"

মোমবাত্তি কি purgative (জোলাপ) ? মোমবাত্তি নইলে বাহ্যে হয় না ! *

* * *

আমি আমার রাজসাহীর অট্টালিকা ছেড়ে যখন কুঁড়ে ঘরে এসেছি তখন শরীর তো ভাল থাকার কথাই নয়। এটা cottage (কটেজ— কুঁড়ে) কিনা ?

* * *

আমি অত দুর্ব্বল হই নি যে, দুই পা হাঁটতে heart (হৃৎপিণ্ড) বেশি quickly beat (তাড়াতাড়ি ধক্ ধক্) করবে। সে নবীন যুবকদের, আর যা'দের বে' হয় নি। আমাদের spirit stagnant (তেজ হীন) হ'য়েছে। Excitement (উত্তেজনা) নাই। তোমাদের যদি কেউ liar বলে, তার মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত পান কর ; আমাদের বললে, আমরা বলি—"নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।" ঠিক তাই। সেইজন্য বলি, তোমাদের exciting cells (উত্তেজক কোষ সমূহ) খুব sensitive (ক্রিয়াশীল) ।

* * *

ওরা যখন গা ফুড়ে, কি অস্ত্র করে, তখন মনে করে আমরা বুঝি জড়-পদার্থ। কিন্তু যখন visit (ভিজিট্) নেয় তখন আমরা প্রাণী।

* * *

একখানি পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের লেখকদিগের মাসিক পত্রিকা বেরুচ্ছে, শুনেছেন ? তাতে আপনারা কলকে পাবেন না। তাহা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া পূর্ব্ব, উত্তর, ঈশান, নৈঋত সমস্ত বঙ্গের লেখকেরা লিখবেন। বাদ এই—পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ। অর্থাৎ বাঙ্গাল্‌রা ভারি

* হাসপাতালে রজনীকান্তকে রাত্রিতে বাতি লইয়া বাহ্যে করিতে যাইতে হইত।

চ'টে গেছে আপনাদের উপর। কোন্ বইতে ভাষার বিভ্রাটে দু'একটা বাঙ্গালে কথা বেরিয়েছিল, এরূপ প্রবাদ; তারি সমালোচনায় বাঙ্গাল্ ব'লে ঠাট্টা করাতেই এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হচ্ছে। আর তোমাগো পত্রিকায় লিখুম না।

কি ব'লব পত্রিকা বেরোবার আগেই ম'লাম। নইলে বাঙ্গালের চোট দেখিয়ে দিতাম। তা কি ক'রব, ভবতারণ ডেকে নিলেন, যে রকম হলদে হ'য়ে উঠ্‌ছি।

* * *

Injection (ইন্‌জেক্‌সন) দিতে চায় না। আরে পাগল, আমার মাস খানেক থেকে ঐ হচ্ছে, আমার কি একটা মৌতাত হয় না নাকি? সেই মৌতাতী মানুষের আফিমটুকু কেড়ে নিয়ে সর্ব্বনাশ করতে চাও? দোহাই বাবা, মেরো না বাবা, এটুকু যদি নাও তবে প্রাণটা নাও।

এত যদি ছিল মনে বাঁশরী বাজালে কেনে? বাবা! এখন যে কদমতলা ব'লে প্রাণ যায়, তা নিবারণ কে করে বাবা? যখন প্রথম বাঁশী বাজিয়েছিলে তখন ভাবিতে উচিত ছিল। এই আফিমখোরের প্রাণটুকু নিয়ে কি হবে বাবা!

* * *

একজন এক কবিতার বই ছাপ্‌তে দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল—

"পড়ে বজ্র, হানে পিচ, বহে প্রভঞ্জন।"

Pressএর (ছাপাখানার) proprietor (স্বত্বাধিকারী) ব'ল্লে, আর সব তো বুঝলাম, 'হানে পিচ' টা কি মশাই? Author (গ্রন্থকার) বল্লে, অমরকোষ পড়েন নি? ওটা বিদ্যুতের নাম। পিচ—বিদ্যুৎ।

Proprietor (স্বত্বাধিকারী) ব'ল্‌লে, অমরকোষের কোথায় আছে "পিচ" মানে বিদ্যুৎ? Author (গ্রন্থকার) ব'ল্‌লে—

"তড়িৎ সৌদামিনী বিদ্যুৎ চঞ্চলা চপলাপিচ।"

এই রকম গল্প আমি এক মাস শোনাতে পার্‌তাম।—এত সংগ্রহ ক'রেছিলাম।

* * *

এক পেয়াদা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে—সমনজারির, "একান্নবর্ত্তী পরিবার কাহাকেও না পাইয়া—লট্‌কাইয়া জারি করিলাম।" কিন্তু একান্নবর্ত্তীটা লিখ্‌ছে—"৫১বর্ত্তি।"

সত্য ঘটনা

সাহাজাদপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এক ছেলে সাহিত্যের উত্তরের কাগজে লিখেছিল,—

"এমন সহজ প্রশ্ন কভু দেখি নাই।
কিন্তু আমি হতভাগা কিছু লিখি নাই॥"

আমি যে কত রকম দেখেছি, তা বল্‌লে শেষ হয় না।

* * *

X-Ray কেন জান? X is an unknown quantity.

* * *

শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী যখন ম'রে গেল, তখন তার এক মুসলমান-বন্ধু শ্রীশবাবুর ছেলেকে লিখ্‌ল যে, "বন্ধু "শ"চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুতে বড় ব্যথিত হ'য়েছি।"

২। নিজের ক্ষুদ্রত্ব-জ্ঞান

সূর্য্যটা কত বড় জান? এই পৃথিবীর মত ১৪ লক্ষ পৃথিবী একত্র করলে যত বড় একটা জিনিস হয়, অত বড় একটা জিনিস। ১৩ লক্ষ ৩১ হাজার পৃথিবী একত্র করলে যত বড় হয়, তত বড়। ৯২ কোটি ৭০ হাজার মাইল অর্থাৎ প্রায় ৯৩ কোটি মাইল পৃথিবী থেকে দূরে। ঐ লেজটা কত বড় জান? প্রায় ১৪ লক্ষ মাইল লম্বা। ওটার নাম 'হেলির' ধূমকেতু। ৭০ বৎসর পর পর একবার ক'রে দেখা যায়। এটার বেগ এক মিনিটে ৬২ হাজার মাইল। সকল স্থান থেকেই দেখা যাচ্ছে।

ছায়াপথের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি অসংখ্য তারা অনেক দূরে আছে। অসীম শূন্যে আছে, স্থানের অভাব কি? 'লীরা' নামে একটা তারা আছে; এত দূরে থাকে ব'লে একটা তারা বোধ হ'ত, কিন্তু দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখা গেল যে, সেটা অনেকগুলি তারার সমষ্টি। এই ছবির মত।

চাঁদের মধ্যে যে সব পাহাড় আছে, তার এক একটা প্রায় ৬ মাইল উঁচু। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু ওর পাহাড়গুলো পৃথিবীর পাহাড়ের চেয়ে ঢের বড়। দূরবীণ দিয়ে চাঁদকে বেশ ক'রে দেখা গেছে, প্রাণী নাই,—বাতাস নাই, তেজ নাই। প্রাণহীন, কেবল পাহাড়। আর কিছু নাই। নদী নাই, ঝরণা নাই, সমুদ্র নাই, গাছ নাই। পাহাড়গুলো কত উঁচু তা পর্য্যন্ত মাপা গেছে। সর্ব্বোচ্চটা ৬ মাইল, অর্থাৎ তিন ক্রোশ উঁচু।

১৩ লক্ষ ৩১ হাজার পৃথিবী একত্র করলে যা হয়, সূর্য্যটা তাই। আছে প্রায় ৯৩ কোটি মাইল দূরে। তাই যখন ভাবি তখন আমাকে এত ক্ষুদ্র মনে হয় যে, নিজকে হাতড়ে পাইনে, বেদনাও থাকে না।

যে কমেট্‌টা উঠ্‌ছে, তার লেজটা ১৪ লক্ষ মাইল লম্বা। ৭০ বৎসরে একবার দেখা যায়।

আমি শ্রীরজনীকান্ত সেন বি এল্ এখানে ব'সে কত গর্ব্বই না কর্‌ছি, কত অভিমানই না কর্‌ছি। কত রাগ, কত ক্রোধ, কত কাণ্ড কর্‌ছি—মনে হ'লে লজ্জা হয় না?

* * *

আমি আবার এ দেশে মানুষ নাকি? এই সকল intelligent giantদের (মনীষিগণ) মধ্যে আমি কোন নগণ্য ব্যক্তি!

* * *

আমার ছবি আর সংক্ষিপ্ত একটু জীবনী যে দেওয়া হ'য়েছে—'সুপ্রভাতে' দেখে একটু তুষ্ট হ'লাম। কিন্তু আমি কি ওর উপযুক্ত?

* * *

যে টান্‌লে সমস্ত জড়-জগতের টান ব্যর্থ হয়, সেই টেনেছে, বুঝ্‌ছো না? আচ্ছা তা নাই বা হ'ল, কেনই বা রাখ্‌তে চাও? এ কীটকে দিয়ে কি হবে?

* * *

এই আমার মানুষের কাছে নত হবার সময় যায়। আর এই আমার প্রাণের ভগবান্ সমস্ত রাত্রি শিখিয়েছেন।

* * *

আমি তো একটা কীটানুকীট। আমার আবার position (মান-মর্য্যাদা) কই? আমার মত কাঙ্গাল, অধম, পাপীকে যা দিলে ঠিক উপযুক্ত হয়, তাই আমাকে দিন।

* * *

যে দেশে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, সেখানে আবার আমরা কে?

আপনাদের প্রতিভাতেই দেশ উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, এদেশে আবার আমরা কে? এখানে আমরা কোথায় লাগি?

* * *

দেশের এই শত শত প্রতিভা-মার্ত্তণ্ডের মধ্যে আমি কোন্ জোনাকী?

* * *

আমাকে খামকা উঁচু কর্‌বেন না। আমি বড় দীনহীন, বড় কাঙ্গাল।

* * *

আজ রবি ঠাকুর আমাকে বড় অনুগ্রহ করে গেছেন। আমাকে তিনি বল্‌লেন,—"আপনাকে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা করে।"—শুনে আমি লজ্জায় মরি।

* * *

আপনারাই মানুষ, মায়ের কাজ কর্‌ছেন; আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌লাম না। দেখুন, বেশ-ভূষায় বড় করে না, বড় যাতে করে তা দেখ্‌লেই লোকের মাথা তার কাছে নত হ'য়ে পড়ে।

আমাকে দেখে যান, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমার যাবার সময় অকারণ আমার মান বাড়াবেন না।

৩। পরিবারবর্গের প্রতি

তা ভগবান্ আছেন। নইলে কি আজ আর আমাকে জীবিত দেখ্‌তে, না কথা কইতে? না হাতে শাঁখা থাক্‌তো? দীন, মলিন বেশে রাজসাহী গিয়ে উপবাস কর্‌তে হ'তো না? তোমার কি আর এই শ্রী থাক্‌তো? তাই বলি ভগবান্ আছেন। তিনিই এই ৬।৭ মাস কাল চালালেন—কেমন আশ্চর্য্য রকমে চালালেন তা তো দেখ্‌লে?

তবে আর চিন্তা কি? আমাদের ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন। ভার দাও।

*　　*　　*

বড় পিপাসা, জান রে বাবা, এই ত দেহের পরিণাম। বাবা আমার, কাছে এসে ব'স।

*　　*　　*

এবার বাবা তারকেশ্বর তোমার মুখ রাখ্‌লেন। বাবার দয়ায় তোমার মুখ থাক্‌ল। এবেলা ভালই বোধ হচ্ছে। তোমার চরণের ধূলোয় ভাল লাগছে।

*　　*　　*

ঐ একখানা সম্পত্তি ক'রে থুয়ে গেলাম।—বাজারের পয়সা নাই—দু'খান বেচে বার আনা দিয়ে বাজার কর। এই 'অমৃত' আর 'আনন্দময়ী' তোমার বাজারের পয়সা হীরা রে!

*　　*　　*

আমার কাছ ছাড়া হ'য়ে থেক না। তোমাকে মিনতি কর্‌ছি, আমি যে ব'সে থাক্‌তে পারি না।

*　　*　　*

আজ কত পিপাসা যে সংবরণ করেছি হিরণ, তবু কেউ জল দেয় নি। পিপাসার আর শেষ নেই। যে কষ্ট রাত্রিতে গিয়েছে, তা আর লিখে কি কর্‌ব? তারপর তোমার দীর্ঘ অদর্শন। না দেখ্‌লে প্রাণটা আমার অস্থির করে, ফাঁপর করে। মনে হয় ম'লাম বুঝি।

*　　*　　*

আর তো হ'ল না হিরণ! আমাকে ছেড়ে থেকো না। অন্ধকার হ'য়ে আসে। মাছ-টাছ সব রেখে এস। আর কিছু চাই না। দেখ,

ও ত আর মা আমাকে খেতে দিল না। একটু জল দাও ত, দেখি অন্তঃকরণ হয় কি না ?

* * *

দিদি, যাবেন না। আমার রাত আজ আর যেতে চায় না। আপনার পায়ে পড়ি, দিদি।

* * *

দেখ, হিরণ! আমার শ্রাদ্ধে বেশি খরচ ক'র না। কিন্তু যেমন পিপাসা তেমনি খুব জল দিও। আম উৎসর্গ করিও। জল দিতে কৃপণতা ক'র না। বড় পিপাসায় ম'লাম, জল দিও। বুদ্ধি যে দেহাত্মিকা তা ঠিক বুঝ্‌লাম না। কি জানি যদি আমার দয়াল বলে যে হ্যাঁ, এ অধম সেটা বুঝে ছিল, তবুও জল দিও। তিনি যদি আমাকে জল দেন—জল খাব। নইলে আর নয়। আর দেখ, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই সব রাজাদের কাছে লিখো যে, দশ দিনে শ্রাদ্ধ হবে—এক্ষণে কিছু বেশি টাকা নেওয়া উচিত নয়। কারণ রাজারা বল্‌বে,—আবার এই অনাথ পরিবারকে এখনি সাহায্য কর্‌তে হবে ? যা হয়, সুরেশ প্রভৃতি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখো।

* * *

হিরু রে, আমরা খেতে যে পাচ্ছি এ ত পরম সৌভাগ্য। তখন কেঁদেছিলি রে,আমার মনে আছে।

* * *

হিরণ, আমার প্রাণ বড় অস্থির হবে তুমি নিজে বলো, "হরিবোল"—হরিনাম আমার কাণে যত দিতে পার। আমার মুখ বন্ধ হ'য়েছে—কাণ বন্ধ হয় নি।

ভয় কি হিরণ! মার কাছে যাই, সকলে গেছে। দেখি সে কেমন দেশ। মার কোল কেমন নির্ম্মল, কেমন শীতল দেখে নি।

* * *

আমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে, তোরা সব বস্—আমার কাছে। মা রে!

* * *

হীরা, বড় কষ্ট দিয়েছি, মাপ কর আমার যাবার সময় সত্যি আমাকে মাপ কর।

* * *

যে দিচ্ছে বরাবর সেই দিবে, ভাব কেন? সেই কষ্ট যদি থাকে, তবে তা কি ভাব্‌লে খণ্ডিবে, হিরণ্ময়ি! তাও যে তাঁরি প্রেরিত, তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তবে কি তুমি ভাব্‌লে খণ্ডে যাবে? তোমার ভুল। সেখানে তোমার মস্ত ভুল! তা ত হবেই না। যা হবার নয়, তা ভেবে কষ্ট পাও। তা ভেব না। আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এল। আমার অনুভবটা অন্যের অনুভবের চেয়ে একটু প্রবল। তবে যেটা খুব বেশি সম্ভব সেইটে বল্‌তে পারি,—বেদ-বেদান্ত বলা যায় না।

* * *

যাদবকে বল্‌বেন, আমি তাকে কুটুম্ব ক'রে তার উদার চরিত্রের গুণে বড় সুখী হয়েছি। যাদব আর তার স্ত্রী আমাকে আশা দিয়ে যে সব পত্র লেখে, তা পড়্‌লে আমার ম'রতে ইচ্ছে করে না। যাদবকে বল্‌বেন, সে আমাকে কুটুম্ব ক'রে তার কোনো সুখ হয় নি, কিন্তু আমার বড় উপকার, বড় সুখ হ'য়েছে।

* * *

ধীরে পথ কর্‌ছে হিরণ, তুমি পদে পদে তাঁর হাত দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

আগা-গোড়া খাবার সংস্থান একজনকে দিয়ে করাল'। দেখ, আবার কা'কে দিয়ে কেমন ক'রে কোন্ পথ করে। তাঁর নামের জয় হোক্।

৪। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ

মানুষে আমার জন্য এত করছে। তাঁরি মানুষ, সুতরাং তাঁরি প্রেরণায়।

* * *

দেখুন, আমাদের দেশের বিদ্যোৎসাহীরা আমাকে কি চক্ষে দেখেন। এমন নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাবর্জ্জিত যশঃ বাঙ্গালার কোন্ কবি পেয়েছে?

* * *

কোন্ দেশের একটা বাঙ্গাল্ কবি, তাও এখন কাঙ্গাল হয়েছে। আপনার গৌরব বাড়ুক না বাড়ুক্ আমার বাড়্বে।

* * *

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর জন্য কি চেষ্টা যে, বাঙ্গালা দেশ করছে তা আর ব'লে শেষ করা যায় না। বিলাত থেকে আমার জন্য রেডিয়াম্ নিয়ে এসে চিকিৎসার চেষ্টা হচ্ছে। তাতে ঢের টাকা লাগ্বে। তবু চাঁদা ক'রে তুলে রেডিয়াম্ এনে আমাকে বাঁচাবে।—সে তিন চারি হাজার টাকার কাজ।

* * *

বঙ্গে একটা নূতন প্রাণ এসেছে। বিশ্বাস যদি না হয় তবে একটু পীড়িতের ভাণ ক'রে সাতদিন পরে advertisement (বিজ্ঞাপন) দেন্ ত!

* * *

আমাকে দেশশুদ্ধ লোকে কেমন ক'রে যে ভালবাস্লে, তা ব'ল্তে পারি না। আমার মলিন প্রতিভাটুকুর কত যে আদর করলে!

আমার এই ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ প্রতিভাটুকুর যে আদর আপনারা করলেন, আমি তার উপযুক্ত ত নই।

* * *

বঙ্গদেশ আমাকে ছেলের মত কোলে ক'রে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ ক'রেছে, সেইজন্য আমি ধন্য মনে করে ম'লাম।

* * *

আমি একটু বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেছিলাম ব'লে বাঙ্গালা দেশ আমার যা করলে তা unique in the annals of Bengali Literature. (বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে নূতন।) এই সাহিত্য-প্রিয় বাঙ্গালা দেশ, মানে—Literature loving section of Bengalis bearing the major portion of my expenses. Is it not unprecedented in a poor country like mine? (বাঙ্গালার সাহিত্য-প্রিয় জনগণ আমার অধিকাংশ ব্যয়-ভার বহন করিতেছেন—আমার এই গরীব দেশের পক্ষে ইহা অভূতপূর্ব্ব নয় কি?) তা নইলে আমার সাধ্য কি নীরোদ, যে আমি এই দীর্ঘকাল এই heavy expense bear (এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন) করি? One and all—names are secret. They do not wish to add force to favour and are averse to advertisements. (কেউ বাদ নাই, তবে তাঁহাদের নাম বলিবার উপায় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর আর জোর দিতে চাহেন না—নাম জাহির করিতে রাজি নহেন।)

* * *

বরিশাল থেকে যে যা যেখানে পাচ্ছে আমাকে পাঠাচ্ছে। ধন্য বরিশাল। দু'টাকা পাঁচ টাকা—যার যেমন ক্ষমতা সেই দিচ্ছে।

আমার গুণটা কি? আমি দেশের কি ক'রেছি? দেশ আমাকে বড় ভালবেসেছে, বড় সাহায্য ক'রেছে; আমি দেশের তেমন কিছুই ক'রতে পারি নি।

* * *

লোকে কি সম্মান, কি সাহায্য আমার কর্‌ছে। আমি প'ড়ে থেকেও কেবল লেখাপড়ার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে না। মূর্খ হ'লে কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তো? এই পরিবার এই বৎসরাবধি প্রতিপালন হচ্ছে কেবল লেখাপড়ার জোরে। ভদ্রলোকের মধ্যে বসা যাক্ বা না যাক্, প'ড়ে থেকেও খালি লেখাপড়ার জোরে এই বৃহৎ পরিবারের মুখে গ্রাস উঠ্‌ছে!

* * *

সত্য সত্যই শরৎকুমার, অশ্বিনী দত্ত, পি সি রায়, নাটোরের মহারাজা, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি আমাকে যে ভাবে সাহায্য কর্‌ছেন ও যে ভাবে আশা দিয়ে পত্র লিখ্‌ছেন, আমি শুধু উকিল হ'লে, আমাকে এতখানি অযাচিত সম্মান কর্‌তেন কি না সন্দেহ।

* * *

আর দেখ্‌বেন কি? আমার স্ত্রীর যেন বৈধব্যের সম্ভাবনা হ'য়েছে,—অশ্বিনী দত্ত, পি সি রায়, কাশিমবাজার, দীঘাপতিয়া—এঁদের তো সে রকম দুঃখ হ'বার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবু তাঁরা আমার জন্য কাঁদেন। ধন্য বঙ্গদেশ! ধন্য সাহিত্যসেবার গুণগ্রাহিতা!

* * *

আমার মনে হয়, আমাকে এই বিদ্বন্মণ্ডলী, সাহিত্যানুরাগী বঙ্গসমাজ যেমনটা দেখালে তা unique in the history of Bengali Literature. (বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে নূতন।) তোমরা তো সব খবর

জান না। তাঁরা এই দুঃসময়ে আমাকে শুধু মুখের ভালবাসা দেন্ নি—substantial·help (প্রধান সাহায্য) দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* * *

আমার একটুখানি প্রতিভা-কণিকার আদর যা বঙ্গদেশ করলে, তা unprecedented. (অভূতপূর্ব্ব)। আমি দীর্ঘকাল পীড়িত হ'য়ে যখন অর্থহীন হ'লাম, তখন আমাকে ধনী সাহিত্যানুরাগীরা বুকে তুলে নিয়ে আমাকে প্রতিপালন করছে।

* * *

আমার এত সৌভাগ্য,—আমার ব্যারাম না হ'লে বুঝ্তে পারতাম না। কোন্ পুণ্যে এই অসুখ হ'য়েছিল!

* * *

আমাকে সবাই ভালবাসে, এমন সৌভাগ্য ক'জন কবির হয়। কেউ আমার শত্রু নাই। স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড় ভালবেসেছে। আমি তাদের কি দিতে পারি?

৫। আত্মজীবনীর ভূমিকা

(বন্ধুবর্গের বিশেষ আগ্রহে ও প্রার্থনায় রজনীকান্ত ৪ঠা শ্রাবণ হইতে আত্মজীবন-চরিত বা "আমার জীবন" লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার ভূমিকা বা "নিবেদন" এবং "জন্ম ও বংশপরিচয়" নামক প্রথম পরিচ্ছেদটি লিখিবার পর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়, কাজেই লেখা আর অগ্রসর হয় নাই। "জন্ম ও বংশপরিচয়ের" অধিকাংশ তথ্যই "পিতৃকুল ও মাতৃকুল" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং সেই অংশ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। কেবল তাঁহার লিখিত "নিবেদন" আত্যন্ত উদ্ধৃত হইল। ইহা

হইতে রজনীকান্তের তাৎকালীন ঈশ্বর-নির্ভরতা, পরোপকারী হিতৈষিগণ-প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে আকুলতা,তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস, তাঁহার বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার ধারা ও পদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয় অনায়াসে বোধগম্য হয়। নিবেদনের প্রারম্ভে শ্রীহরির নাম লেখা এবং শেষে সিদ্ধিদাতার নাম স্মরণ—এই দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আর "কৈফিয়তের 'পুনশ্চ'" শব্দটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। আত্মজীবনীর নিবেদন লিখিতে গিয়াও পরিহাসপ্রিয় কবি পরিহাসের ভাষা ছাড়িতে পারেন নাই।)

"আমার জীবন"

শ্রীশ্রীহরি

নিবেদন

আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহ যে, আমার জীবনের ঘটনাবলী আমি নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া যাই। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, যে ব্যক্তি কবিতা লিখিতে পারে, তাহার জীবনে একটু বৈচিত্র্য, একটু অসামান্যতা, নিতান্ত পক্ষে সাধারণের শিক্ষণীয় কিছু বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা সেই জীবনের ঘটনাসমূহ মনোজ্ঞ, চিত্তাকর্ষক ও জন-সমাজের হিতকর হইতে পারে। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিমত অন্য প্রকার হইলেও আমি এই ক্ষুদ্র অবতরণিকায় তাঁহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি রাখি না। তর্ক করিবার সময় আমার নাই।

প্রশ্ন এই যে, তবে এই নিষ্ফল, ব্যর্থ, নগণ্য জীবনী লিপিবদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন? স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার জীবনীর প্রারম্ভে অতি গম্ভীরভাবে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাহার বিস্তৃত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের

ঘটনাবলী এক বিরাট্ ব্যাপার। সুতরাং তাঁহার কৈফিয়ৎও তদনুরূপ বিস্তৃত। আমার জীবন ক্ষুদ্র, বৈচিত্র্যহীন, নীরস, সুতরাং আমার কৈফিয়ৎ সংক্ষিপ্ত ও সরল।

আমার প্রথম জীবনে উল্লেখযোগ্য ও লোকশিক্ষার অনুকূল ঘটনা অতি বিরল। কিন্তু জীবনের শেষাংশের ভূয়োদর্শন সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে। আমি উৎকট রোগশয্যায় শায়িত। এই অবস্থায় আমি যে সকল মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, এবং এই জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, সম্পূর্ণরূপে অশরণ ও অনন্যগতি হইয়া মঙ্গলময়ের চরণে একান্ত আশ্রয় লইয়া, যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাইয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিলে, সাধারণ জন-সমাজের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে,—এই বিবেচনায় এই বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। এই আমার ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ। আমার মনে হয়, আমি ক্রমেই লোকনিন্দা বা প্রশংসার রাজ্য হইতে অপসৃত হইতেছি; অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনায় আর আমার উপকার বা অপকার, লাভ বা ক্ষতি, প্রসাদ বা বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, আমার এই দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র ক্লেশদায়ক পীড়ার অবস্থা এবং আমার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যে সকল পরদুঃখ-কাতর, মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আমার চিকিৎসার আনুকূল্য করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, এবং এই নাতিক্ষুদ্র বিপদ-সাগরে পতিত অনাথ পরিবারের ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার একান্ত সরল কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের এই উপযুক্ত অবসর। এটি আমার কৈফিয়তের "পুনশ্চ।"

আর একটি কথা না লিখিলে, এই ক্ষুদ্র নিবেদন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমার ডায়েরী নাই; আমি কোনও স্থানে আমার জীবনের কোনও ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করি নাই; সুতরাং স্মৃতিশক্তিটাকে মারিয়া পিটিয়া তাহার উদর-গহ্বর হইতে আমার 'অতীত' যতটুকু বাহির করিতে পারিলাম, তাহাই লিখিয়া রাখিলাম। ইহাতে মস্তিষ্কের প্রতি একটু নিষ্ঠুর পীড়ন করিতে হইল বটে, কিন্তু কি করিব! এক-দিকে বান্ধবদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অপরদিকে কঠোর কর্ত্তব্যবোধ।

ডায়েরী না থাকায়, আমার জীবনীর অনেক স্থানে অসম্পূর্ণতা, অঙ্গহীনতা ও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু এই অকিঞ্চিৎ-কর জীবনে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যাহার সন বা তারিখ না পাইলে, পাঠকগণের মনে কোনও অভাববোধের সঞ্চার হইতে পারে। এ জীবনে কোনও পাণিপথের যুদ্ধ বা চৈতন্যদেবের গৃহ-ত্যাগের মত বিশিষ্ট ঘটনার সমাবেশ হয় নাই, যাহাতে জনমণ্ডলী স্তম্ভিত ও চকিত হইয়া মুগ্ধচিত্তে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতে পারে; অথবা কোনও জীবনী-সংগ্রাহক কোনও আখ্যানাংশ-বিশেষের সময় বা স্থান নির্দ্ধারণের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র বা উৎসুক হইতে পারেন। সুতরাং আমার ব্যাধিক্ষীণা ও বেত্রাঘাতপীড়িতা, বলহীনা, স্মৃতিশক্তিটুকু যদি কোনও স্থানে একটু আধটু কর্ত্তব্য-স্খলনের পরিচয় প্রদান করে, তাহাতে পাঠকবর্গের মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ থাকিবে না।

প্রথমে যখন 'নিবেদন' বলিয়া স্বস্তিবাচন করিয়াছি, আর এই কৈফিয়ৎটি ক্ষুদ্রকলেবর হইবে বলিয়া পাঠকগণকে আশ্বাস দিয়াছি, তখন 'ইতি' দেওয়াই কর্ত্তব্য। সিদ্ধিদাতার নাম স্মরণ করিয়া এই ঘোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, শেষ করিয়া যাইতে পারিব

কি না, তাহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছায় যদি লেখনী-সঞ্চালনের দৈহিক শক্তি ও ঘটনাগুলি যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিবার মানসিক ক্ষমতা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়, তবে সফল-কাম হইব, নচেৎ মনের বাসনা মনেই রহিয়া যাইবে। ইতি—

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,
কটেজ নং ১২,
কলিকাতা। } শ্রীরজনীকান্ত সেন গুপ্তস্য

৬। আনন্দময়ীর ভূমিকা

বিশাল হিমালয়পর্ব্বতের কোনও অধীশ্বর কোনও কালে বর্ত্তমান ছিলেন কি না, এবং তাঁহার গৃহে শক্তিরূপা ভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া লীলা করিয়াছেন কি না, এ সকল কূট প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াও এ কথা নির্ব্বিরোধে ও অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় কল্পনাকুশল প্রদেশ পৃথিবীতে আর নাই। এমন সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বর কল্পনাক্ষেত্র অন্যত্র কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সর্ব্ববিষয়ে ভারতীয়েরা উজ্জ্বল আদর্শ-কল্পনার সৃষ্টি করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণোক্ত আখ্যায়িকাবলীর প্রতিপাদ্য বস্তুতে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত-সম্প্রদায় আস্থা-স্থাপন করিতে না পারিলেও, একথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ধর্ম্মরাজ্যে ঐ সকল কল্পনার প্রয়োজন ছিল, এবং ঐ সকল কল্পনার দ্বারা মানবসমাজের বহুবিধ মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে গোপবংশে আবির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনে যথাবর্ণিত মধুর লীলা করিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ে নব্য যুবক সন্দিহান; কিন্তু কৃষ্ণলীলার কীর্ত্তন-শ্রবণে

এ পর্য্যন্ত কত পাষাণচিত্ত দ্রব হইয়া ভগবদুন্মুখ হইয়াছে, কত দুষ্কৃতের সৎপথে গতি হইয়াছে, কত অপ্রেমিক প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাই বলিতেছিলাম, কল্পনানিপুণ ভারতবর্ষে পৌরাণিক আখ্যায়িকা-বিশেষকে কল্পনা বলিয়া স্বীকার করিলেও, জনসমাজে তাহার মহোপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। কৈলাস হইতে জগজ্জননীর হিমালয়ে আগমন, দিন-ত্রয় পিতৃগৃহে অবস্থান, এবং বিজয়ার দিবস সমস্ত হিমালয়বাসীকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন,—এই আখ্যায়িকা কল্পনা হইলেও মহা-কবিগণের সুনিপুণ তুলিকা-রঞ্জিত হইয়া, এমন উজ্জ্বল চিত্তোন্মাদক কাব্যসৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছে যে, তাহা ভারত ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় কি না, সন্দেহ।

ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহাকে সন্তানজ্ঞানে তাঁহার সহিত তথাবদ্ব্যবহার, ভারতবাসী ব্যতীত অন্য জাতি কল্পনাচ্ছলেও নিজ মস্তিষ্কে কোনও কালে স্থান দিয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। তবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, মানসিক সমস্ত বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও চরিতার্থতা ভগবানেই সম্ভব হয়; কারণ তিনি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ ও নির্দ্দোষ আদর্শ। যশোদার গোপাল প্রভাস-যজ্ঞে পিতামাতার চক্ষে যে গলদশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, মেনকার উমা প্রতিবর্ষে শারদীয়া শুক্লা দশমীর প্রভাতে মাতৃনয়নে সেই উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়া কৈলাসে গমন করেন। উভয় দৃশ্যই মাতৃহৃদয়ের কোমল বাৎসল্যে ও অক্ষুণ্ণ স্নেহ-প্রবণতায় এমন করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে, 'প্রভাস' ও 'বিজয়া'র, অসম্পূর্ণ, সদোষ, পার্থিব অভিনয় দর্শন করিয়াও অবিশ্বাসী, পাষাণ-হৃদয় অশ্রুসম্বরণ করিতে সমর্থ হয় না।

জগজ্জননীর পিতৃগৃহে আবির্ভাব 'আগমনী', এবং কৈলাসাভিমুখে

তিরোধান, 'বিজয়া' নামে অভিহিত। এই ক্ষুদ্র সঙ্গীত-পুস্তকের আন্তাংশ 'আগমনী' ও শেষাংশ 'বিজয়া'। পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"

"যাহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি।" সুতরাং সম্যক্ ও যথাবিধ একাগ্র-সাধনায় যে ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো *ভক্তের ঠাকুর, যে তাঁহাকে যে ভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই* তাহাকে দর্শন দেন; এ কথা সত্য না হইলে যে তাঁহার করুণাময়ত্বে, তাঁহার ভক্তবৎসলতায় কলঙ্ক হয়। ধর্ম্মজীবন ভারতবর্ষ চিরদিন এই ধারণায় কর্ম্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও অকুতোভয়।

উৎকট-রোগ-শয্যায়, দুর্ব্বল হস্তে এই সঙ্গীতগুলি লিখিয়াছি। আর কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও, ইহাতে জগদম্বার নাম আছে, মনে করিয়া, পাঠক অনাদর করিবেন না, এই বিনীত প্রার্থনা।

৭। উইলের খস্‌ড়া

আমি উইল ক'র্‌ব। আমার দরকার আছে। ছেলের মধ্যে নাবালক আছে। কোনও দরকার হ'লে একটি পয়সা খরচ কর্‌তে পার্‌বে না। আমাকে কাগজ এনে দাও। সংক্ষেপে ক'র্‌ব। সমস্ত সম্পত্তির দান-বিক্রয়াদি সর্ব্বপ্রকার হস্তান্তর কর্‌বার ও সর্ব্বপ্রকার সাময়িক ও কায়েমী ও অধীন বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা দিয়ে আমার স্ত্রীকে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব লিখে দেব। আর ব'ল্‌ব যে, আমার যে সকল দেনা আছে তাহা তিনি ঐ ক্ষমতায় যেরূপে সুবিধা বোধ করেন শোধ করিবেন। জজ্ সাহেবের অনুমতি লাগিবে না। কোনও ক্রেতা বা বন্দোবস্ত-গ্রহীতা দ্বিধা না করে। আমার স্ত্রীকে Universal

legatee (সাধারণ স্বত্বাধিকারিণী)-স্বরূপ এই উইলের executrix (রক্ষণাবেক্ষণকারিণী) নিযুক্ত ক'রলাম। তিনি প্রোবেট লইয়া দেনা-শোধের বন্দোবস্ত করিবেন এবং কন্যাগণের বিবাহের জন্য যে কোনও সম্পত্তি বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন। আমার বৃদ্ধা মাতার সহিত যদি আমার স্ত্রীর অসদ্ভাব হয়, তবে তিনি জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসিক ১০৲ দশ টাকা হিসাবে মাসহরা পাইবেন। এই মাসহরা ষ্টেট্ উল্লাপাড়ার অধীন বানিয়াগাতি গ্রামের নিজাংশ যাহা পত্তনি দিয়াছি, ঐ সম্পত্তির উপর charge (আদায়)-স্বরূপ গণ্য হইবে। আমার মাতা রাজসাহীতে ও বাড়ীতে রীতিমত বাসের ঘর ও সরকারী চাকর পাইবেন। তাহাতে কেহ কোনও আপত্তি করিতে পারিবে না। পৈতৃক যে সকল ক্রিয়াকলাপ আছে, তাহা আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রাখা না রাখা আমার উক্ত স্ত্রীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি সাবালক ও নাবালক পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে যে কোনও সম্পত্তি বিক্রয়াদি— সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

আর আমার স্ত্রী যে ছেলেকে যা দিতে ইচ্ছা করেন, তাই দিয়ে যেতে পারিবেন—দানপত্র লিখে। নইলে মেয়েগুলো উত্তরাধিকারী হয়। ছেলেদের না দিয়ে মেয়েদের কখনো দেবে না। সমস্ত সম্পত্তির মালিক তিনি।

৮। আনন্দ-বাজার

বড় মায়ায় জড়িত হ'য়েছি। এই সুখের হাটে দুঃখও অনেক আছে, তবু সুখগুলো তো মিষ্টি,—দুঃখ গুলোও মিষ্টি লাগ্‌ত। সেই হাট ভেঙ্গে চলে যেতে ক্লেশ হয়। কিন্তু তা শুনে কে?

এই স্বর্গ, এই পৃথিবীতে স্বর্গ। ঐ মুখে যেন কার আভা প'ড়েছে। ভাই,রে তুমিই দেবতা—মানুষের মধ্যে দেবতা।

* * *

আর একটা দিন তোদের দেখে যাইরে।

* * *

আপনি আমাকে বড় মায়াতে ফেলেছেন। আমি ত মর্‌ব, কিন্তু আপনাদের জন্ম আমার মর্‌তে ইচ্ছা হয় না।

* * *

আমাকে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শোনাও। আমাকে কাঁদাও। আমার পাষাণ হৃদয় ফাটাও! প্রাণ পরিষ্কার ক'রে দাও, খাদ উড়াও। আমাকে আর ক'টা দিন বাঁচান্। ভগবান্ আপনার ভাল ক'র্‌বেন।

* * *

আমি ব্যস্ত হই নি। একটা আনন্দ-বাজার লাগিয়েছিলাম, তা'দের উপর মায়াটা যায় না। কি করি এইজন্ম আর ক'টা দিন বেঁচে যেতে চাই।

* * *

হা ভগবান্ রে! আমার প্রাণে শান্তি বর্ষণ কর্‌লে। সত্যি কি প্রাণভিক্ষা দেবে দয়াল! সত্যি কি আরো কিছুদিন বাঁচাবে দয়াল? ওরে দয়াল, ওরে করুণাময়, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লে পিতা তবে এখন কোলে নেবে।

* * *

আমার লেখার বেশি আদর ক'র্‌বেন্ না। আদর কর্‌লে আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করে

আমার মনে হয় যে, ভগবান্ কষ্ট দিয়ে দিয়ে বাঁচাবেন। এত লোক দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছে, এ কি সব ব্যর্থ হ'বে? আর এই বুড়ো অথর্ব্ব মা?

* * *

এ সুখের হাট ভেঙ্গে বড় অসময়ে নিয়ে যায়।

* * *

ভয় পাই নাই। যাব ব'লে ভয় করি নে। এ আনন্দ-বাজার ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে,—ভয় হয় না।

* * *

সেবার তো বাঁচিয়ে দিয়েছিলে, এবার প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে—যে বাঁচি; নইলে যে আনন্দ-বাজার ভেঙ্গে যায়।

* * *

আর হ'ল না, অনেক চেষ্টা কর্‌লেম। আমার এই আনন্দ-বাজার রইল, দেখিস্।

* * *

চন্দ্র দাদারে, ভাই! মনে রেখো, আর বুঝি পাড়ি দিতে পার্‌লাম না। আজকার রাত্রি একটু আশঙ্কা লাগ্‌ছে। আমাকে নেবে নেবে লাগে। এই সুখের হাট ভেঙ্গে দিলাম রে ভাই। দুখিনী রমণী র'ল, তারে তুমি দেখ' রে। ওরা যে কিছু করছে—জানে না ব'লে কত গাল দিয়েছি। ভাই রে, না খেয়ে যেন মরে না। আমার বউ যে না খেয়ে ম'রে গেলেও জানাবে না যে, চাল নাই। উপবাস কর্‌বে—ঐ গুলো দেখো।

৯। ধর্ম্মবিশ্বাস

সব প্রার্থনা কি মঞ্জুর হয়?

ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার।

—বাউল হরিনাথ।

* * *

ভগবান্ সকলেরই হৃদয়ে আছেন। গঙ্গা, কাশী প্রভৃতি সব মনেই—

ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্ম-তীর্থং ন জানন্তি কথং শান্তি বরাননে॥

* * *

I would advise you, therefore, to offer my Puja without Sacrifice. Let see, if that would do some good to the family. We have been short-lived. The whole family is ruined so to speak. What good has Sacrifice done to us? Before the mother of all living beings we kill an innocent animal. Does this propitiate the Goddess? (তাই, 'বলি' না দিয়া পূজা করিবার জন্য তোমাকে পরামর্শ দিই। দেখ, তাতে যদি পরিবারের মঙ্গল হয়। আমরা সকলেই অল্পায়ু। ব'লতে কি সমস্ত সংসারটা ছারখার হ'য়ে গেছে। 'বলি' আমাদের কি মঙ্গলটা ক'রেছে? জগন্মাতার সম্মুখে আমরা একটি নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করি—এতে কি দেবী প্রসন্ন হন?)

* * *

কই চক্ষে দেখ্লে? আমার পাপের শাস্তি ভোগ কর্‌ছি। তা না হ'লে কি এমন শাস্তি হয়? ভগবান্ কি অবিচার করেন? জীব নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে।

My idea all along is, that we ought not to sacrifice an innocent animal at the altar of the Goddess, whose grace we are going to invoke. My father was of the same opinion. Specially we are going to celebrate a ceremony—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম ক'র্‌তে চাই না। For a long time their family is offering sacrifices to the Goddess. But of what earthly benefit has that been upto date? (বরাবরই আমার ধারণা যে, আমরা যাঁহার কৃপাপ্রার্থী, সেই দেবীর বেদীর সম্মুখে একটি নিরীহ প্রাণীকে বধ করা উচিত নয়। বাবারও এই মত ছিল। বিশেষতঃ যখন আমরা একটি সদনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি। বহুকাল হইতে তাহাদের পরিবার দেবীর সম্মুখে বলি প্রদান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা হইতে আজ পর্য্যন্ত কি পার্থিব সুফল ফলিয়াছে?)

* * *

বিশ্বাস হারালে তো একেবারেই সংসার শূন্য হয়, কোনও আশ্রয়, কোনও অবলম্বন থাকে না। যা আভাস পাওয়া গিয়েছে, তা যদি ভগবৎ-প্রেরিত পূর্ব্বাভাস হয়, তবে আমাকে কেউ রাখ্‌তে পারবে না।

* * *

বিধাতার দয়ার যে দিন অভাব হয়, সেই দিনই কোন্‌খান থেকে কেমন mysterious wayতে (আশ্চর্য্য রকমে) এসে জুটে।

* * *

ভাই কুমার, আমি যদি মরি,—আর কাছে থাক, ভাই, আমার কাণে হরিনাম দিও।

হেমেন্দ্র, সুরেন, আমার মৃতদেহের সঙ্গে একটা হরিসঙ্কীর্ত্তন নিয়ে যেঁও।

ঙ * *

কুমার, কাঙ্গাল ব'লে কত দয়া—কত অনুগ্রহ। দেখ, যেন টাকার অভাবে আমার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া অঙ্গহীন বা নষ্ট না হয়।

* * *

এই যত ক্রিয়া, যত ঔষধ, যত একভাবে থাকা, হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়া—এ সমস্তই ঐ মহাদেবের ক্ষেত্র। তাঁরি কাজ। তিনিই মূলাধার। আমার ৮০ বছরের মা ধরণা দিতে গেল, ব্যাকুল হ'য়ে—যে মরি তো শিবের পায়ে ম'রব। আমার ছেলে বাঁচ্‌লে—আর কি চাই। আমি নিজে একজন ভগবৎ-বিশ্বাসী। সবই তিনি, এতে আর দ্বিধা-ভাব, তা ভেব'না। বুড়ো মা'র জন্য কষ্ট লাগ্‌ছে। মনে হয়, পুত্রগতপ্রাণা বুঝি নিজের প্রাণ দিয়ে ছেলের প্রাণ দিতে গেল।

* * *

আমার চোখের জল নয়,—মা আমাকে বড় মলিন দেখে আমার চোখের মধ্য দিয়ে চোখের জল ফেল্‌ছে।

* * *

দেখুন, আমাকে এ কদিন যেমন দেখেছেন, তার চেয়ে একটু ভাল দেখ্‌ছেন না? শান্তি, স্বস্ত্যয়নে নিশ্চয় গ্রহ প্রসন্ন হয়েছে বল্‌তে হবে।

* * *

আমার দয়াল তারকেশ্বর যদি রক্ষা করেন, তবে ওরা চুপ করুক, নইলে অল্প emergency watch কর। (সাংঘাতিক উপসর্গ লক্ষ্য কর।)

ভগবান্, আমার ত শারীরিক কষ্ট। আমার আত্মা ত কষ্ট-মুক্ত। দেহ মুক্ত হ'লেই আত্মা কষ্ট-মুক্ত হবে। তবে আত্মাকে দেহ-মুক্ত কর দয়াল, আর দেহ চাই না। দেহ আমাকে যত কষ্ট দিচ্ছে। আমার আত্মাকে তোমার পদতলে নিয়ে যাও।

* * *

খালি হরি বল্, বল্ হরি বল্, বল্ হরি বল্. খালি হরি বল্, আর কিছু নাই সুধু হরি বল্; আর চাইনে কিছু—সুধু হরি বল্, হরি বল্। এই রসনা জড়ায়ে আসে, বল্ হরি বল্।

* * *

আমার দয়াল ভগবান্! আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমাকে তোমার করুণা-চরণে স্থান দাও, ভগবান্।

* * *

ভগবানের কাছে ছোট বড় কিছু নেই।

* * *

অবিশ্যি সকলের উপর ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর যে কি অভিপ্রায় তা তো আমরা বুঝ্‌তে পারছি না। তবে আমাদের বিবেচনায় যেটা সব চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত সেইটেই আমরা ক'রে থাকি; বিধাতার ইচ্ছা তেমন না হ'লে সমস্ত উল্‌টে পাল্‌টে যায়। এ তো রোজই দেখ্‌ছি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা যেমনই হউক, যা হ'বার হবে ব'লে ব'সে থাকা কি তাঁর অভিপ্রায় হ'তে পারে? তোমার বুদ্ধিতে যেমন হয় তেমনি ক'রতে থাকো, তারপর তিনি আছেন।

* * *

আমার মন থেকে পাপ ইচ্ছা, পাপ প্রলোভন এই কষ্টের তাড়নায় দূর হচ্ছে। যখন একেবারে হৃদয় এই সব আবর্জ্জনা

থেকে মুক্ত হবে, তখন মার কোলে যাব। তার আর বেশি দিন বাকি নেই।

* * *

যাঁর দয়ায় এ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি, তাঁরই দয়ায় কষ্ট পাচ্ছি। নিচ্ছেন, আগুনে দগ্ধ ক'রে পাপের খাদ উড়িয়ে দিয়ে নিচ্ছেন; তা তো মানুষ বোঝে না,—মানুষ ভাবে, কষ্ট দিচ্ছেন।

* * *

এখানকার যারা, তাদের এই ৪৫ বৎসর ভজনা ক'রে দেখ্‌লাম। তারা কেউ আমাকে একটু হরিনাম শোনায় না। না পেয়ে নিজেই স্তোত্র লিখি। যখন বড় ব্যথা হয়, তখন বলি,—আর মের না, খুব মেরেছ, এখন তোমার চরণে টেনে নাও, এইখানে পৌঁছিলেই অবশিষ্ট আবর্জ্জনাটুকু দূর হয়ে যাবে।

* * *

ভগবদ্দর্শনের পূর্ব্বে সাধুর সাক্ষাৎ হয়। আমার তাই হয়েছে।

* * *

আমাকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে না দিলে খাঁটি হব, কেমন করে? যত angularities (খোঁচ্‌খাঁচ্‌) আছে সব ভেঙ্গে সোজা করে নিচ্ছে; নইলে পাপ নিয়ে, অসরলতা নিয়ে তো সেখানে যাওয়া যায় না।

* * *

একেবারে hardened sinner (নির্ম্মম পাপী) হ'বার আগেই আমার কাণে ধ'রে ব'লছে, "ও পথে যেও না"—অসময়ে ধরে নি।

* * *

আমি যে বিচার দেখ্‌ছি,—splendid (চমৎকার); এমন আর হয় না। Sub-judge (সব-জজ) মুন্সেফের সাধ্য নেই এমন বিচার

করে। আমার সম্বন্ধে যে বিচার হচ্ছে, আমার কথাটি ব'লবার যোটি রাখেনি যে, punishment is untimely or too severe ; (দণ্ড অসময়ে হচ্ছে বা শাস্তি অতীব কঠোর) ; এ বড় জবর Penal Code, (দণ্ড-বিধি) অভ্রান্ত—নির্দ্দোষ। আমার কথা শুনুন, আমাকে নিরুত্তর করে বেত মারছে।

* * *

বুদ্ধির দোষ অনেক আছে, অনেক হয়েছে। মানুষের কি মতিভ্রম হয় না? হ'লে কি করা যাবে? এ সব ভগবানের কাণ্ড। সুখ-দুঃখ কিছুই মানুষে গ'ড়তে পারে না। তিনিই মতিভ্রম ঘটান, তিনিই অভাবে ফেলেন, তিনিই উদ্ধার করেন। মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র। আজ আমার জীবনের জন্য হয় ত তিনি এই পরিবারকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে ছাড়বেন। এ কি মানুষে করে? মানুষ কেবল মনে মনে আঁচে, সঙ্কল্প তাঁর। দরিদ্রতা তিনি ঘটান—কুমতি, ভ্রান্তি দিয়ে ; আবার সম্পদ্ দেন সুমতি দিয়ে। নইলে কত চেষ্টা ক'রে লোকে অর্থ করে, এক দিন ডাকাত প'ড়ে সব নিয়ে যায়,—তার পরদিন সে ফকীর। এ কে করায়? আমার যে দোষ তাও আমার পরিহার করবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা ক'রলেও পারি নে ; এমনি কর্ম্ম আর অদৃষ্ট।

* * *

সত্যনারায়ণ পূজার জন্য একটা টাকা পৃথক ক'রে বেঁধে রাখ। যখন দেবতার কাছে বাক্য দেওয়া হ'য়েছে তখন অবহেলা ক'র না।

* * *

এটা ঠিক্ জেনেছি যে, যত শাস্তি তত প্রেম। এ তো কষ্ট নয়। সে যে তাঁর কাছে নিতে চায়, তা আগুনের মধ্য দিয়ে, খাদ পুড়িয়ে নির্ম্মল, উজ্জল না ক'রলে কেমন ক'রে সেখানে যাব?

যার দেহাত্মিকা বুদ্ধি তার কষ্ট। দেহ যে কিছুই নয়, তা বুঝতে পার্‌লে গলার বেদনায় আমার কি ক'র্‌তে পারে ?

* * *

দেখুন ব্রজেনবাবু, এ কষ্ট আর কষ্ট ব'লে মনে করি না। আমাকে আগুনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে, খাদ উড়িয়ে দিয়ে খাঁটি ক'রে কোলে নেবে ; নইলে ময়লা নিয়ে তো তার কাছে যাওয়া যায় না। এ তো মার নয়, এ তো কষ্ট নয়,—এ প্রেম, আর দয়া। আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি, আমাকে পরিষ্কার ক'রে নেবে। গায়ের ময়লা মাটি ঝ'রে প'ড়্‌বে কেমন ক'রে—বেতের আঘাত না দিলে ? আর এই মার যদি মরণের পর মার্‌তো, আমার কষ্ট হতো, কারণ সেখানে আর শুশ্রূষা ক'র্‌বার কেউ নেই। সেই জন্য স্ত্রী-পুত্রের সাম্‌নে মার্‌ছে যে, কাজও হয়, কষ্টও একটু লঘু হয়। ভাইরে এ তো মার নয়, এ যে রোজকার প্রত্যক্ষের মত অনুভব। রোজ মারে আমি কি দেখি না ? আমি মার খাই প'ড়ে, দেখ্‌বার চোখ আমার নাই। মতি ভগবদভিমুখী ক'র্‌বার জন্য এই দারুণ রোগ, আর দারুণ ব্যথা, আর কষ্ট।

* * *

তখন আমাকে যা লিখিয়েছিলো তাই লিখেছিলাম, এখন যা ভাবাচ্ছে তাই ভাব্‌ছি। রাত্রিতে ঘুম আসে না, রোগী মনে ক'রে,—রাত আসে, না যম আসে ; আমার মনে হয় রাত এলেই বেশ নীরব নিস্তব্ধ হয় ; তখন মার খাই বেশি, আর প্রেমের পরীক্ষায় প'ড়ে কত সান্ত্বনা পাই। কষ্ট মনে হয় না, বেশ থাকি।

* * *

সে জগৎ ভালবাসে, আমাকে ভালবাসে না ? তাকে ভুলেছিলাম, তা সে ছেলেকে ছাড়্‌বে কেন ? যেমন ক'রে বাপের কথা মনে হয়

তেম্‌নি ক'রেই মার্‌বে। আর বাপ তো যেমন তেমন বাপ নয়, যে বাপ সব দিয়েছে!

*　*　*

এই শেষ দেখা মনে ক'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে যান—"শিবা মে পন্থানঃ সন্তু" ব'লে। পথে যেন কোনও বিপদ না হয়। যেন সোজা নির্ব্বিঘ্নে চ'লে যেতে পারি। মন স্থির ক'র্‌ব না তো কি? হিন্দুর ছেলে গীতার শ্লোক মনে আছে ত? "বাসাংসি জীর্ণানি" etc. অমন ত কতবার ম'রেছি। মর্‌তে মর্‌তে অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

*　*　*

আমি এই এগার মাস প্রায় সমভাবেই কষ্ট পাচ্ছি। কত রকম কষ্ট যে পেয়েছি, তা ব'ল্‌তে পারি না। ফুলা, বেদনা, আহারের কষ্ট, অনাহার, অর্দ্ধাহার, প্রস্রাব-বন্ধ, অনিদ্রা, কাশি, রক্তপড়া ইত্যাদি। ইহার উপর অর্থ-কষ্ট। আমি প্রথম প্রথম মনে ক'র্‌তাম যে, এ জন্মের তো আছেই, কত জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত পাপরাশির জন্যে এই অভ্রান্ত Penal Codeএর (দণ্ড-বিধির) ব্যবস্থা আমার উপর হ'য়েছে। তখন মধ্যে মধ্যে ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ত। আমি কিছুদিন পর দেখি যে, এ তো শাস্তি নয়—এ যে প্রেম, এ যে দয়া! দেখ, খাঁটি জিনিসটি না হ'লে তো তার কোলে যাওয়া যায় না। তাই এই আগুনের মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে ক্রমে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্ছে, আর মতি তদভিমুখী ক'র্‌ছে। সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার মন্দ হ'লেও তো পুত্র। আমাকে কি ফেল্‌তে পারে? তাই এই শাস্তি, এই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হ'য়েছে। ময়লা মাটি আঘাতের চোটে প'ড়ে গিয়ে খাঁটি জিনিসটি হব; তখন আমাকে কোলে নেবে। আর মৃত্যুর পর অত বেত মার্‌লে সেখানে তো সেবা-শুশ্রূষার লোক নেই, সেইজন্য

এইখানে স্ত্রী-পুত্রের সাম্‌নে মার্‌ছে যে, কাজও হয়, একটু কষ্টেরও লাঘব হয়।। দেখ্‌ছ দয়া? দেখ্‌ছ প্রেম? চন্দ্রময়! আমি রাত্রিতে ঘুমাই না, বেশ থাকি, বড় ভাল থাকি। আমি যেন তাকে রাত্রিতে ধর্‌তে পারি—এম্‌নি অবস্থা হয়। আমাকে বড় কষ্টের সময় বড় দয়া করে। আমি এখন বেশ সহ্য কর্‌তে পারি। খুব acute painএও (তীব্র যাতনাতেও) আমার কষ্ট হয় না।

* * *

দেখুন, শাস্তি না হ'লে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কত জন্মজন্মান্তরের পাপ পুঞ্জ হয়ে আছে; ভগবান্ তো উচিত বিচার কর্‌বেনই; তার শাস্তি দেবেন না? এই শাস্তি ভোগ কর্‌ছি; এতে দেহমনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। যেমন তেতো অষুধ খেতে কষ্ট, কিন্তু বড় উপকারী, এ শাস্তিও আমার তেম্‌নি। এতে বড় উপকার হয়। চিত্ত একেবারে পৃথিবীতে শান্তি না পেয়ে ভগবানের দিকে ছোটে। তাই বলি যে, এ বড় মঙ্গল-জনক কষ্ট পাচ্ছি। তাই সহ্য ক'রতে পার্‌ছি। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছা হলে বাঁচ্‌তেও পারি।

* * *

এই দেহাত্মিকা বুদ্ধি হ'য়েই যত কষ্ট। নইলে শরীরের পীড়ায় কেন কষ্ট হবে। শরীরটা তো খাঁচা, ভেঙ্গে গেলে পাখীটার কষ্ট কি? ওটা তো দেহের বেদনা। ওতে কষ্টজ্ঞান না কর্‌লেই হয়।

* * *

বাস্তবিক মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখ্‌লেই আনন্দ হয়, লোকে তাকে আদর্শ করে।

* * *

আমি এখন ভগবানের নামে আছি। আমার ব্যথা না কম্‌লে আর প্রাণী হত্যা কর্‌বো না।

আমাকে ভগবান্ এম্নি ক'রে পদে পদে সাহায্য কর্‌ছেন ; কেন যে,—তা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নে। যে ব্যাধি দিয়েছেন তাতে তো অল্পদিন বা কতিপয়দিনে" যাওয়া নিশ্চয়, তবে এত যে কেন ক'র্‌ছে দয়াল, তা আমার মনোবুদ্ধির অগোচর। কিছুই ঠাওর পাইনে।

* * *

Education Department এর (শিক্ষা-বিভাগের) লোক দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, ও'রা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমরা যেমন quibble in law নিয়ে (আইনের কথার মারপেঁচে) বিচারকের চোখে ধুলো দিতে চাই, তেমনি অন্যান্য ব্যবসাতেও dishonesty (জুয়াচুরি) আছে। ওঁদের কাজে dishonestyও (জুয়াচুরিও) নেই, মেকিও চল্‌বার উপায় নেই।

* * *

দেবতা, আশীর্ব্বাদ ক'রে দিয়ে যাও। সমস্ত সারল্য আশীর্ব্বাদরূপে আমার মাথায় ঢেলে পড়ুক। দেবতা, কতদিনের বাসনা যে পূর্ণ হ'ল! পথে দেবদর্শন হ'ল, গিয়ে ব'ল্‌ব।

* * *

আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মতি ভগবন্মুখিনী হয়। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি অচলা হয়, আর সংসারে আমার কে আছে? আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। তিল তিল করে যাচ্ছি।

* * *

ভাই, ভজন-সাধন কিছুই জানি না! আমার দয়াল ভগবান্ দয়া ক'রে যদি চরণে স্থান দেয়, ভাই রে!

* * *

আশীর্ব্বাদ করুন। যেন মার কোল পাই, যেন পিতার চরণে স্থান

পাই। সে সকল স্থান কেবল চিন্তাহরণ, দুঃখবারণ। সেখানে পৌঁছিতে পার্‌লে আর ভয় কি, ভাই?

* * *

এই দেখুন, মায়ের কোলে ম'র্‌বার বল। আমার মনের বল নাই? আছে কার? বীরের মত ম'র্‌ব। দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পার্‌বেন না? দয়ালের নাম আমার মুখে, আর গঙ্গাজল আমার গায়। এ কেমন মৃত্যু? বাবা! মহারাজ! এ কেমন মৃত্যু!

* * *

আপনি বুদ্ধিমান্‌, জীবন আর মরণের সন্ধিস্থল দেখে যান। সে সন্ধিস্থলটা বড় আশ্চর্য্য স্থান। লোক-বিশেষের নিকট আমি বড় পবিত্র,— লোক বিশেষের নিকট আমি অতি নির্ব্বোধ।

১০। প্রার্থনা

দয়াল আমার, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। মার্জ্জনা কর দয়াল! সকলেই একলা যায়, আমিও একলা যাব। চরণে স্থান দিও। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই।

* * *

ভগবান্‌, দয়াময়, আমাকে শ্রীচরণে স্থান দাও। বড় কষ্ট পাচ্ছি। কথা বন্ধ, বল্‌বার যো নাই। আমি অধম, পায়ে প'ড়ে আছি। আমার গতি হোক্‌ দয়ার সাগর! আমি আর সইতে পারি না। করুণাময়! আর কষ্ট সহিবার ক্ষমতাও আমার লুপ্ত ক'রেছ! আর মান, যশঃ, কীর্ত্তি চাই না, অর্থও আমার জন্য চাই না,—এই অনাথ-গুলোর জন্য চাই। কিন্তু তোমারি কাছে রেখে যাই, দেখো পিতা। তোমারি পরিবার—সমস্ত অনাথ গরীব।

হে দয়াল, প্রাণবন্ধু, হৃদয়নিধি, এত কাল পরে কি আমার কথা মনে প'ড়ছে করুণাসাগর। আমি ধূলিময়, পাপী, শাস্তিতে তো সব শোধ যায় না, তবে এত দয়া কেন হ'ল ?

* * *

আনন্দময়ি, আমার আরাধনার মা ! আমার ভালবাসার মা ! আমার বড় স্নেহের মা ! আমার ক্ষমার ছবি মা ! আয় কোলে নে। আমি পরিশ্রান্ত, বড় ক্লান্ত !

* * *

কেন ভুলাও না ! কেন একেবারে একান্ত তোমার পাদপদ্ম বড় কর না মা ! সব ভুলাও মা রে ! তোমার চরণ-পদ্মের অমৃত পাওয়ার আশায় ব'সে আছি মা রে।

* * *

আর কিছু চাইনে। পৃথিবীর সব দেখেছি, আর দেখ্‌তে চাইনে। আর দেখাস্‌নে। এতে একবিন্দু কায়িক সুখ, আর কিছু নাই। মা, আনন্দময়ি রে ! রজনীকান্তের মা কোথারে ? কোল পেতে আয় মা ! সোণার সিংহাসনে বস্‌ মা। বল, আমার ছেলে কৈ ? আমাকে মা ব'লে কাঁদ্‌তো সে ছেলেটা আমার কৈ ? মা ব'ল্‌লেই শেষ জীবনে চ'খে জল আস্‌তো, মা ব'লে বড় কাতর হ'তো,—সে অধম ছেলেটা কৈ ? মা রে, 'আনন্দময়ী' লিখেছি শোন্‌ মা ! একবার ডেকে কোলে নে তো মা। আর আমি খেল্‌নায় ভুল্‌ব না। শ্রীচরণে স্থান দেবে, তবে এখান থেকে উঠ্‌ব।

* * *

ভগবান্‌, আমার দয়াল ! আমার পরম দয়াল, আমার সর্ব্বস্বধন, আমার সর্ব্বনিধি, আদি সর্ব্বনিয়ন্তা, কোন বুঝি পেলাম না, না

গেলাম,—তুমি কোলে নিলে, তুমি পায়ে স্থান দিলে, অন্তে কাজ কি? রাজসাহী দরকার কি নাথ? ও আমার কি স্থান! হায় গো, তোমার কোলের চেয়ে কোন্ জিনিস বেশি শীতল হয়? বেশি অমৃতময় হয়। অমৃত দিয়ে ধুয়ে নিয়ো, আর কি আক্ষেপ, দয়াল! আমাকে যদি তুমি না দেখে চলে যাও, বড় বিপন্ন বড় কষ্টে পতিত হই। মা রে! স্নেহ দিয়ে ভিজাও মা!

* * *

হে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! তুমি আমাকে কোলে নাও। তুমি দয়া ক'রে কোলে নাও। প্রভু, চিন্তামণি, আমি কি গিয়ে তোমায় দেখ্‌তে পাব না হরি? তুমি দেখা দেবে না? তবে এ পাপী, অধমের আর উপায় নাই। দয়াময় করুণা-প্রস্রবণ, তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি আমার দশা দেখে আমাকে মুক্তি দেবে না? আমাকে যে এত যশঃ, এত সম্ভ্রম দিলে,—তবে কেন দিলে? আমি তো চাই নে নাথ! দুঃখ-মুক্তি চাই। দুঃখ যেন আর না পাই। সে দিন কি হবে, দয়াল! কত অশান্ত, কত অধম, কত পাপ-পীড়িত সন্তানকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। আমাকে কোলে নেবে না হরি? দয়াল, এস একবার, দেখাও তোমার ভুবনমোহন মূর্ত্তি। যা দেখ্‌লে পাপ-প্রবৃত্তি থাকে না, যা দেখ্‌লে আর কিছুই দেখ্‌বার পিপাসা থাকে না। জীবনী নিজে লিখ্‌তে চেয়েছিলাম, তা জীবনে বের হ'ল না। দয়াল রে! বুড়ো মাকেও দেখো। বড় দুখিনী পত্নী রইল, বড় হতভাগিনী,—তোমারি চরণে রেখে যাচ্ছি।

* * *

অন্ধকার হ'য়ে আসে। তা এলই বা, এত লোক তোমার কাছে গেছে, আমার অত ভয় কি? গঙ্গাজল মুখে দিও, হিরণ রে!

আমাকে বিপদবর্জ্জিত স্থানে নিয়ে যাও হরি! নিয়ে যা মা! আমাকে আর এই বিপদের স্থানে রাখিস্ না মা, এই বাহ্ বস্তুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তুলে নাও। মাগো, করুণাময়ি, কোলে নে মা!

* * *

বড় কষ্ট রে হীরা, বড় কষ্ট। হরি হে দয়াল, সোজা হ'য়েছি আর মের' না। এখনও নাও। আর কিছু ক'র্‌বো না, হরি! এখন তোমার কাছে টেনে নাও। আমার যে দোষটুকু আছে, তা তোমার পায়ের ধূলো আমার মাথায় দিলেই সব চ'লে যাবে। হরি, আমি ডাকি নি, এখন ডাকাও। আমি তোমায় ভালবাসি নি, আজ বাসাও। তুমি না হ'লে আমার বল কোথায় হরি? তোমার কাছে টেনে নাও, শীঘ্র টেনে নাও। দয়াল, আর কষ্ট দিয়ো না। খুব মেরেছ, আর মেরো না।

* * *

আমাকে দেখ্‌তে আজ যে মহাপুরুষ এসেছেন, আমি তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর্‌ছি, পথে যেন আমার আর বিঘ্ন না হয়।

১১। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরতা

যা ভগবান্ করান, আমি তা'তেই গা ঢেলে ব'সে আছি। আর বিচার করি নে। যা হয় হোক্। এক মৃত্যু—তার জন্য ভগবানের পায়ে প'ড়ে আছি।

* * *

এই ঘটনা মঙ্গলময় ক'রেছেন, তাঁর বিধান মান, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে চিত্ত স্থির কর। আমি যে মৃত্যুর অপেক্ষা কর্‌ছি।

* * *

আমি বলি, সে চিন্তাই তোমার বৃথা, সুতরাং অকর্ত্তব্য। যাঁর হাতে

জীবন মরণ, তাঁর উপর ষোল-আনা নির্ভর ক'রে, কেবল তাঁর চরণ চিন্তা কর।

* * *

আমি গেলে কারো কিছু যাবে না, Dr. Ray, (ডাক্তার রায়), কেবল সম্রান্ত পরিবারকে পথে বসিয়ে গেলাম। কিন্তু এসব কর্‌লে দয়াল আমার—খাদ উড়িয়ে খাঁটি ক'রবার জন্ম। মার নয়, প্রহার নয়, কষ্ট নয়, ব্যথা নয়—শুধু প্রেম, শুধু দয়া।

* * *

ছাখ্ সুরেন, আমি যখন "ভগবান্, দয়াল, আমার দয়াল রে" লিখি, তখন ভাবে আমার চোখ জলে ভ'রে উঠে। মনে হয় এখুনি হোক্। যা হয় এখুনি হোক্। মনে হয় দিন এগিয়ে আসুক্। তোরা ভাবিস্—কেঁদে তোদের চিত্তের বল পর্য্যন্ত হরণ করছি। না, তা নয় রে। সব করেছিস্, এখন আমাকে শুয়ে থেকে নিঃশব্দে মর্‌তে দে। আমার প্রাণের বিশ্বাস, আর চক্ষের সাম্‌নে সে তেজস্বিনী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি তোরা সাজিয়ে দে রে। আর উঠিয়ে কাজ নেই, সুরেন। কেন জাগাস্, জাগিয়ে তোদের ভাল লাগে, আমার ত ভাল লাগে না!

* * *

আমি ভগবানের উপর ভার দিয়েছি। আর কিছু জানি নে।

* * *

আজ আমি আর সে রজনী নই। আমি মদবিহ্বল আত্মবিস্মৃত জীব নই। আমাকে সোজা ক'রে, সরল ক'রে, পবিত্র ক'রে নিচ্ছে; দেখ্‌তে পাচ্ছ না? নইলে পিতার কাছে যাব কেমন ক'রে? সে যে বড় পবিত্র, বড় দয়াল। তোমার কাছে যেমন ক'রে বলি, তেমন ক'রে এক ভগবানের কাছে বল্‌তে পারি, আর কারুকে কিছু বলি নে।

ভগবান্‌ই তো আমার ভরসা, মানুষ তো আমার সবই করলে, তা তো দেখ্‌লেই। সবাই ব'ল্‌লে—আর চিকিৎসা নাই। অতএই ভগবান্ ভিন্ন আমার আর আশা নাই।

* * *

কি কর্‌বি আর, ভাঙ্গা কুলো ফেলে রেখে যা রে। আমি এখুনি ভগবৎ-কৃপায় বাঁচব, না হয় ম'রব। কেউ খণ্ডাবে না রে।

* * *

ভাই রে তোমার দোষ কি? তুমি চেষ্টা ত কম কর নি। হ'ল না—বিধাতার মার, তোমার তো দোষ নাই।

* * *

ভগবান্, দয়াল! আমি একটু ছেঁড়া কাপড়ও নিয়ে গেলাম না। চাইনে দয়াল, তোমার দয়া সম্বল ক'রে নিচ্ছি। তা'তেই হবে। তোমার নাম আমার কাণে খুব উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লে আমি এখনও শুনতে পাই। তাতে যে বন্ধু-বান্ধবেরা কৃপণতা করে। দয়াল, তোমাকে সাক্ষী ক'রে সব কথা ব'ল্‌লাম।

* * *

মা আজ আমাকে এখনও আগুনে না দিয়ে কেবল শীতল কোলে স্থান দিয়েছেন। আমি আবার মার দয়া সহস্র ধারায় দেখ্‌ছি; তোরা দেখ্। 'মা জগদম্বা!' 'মা জগজ্জননি' ব'লে একবার সমস্বরে ডাক্ রে। ছেলে যেমন হোক্, মা তো তেমন মন্দ হয় না। মন্দ যে মা হ'তেই পারে না।

* * *

আমার প্রাণের হরি রে। হরি রে—কোলে তুলে নাও, হরি রে! আমি নিতান্ত তোমার চরণে শরণাগত হ'য়েছি। আর কেন না।

এ কি বিকাশ! একি মূর্ত্তি প্রেমের! সখা, প্রাণবন্ধু, প্রাণের বেদনা কি বুঝেছ? এই যে তোমার নামে আমার বুড়ো দুখিনী মা প'ড়ে আছে। ৮০ বৎসর বয়স হ'ল। তুমিই বল, তুমিই ভরসা। তুমিই দয়াময়—বাঁচাও। আমি সব দেখেছি। আমাকে যে ক্ষমা ক'রে কোলে নেবে, সেও তুমি।

* * *

আমার দয়াল রে! আর কেউ নাই রে দয়াল! স্থান দাও চরণে। শীঘ্র দাও, আর যাতনা-বিচ্যুত কর। এই ক্ষুধা-পিপাসা তোমার পায়ে দিলাম। তোমার নাম ক'র্‌লে কষ্ট কত কমে, কত আয়েস পাই।

* * *

আমার দয়াল জগদ্বন্ধু ডাকে, আমার মা ডাকে, আমার জগতের জননী ডাকে। না, ভাই রে জ্বলে পুড়ে ম'লাম। আগুনে ফেলে দিয়েছে। আর ভাল-মন্দ নেই।

* * *

মার কোলে যাবার জন্য কি আনন্দ হয়েছে! সত্য আনন্দ!

* * *

আগে ভাব্‌তুম্ বই দু'খানা যদি পারি, তবে দেখে যাই। সে সব ভগবানের চরণে সমর্পণ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। তা আর ভাবি নে। মরি—বেশ, বাঁচি—বেশ। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হোক্। ভাব্‌ব কেন?

* * *

আমি মৃত্যুর অপেক্ষা ক'র্‌ছি। আমার ব্যারাম যে অসাধ্য। বেদ-বাক্য বল্‌ছি না, তবে যা খুব সম্ভব তাই মানুষ বলে, আমিও তাই ব'ল্‌ছি। তবে তৈরী হ'য়ে থাকা ভাল। খুব ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, নৌকা ডুবে যাওয়াই ত বেশি সম্ভব, সেই ভেবেই লোকে হরিনাম

করে। আমাকে আর আশা না দেওয়াই ভাল। কারণ আশা হ'লে, এই শরীরেও সংসারে জড়িয়ে পড়ি,—চিত্ত ভগবানের দিকে যায় না। বাঁচ্‌ব না মনে হ'লেই আমার এখন বেশি উপকার। কারণ সুস্থ থাক্‌লে কেউ বড় দয়ালের নাম নেয় না।

*   *   *

সবাই ব্যস্ত হয়, আমি হই নে। কোনও ঔষধে কোনও ফল হ'ল না, এতেও কি বুঝা যায় না যে, মানুষের বাবার হাতে প'ড়েছে, তার উপর মানুষের হাত নেই।

*   *   *

আমাকে প্রেম দিয়ে বুঝিয়েছে যে, এ মার নয়, এ কষ্ট নয়,—এ আশীর্ব্বাদ। আমাকে আগুনে পুড়িয়ে আমার ময়লা-মাটি সব উড়িয়ে দিয়ে খাঁটি ক'রে কোলে নেবে,—সে কি সামান্য দয়া!

*   *   *

বাঁচ্‌বার জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করা গেল। কিন্তু বিধাতার প্রয়োজন হ'য়েছে, পার্থিব প্রয়োজনে আর আমাকে বেঁধে রাখ্‌বে কে?

*   *   *

এই সব মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমাকে বাঁচাবার জন্যে, একটু কষ্ট দূর ক'র্‌বার জন্যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কত যত্ন, কত শুশ্রূষা ক'র্‌ছে। কত লোক কত রকম ক'র্‌ছে; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যা, তাই ত ফ'ল্‌বে। মানুষে চেষ্টা কর্‌বার অধিকারী, ফল দেয় আর একজন।

*   *   *

বিচলিত হই নি, হ'বও না। মা এসে ব'সে আছে। বিচলিত হব কেন? মা-ই কোলে নেবে। দেখ্‌, এইবার তোর দাদার মাথা

কেমন ঠিক আছে। মার কাছে ব'সে আছে কি না, তাই আর স্বপন দেখে না।

* * *

ভগবৎ-শক্তি ভিন্ন আমার ঔষধ নাই।

* * *

তবু আজ ভগবান্ আমাকে নিজের পায়ের তলে একটু স্থান দিয়েছেন। আমাকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন।

১২। শেষকথা

মা আমার মা রে, কোলে নে মা ; আমায় মার্জ্জনা করে নে মা! আমার অসহ্য যন্ত্রণা মা। কোলে নে মা!

* * *

মা রে, আমার মা রে, ডেকে ডেকে আনে না রে কেউ। একবার দেখা। একবার দেখা রে, যে ক'রে হ'ক্ কেউ দেখা।

তবে বলা কথা কথা কওয়া হ'ল না। না হ'ল—

আজ নয় কাল কালই ভাল ভাল কালই কষ্ট কষ্ট কট কট কষ্ট কষ্ট কষ্ট কট।

দয়াল বাবা জয় জয়! আমি কখন এই ইন্‌জেক্‌সান দেন দিবেন দিব না, কখন দিব না, টানা টানা টানা ক টানা আমাকে মেরে মেরে মেরে ফেল না মের না রে কেরে কে ভাই মে মে রে মো মো মে রে ফেলে আমা মে কে রে কেরে কেরে—উঠ্‌তে পারি না পারি না দিস্ না মা! মা! মা রে মা!

হাসপাতালে—

সাহিত্য-সাধনা-মগ্ন রজনীকান্ত

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাসপাতালে সাহিত্য-সাধনা

হাসপাতালে দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে রজনীকান্ত যে ভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। প্রবল জ্বর, শ্বাস-কষ্ট, কাশির প্রাণান্তকর যন্ত্রণা, সর্ব্বোপরি ভোজন-কষ্ট—এই সকল দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা যুগপৎ মিলিয়া যে ভাবে তাঁহার দেহকে অনবরত পীড়ন করিতে-ছিল, সেই পীড়নের মধ্যেও তিনি যে সাহিত্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সুমধুর ধারা পান করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত হইয়াছে। অল্প একটু জ্বর হইলে বা শরীরের কোন স্থানে ব্যথা বোধ করিলে আমরা কতই না কাতর হইয়া পড়ি। সাহিত্য-সাধনার কথা দূরে থাকুক—সমস্ত জিনিসেই কেমন বিরক্তি বোধ হয়। অসুস্থ অবস্থায় মন প্রফুল্ল থাকে না—ইহা ধ্রুব সত্য, আর মন প্রফুল্ল না থাকিলে কোনরূপ সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করা যায় না,—সাহিত্য-রচনা ত দূরের কথা। শারীরিক সুস্থতাই সাহিত্য-রচনায় সাহায্য করে, অসুস্থ অবস্থায় মনের বিকার জন্মে, সেই মানসিক বিকারই সাহিত্য-রচনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত-প্রণয়ন-কালে গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক এই কথাই লিখিয়াছিলেন,—"যাঁহারা কবি, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন সুস্থ থাকিতে পারিলেও, সুখের পরিসীমা থাকে না। এ জগতে সুস্থতার অপেক্ষা মহামঙ্গলময় ব্যাপার আর কিছুই নাই। সুখ বল, সন্তোষ বল, আনন্দ বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, শক্তি বল, উৎসাহ বল, অনুরাগ বল, চেষ্টা বল, যত্ন বল,

ভজনা বল, সাধনা বল,—যে কিছু বল, এই সুস্থতাই সেই সকল বিষয়ের মূল ভাণ্ডার হইতেছে। দেহ রোগাক্রান্ত হইলে ইহার কিছুই হয় না, মনের মধ্যে কিছুই ভাল লাগে না। কিছুতেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই সুখের উদয় হয় না, বল, বিক্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয়, বিভব সকলি মিথ্যা হয়, পরমেশ্বরের প্রতি যথার্থরূপ ভক্তির স্থিরতা পর্য্যন্ত হইতে পারে না।"

আমাদের রজনীকান্ত গুপ্তকবির এই উক্তির—সর্ব্বজনগ্রাহ্য এই সাধারণ সত্যের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। হাসপাতালে রোগ-শয্যায় নিজের জীবন ও কার্য্যদ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—দৈহিক সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা—যতই নিদারুণ হউক না কেন, উপেক্ষা করিয়া, সাহিত্য-সাধনা ও সাহিত্য-রস সৃষ্টি করিতে পারা যায়। সুস্থ অবস্থায় রজনীকান্ত যে ভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া,—জনপ্রিয় কবি-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, অসুস্থ অবস্থায় লিখিত তাঁহার কবিতা তদপেক্ষা কম আদৃত হয় নাই। আনন্দবাজারের মাঝখানে সুখের কোলে বসিয়া যে,রজনীকান্তের লেখনী-মুখে এক দিন বাহির হইয়াছিল,—

"(আমি) অকৃতী অধম ব'লেও তো মোরে কম ক'রে কিছু দাওনি;
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও ত কিছু নাও নি।"

দুঃখ-যন্ত্রণার বেড়া-জালে আবদ্ধ হইয়া, শত অভাব-অনটনের মধ্যেও সেই রজনীকান্তই লিখিলেন,—

কে'ড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ-নয়ন কর অন্ধ ;
চির-যবনিকা প'ড়ে যাক্ হে, নিভে যাক্ রবি, তারা, চন্দ্র।
হ'রে লহ শ্রবণের শক্তি, থে'মে যাক্ জলদের মন্দ্র ;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ ;
স্পর্শ হর হে হরি, লুপ্ত ক'রে দাও অসাড়, নিস্পন্দ।

(তুমি) মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে এস প্রাণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।"

অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ভাবের কি সুন্দর পরিবর্ত্তন—পরিবর্ত্তনই বা বলি কেন, ভাবের যে বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহা উপরি উদ্ধৃত কবিতা-পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

রোগের যন্ত্রণা যখন প্রবল হইতে প্রবলতর হইত, তখন একমাত্র কবিতা রচনাতেই তিনি শান্তি বোধ করিতেন। চিকিৎসক ও বন্ধু-বান্ধবগণের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, "যন্ত্রণা যখন খুব বেশী বাড়ে, তখন এই কবিতা-রচনা ছাড়া আমার শান্তির আর দ্বিতীয় উপায় থাকে না।"

তাই হাসপাতালে সাহিত্য-সাধনা-মগ্ন রজনীকান্তকে দেখিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

"তাঁহার কবিতা ত সুন্দরই, কিন্তু কবিতাপেক্ষাও মৃত্যুশয্যায় তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাব আমার নিকট বেশি সুন্দর বোধ হইত। * * * মৃত্যু-ভীতি তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহার ভাবময় জীবনের মধুরতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার ন্যায় ভাবুক কবির জন্ম বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে।"

রোগের যন্ত্রণা তাঁহাকে যতই ক্লিষ্ট করিত, শ্বাস ও অনাহারজনিত কষ্ট তাঁহাকে যতই আঘাত করিত, রজনীকান্তের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কবিতার উৎস ততই উৎসারিত হইয়া ভাষার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। ধূপ দগ্ধ হইয়া যেমন আপনার সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করে, রজনীকান্তও তেমনি যন্ত্রণার দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া

কবিত্ব-মন্দাকিনী-ধারায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। দৈহিক যন্ত্রণা তাঁহার এই সাধনার অপরাজেয় মূর্ত্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, তাঁহার সঙ্কল্পিত সাধনার পথে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে নাই।

হাসপাতালের প্রথম অবস্থায়, তিনি আমাদের দেশের ভবিষ্য আশাস্থল বালক-বালিকাগণের মধ্যে "অমৃত" বণ্টন করিলেন। "যে সকল নীতিবাক্য সার্ব্বজনীন্ ও সার্ব্বকালিক, যাহা জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নহে, যাহা অমর সত্যরূপে চিরদিন মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ও অ·স্ত কাল করিবে"—তিনি সেইরূপ বিষয় লইয়া চল্লিশটি অমৃতকণিকা অষ্টপদী কবিতায় রচনা করিলেন। "অমৃতে"র কয়েকটি কবিতা হাসপাতালে আসিবার পূর্ব্বে 'দেবালয়' নামক মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, বাকিগুলি তিনি ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মধ্যে রচনা করেন। শীর্ণদেহে ও দীর্ণমনে তিনি কি সুন্দর ও সরল নীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, দুইটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় দিতেছি।

ক্ষমা

"দশবিঘা ভূঁয়ে ছিল আশি মণ ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ,—
খেয়ে গেছে প্রাতবাসী গোয়ালার গরু!
ক্ষেতগুলি প'ড়ে আছে, শ্মশান, কি মরু!
ক্ষেতের মালিক, আর গরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাড়ী; চাষা বলে, "ঠিক্,—
আহার পাইয়া পথে, পরম-সন্তোষ,
গরু তো বুঝেনা কিছু, ওদের কি দোষ?"

কথার মূল্য

"নিতান্ত দরিদ্র এক চাষীর নন্দন
উত্তরাধিকার-স্বত্বে পায় বহু ধন ;
সে সংবাদ নিয়ে এল ব্যবহারজীবী,
বলে "চাষী, এত পেলি, আমারে কি দিবি ?"
চাষী বলে, "অর্দ্ধভাগ দিব সুনিশ্চয়।"
গণনায় অর্দ্ধ অংশে কোটি মুদ্রা হয়।
সবে বলে, "কি দলিল ? কেন দিতে যাস্ ?"
চাষী বলে, "কথা দিয়ে ফেলিয়াছি,——বাস্।"

মহা আগ্রহে ও সাদরে রুগ্ন কবির এই অমৃত-ভাণ্ড বাঙ্গালী মাথায় করিয়া লইল এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল—"অদূর ভবিষ্যতে ইহার অনেকগুলি কবিতা 'প্রবচনে' পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শিশুরা এই 'অমৃতে' নবজীবন লাভ করিবে,—যাঁহারা শিশুর জনক-জননী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই 'অমৃতে' সঞ্জীবনী-সুধা পান করিবার অবকাশ পাইবেন।"

কার্য্যদ্বারা বঙ্গবাসী অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাদের এই উক্তির সার্থকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে 'অমৃতে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুই মাসের মধ্যে লোকের হাতে হাতে প্রথম সংস্করণের হাজার কপি বিক্রীত হইয়া যায়। আষাঢ় মাসে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণের হাজার সংখ্যাও নিঃশেষিত হয়। শ্রাবণে ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছিল।

এই দীর্ঘকালব্যাপী অসহনীয় রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে নিরাশা ও আশার, অন্ধকার ও আলোকের, ভুল ভ্রান্তি ও সত্য-নির্ণয়ের যে যুগপৎ সমস্যা তাঁহার মানস পটে রেখাপাত করিতেছিল, তাহারি মনোজ্ঞ ও পরিস্ফুট

চিত্র একে একে তাঁহার লেখনী-মুখে কবিতার আকারে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি যেন তাঁহার জন্মান্তরের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া, উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত প্রাণকে শ্রীভগবানের চরণে লীন করিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন,—

"মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে ?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্দ্ধে ধরিবে কে ?
রক্ত বহিবে মর্ম্ম ফাটিয়া ;
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া
ধর্ম্ম-পক্ষে শর্ম্ম-লক্ষ্যে
মৃত্যু বরিবে কে ?
অক্ষয় নব-কীর্ত্তি-কিরীট
মাথায় পরিবে কে ?"—
বলিয়া, সে দিন হুঙ্কার ছাড়ি
ছিন্ন করিনু পাশ ;
(হায়) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করিনু সর্ব্বনাশ !
চেয়ে দেখি কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,
আমার ধ্বনির উত্তর, শুধু
মানবের পরিহাস ;
(আমি) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করেছি সর্ব্বনাশ !

এই অন্ধ, মত্ত উদ্যমে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডী বাহিরে
করিনু আসন দান;
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,
ভেঙ্গে দিল মোর শিবহীন যাগ,
সকল দম্ভ ধূলায় ফেলিয়া
আজ ডাকি "ভগবান্"।
হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ,
কর তোমাগত প্রাণ।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার লেখনী-মুখে সেই সর্ব্বজন-সমাদৃত গানখানি বাহির হইল,—

আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকামতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,

এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হ'য়ে আছি ভরপুর ;
তাই, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চূর !

দিবস-রজনী দেব-পূজার জন্য পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তিনি আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন, কখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত—তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় দয়িত আসিয়া তাঁহার মানস পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন,—তাঁহাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। সন্ধ্যা-সমাগমে তাঁহারি সন্ধান-আশায় ব্যাকুল হইয়া রজনীকান্ত লিখিতেছেন —

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহা-ব্যোম-তলে
সুগম্ভীর নীরবতা মাঝে,
ফুল্ল শশী কোটি কোটি দীপ্ত গ্রহ-দলে
আলোকের অর্ঘ্য লয়ে সাজে।
তোমারি কৃপার দান দিবে তব পদে,
চন্দ্র-তারা সবারি বাসনা ;
কিন্তু সে চরণ কোথা ? গেলে কোন্ পথে
স্নিগ্ধ হ'বে দীন উপাসনা ?
কোটি কোটি গ্রহ, লোকে পায় নি খুঁজিয়া,
আরাধনা হ'য়েছে বিফল,

বিক্ষিপ্ত হৃদয় ল'য়ে নয়ন বুজিয়া
ব'সে থাকা, মন রে, কি ফল?

সন্ধ্যা চলিয়া গেল। রাত্রি আসিল। নিশীথ-নিস্তব্ধতার কোলে সমগ্র ধরিত্রী যখন সুপ্তিমগ্ন, কান্তের চক্ষুতে তখন নিদ্রা নাই। তাঁহার ভক্তি-নম্র-হৃদয়ের শ্বেত শতদল সেই চির-সুন্দরের পূজার জন্য পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বিরহ-বিধুর কান্তের লেখনী-মুখে তাহারি আভাস ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে,—

নিশীথে গগন স্তব্ধ, ধরা সুপ্তি কোলে,
গম্ভীর, সুধীর সমীরণ,
জলে স্থলে মধুগন্ধী কত ফুল দোলে,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণ।
আমি যুক্ত করে—"এস, পূজা লও প্রভু!"
ব'লে কত ডাকিনু কাতরে,
মায়াময় লুকাইয়া রহিলে যে তবু?
খুঁজে কি পাব না চরাচরে?
দুর্ব্বল এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে
কাঁদে নাথ! এ বেদনাতুর;
দেখা দিয়ে, পূজা নিয়ে রাখ পদতলে,
চাও নাথ, বিরহ-বিধুর!

সারা রাত্রি ডাকিয়া ডাকিয়া—চ'খের জলে বুক ভাসাইয়া কান্তের প্রাণ দেবদর্শন-লালসায় অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উষার আলোক যখন ধীরে ধীরে ধরণীর অন্ধকার দূর করিয়া দিল, মঙ্গল-ময়ের মঙ্গল-আরতির শুভ শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি যখন দশ দিক্ মুখরিত করিল, তখন রজনীকান্তের হৃদয়-শতদলের মাঝখানে তাঁহার হৃদয়-

দেবতা আবির্ভূত হইলেন। আনন্দ-বিহ্বল কবি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাহিলেন,—

প্রভাতে যখন পাখী গাহিল প্রভাতী
আলোকে বসুধা ভরপূর ;
পূর্ব্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ, ধীর, সমীর মধুর ;
মঙ্গল আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতি-গান।
কোথায় লুকালে প্রভু ? মুক্ত চরাচরে,
বলে দাও তোমার সন্ধান।
অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার ;
মুদিয়া আসিল দু'নয়ন ;
দেবতা কহিল ডাকি, 'মানসে তোমার
আন পূজা, করিব গ্রহণ'।

কান্তের মানস মন্দিরে তাঁহার আরাধ্য দেবতা যখন আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন, যখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কান্ত তাঁহার জীবনের জীবনকে দর্শন করিলেন, তখন ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি লিখিলেন,—

আজি, জীবন-মরণ-সন্ধিরে!
প্রভু কোথা ছিলে ? আহা দেখা দিলে,
এই জীর্ণ হৃদয়-মন্দিরে!
(ওগো বড় মলিন) (ওগো বড় আঁধার।)
এই যে সুত-জায়া, ওদের বড় মায়া,
(ওরা) সাধন পথের বন্দীরে।

(ওরা স্বজন-বাধা) (ওরা আপন কিসের।)

ওরা কত ছলে, সুখ দে'বে ব'লে.

(আমায়) রেখেছিল, ক'রে বন্দীরে।

(এই মোহের কারায়) (এই বন্দীশালে।)

আর নাহি বাকি, এখন মুদি আঁখি,

(রাখ) বুকে অভয়-চরণ ধীরে!

(আমার সময় গেল) (আঁধার হ'য়ে এল।)

তখন তাঁহার মানসনয়নের সমক্ষে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত দয়াল ঠাকুর অপরূপ ভুবনমোহন বেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তন্ময় হইয়া কান্ত তাঁহার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। চোখের জল দরবিগলিত ধারে পড়িতে লাগিল। ভাবমগ্ন রজনীকান্তের এ সমাধি তাঁহার রোগ-শয্যার সহচর হেমেন্দ্রনাথের আগমন ও আহ্বানে ভঙ্গ হইল। তাঁহার চোখে জল দেখিয়া হেমেন্দ্রনাথ ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি বড় কষ্ট হচ্ছে? কাঁদ্ছেন কেন? ইন্‌জেক্‌সন্ দেব কি?" কান্ত মুখ তুলিয়া হেমেন্দ্রনাথের দিকে একবার চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি রচনা করিয়া হেমেন্দ্র-নাথের কথার উত্তর দিলেন,—

(১)

আমি কাঁদি যার তরে

সে যে মোর অন্তরের হিয়া

মরমের সবটুকু

জীবনের সবটুকু দিয়া।

তাহে কি আপত্তি তব?

প্রিয়তম, কেন দিবে বাধা?

এ যে মৌনী হৃদয়ের
প্রাণভরা প্রেম দিয়ে সাধা।
ভাই রে হেমেন্দ্র, আমি
ব্যাকুল হইয়া যদি কাঁদি,
পবিত্র আদেশ তাঁরি
(তুমি ত জানিছ মোর,)
কি কঠিন ক্লেশকর ব্যাধি।
আমারে শুনায়ে বীণা
কোথা হ'তে নির্জ্জন প্রদেশে
নিয়ে তো যায় না তাই
কাঁদি, কোথা রব পর-দেশে!
সে বাঁশী, সে বীণা মোর
কেমন করুণ স্বরে বাজে;
আমি কোথা উড়ে যেতে
চাই উধাও হইয়া দীন সাজে।
তুমি ভাবিতেছ বুঝি
মিথ্যা বেদনার তরে কাঁদি,
ছি ছি বন্ধু, ছি ছি সখা
আমারে ক'রো না অপরাধী।

(২)

দাও ভেসে যেতে দাও তারে।
ঐ প্রেম-মেশা পরমেশ পাদোদক,
তাঁহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে
দিয়োনাকো বাধা; যেতে দাও।

আমার মরাল-মন ঐ চলে যায় কার গান গেয়ে,
শোন, ঐ স্রোতোবেগে মধুর তরঙ্গ তুলি,
যেতে দাও।
যুঝিও না, ওটিও চলে যাক্
আসিয়াছে যেথা হ'তে,
সে চরণে ফিরে চলে যাক্ ;
দিয়ে যাক্ এ তৃষায় কাতর
পৃথিবীরে সুশীতল সুমধুর ধারা,
অমর করিয়া যাক বহি।
ঐ অশ্রুটুকু এ জীবনে মরালের পাথেয় মধুর,
সে টুকু নিও না কেড়ে,
দিতে চাই তারি পদতলে
যে দিয়াছিল অশ্রু-ভিক্ষা।
আমার দয়াল ঐ ব'সে আছে নিরজনে—
আমারে দিও না বাধা, ভেসে যাই একমনে।

মাঝে মাঝে রজনীকান্ত তাঁহার দয়িতকে চকিতে হারাইয়া ফেলিতেন, সংসারের মোহ ও মায়া-জাল প্রেমময়ের কাছ হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। তখন রজনীকান্তের বিবেক আসিয়া তাঁহার চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিত, তাঁহাকে দিয়া লিখাইত,—

সে ব'স্ল কি না ব'স্ল তোমার শিয়রে,—
তুমি, মাঝে মাঝে মাথা তুলে,
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে ব'স্ল কি না)

সে তো তোমার সাথেই ছিল,
কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল,
তোমার ন্যায্য পাওনা,
বাকি নাই একটিও রে ;
একটু পায়ের ধূলো বাকি আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে।
(এই যাবার বেলায়।)
চাও নি তারে একটি দিন,
আজ হ'য়েছ দীন হীন।
সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয় রে,
আর থাস্‌নে রে বিষ পায়ে ধরি,
(তার) প্রেম-সুধা পিওরে।
(দিন ফুরাল।)

তিনি এমনই করিয়া আপনার মতিকে ভগবদভিমুখী করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেন, আপনার মনকে উপদেশ দিতেন ; তাঁহার বর্ত্তমান দুঃখ-যন্ত্রণার অবস্থার সহিত পূর্ব্বের সুখের অবস্থার তুলনা করিয়া তিনি আপনার মনকে কতই বুঝাইতেন ! তিনি দূরে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেও, যে—

"————দু'হাত পসারি,'
(তাঁহাকে) ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছে।"

তাঁহারই চরণে অচলা মতি রাখিবার জন্য রজনীকান্ত লিখিলেন—

ও মন, এ দিন আগে কেমন যেত ?
এখন কেমন যায় রে ?

গদীর উপর গভীর নিদ্রা,
টানা পাখার হাওয়া রে !
আর, ভোরে উঠেই নূতন টাকা,
আর তোরে কে পায় রে ?

আমার সাধের ছেলে মেয়ে
হেসে চুমো খায় রে !
আজ কেন লাগ্‌ছে না ভাল ?
ভাব্‌ছে একি দায় রে !

মনের সুখে পাখীর মত,
গাইতে যখন হায় রে,
তখন "হরি হরি" বল্‌তে বটে,—
(কিন্তু পোষা পাখীর প্রায় রে !

সুখের দিন তো ফুরিয়ে গেছে,
তবু মন কি চায় রে !
হা রে নিলাজ, চক্ষু মুদ,
দেখ্‌ আপন হিয়ায় রে।

তুই করে'ছিস্ তারে হেলা,
সে তোর পাছে ধায় রে,
আর ভুলিস্ নে পায় ধরি,
মজাস্ নে আমায় রে !

তাঁহার প্রাণে দুঃখ, কষ্ট ও রোগ-যন্ত্রণায় যে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে তিনি অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিলেন, আর

বুঝিতেছিলেন, জীবনে তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কিছুই 'ওয়াশীল' নাই! তাই তিনি কাতর ভাবে লিখিলেন,—

ওরে, ওয়াশীল কিছু দেখিনে জীবনে,
সুধু ভূরি ভূরি বাকি রে;
সত্য সাধুতা সরলতা নাই,
যা আছে কেবলি ফাঁকি রে।

তোর অগোচর পাপ নাই মন,
যুক্তি ক'রে তা ক'রেছি দু'জন;
মনে কর্ দেখি? আমাদের মাঝে
কেন মিছে ঢাকাঢাকি রে?

কত যে মিথ্যা, কত অসঙ্গত
স্বার্থের তরে ব'লেছি নিয়ত;
(আজ) পরম পিতার দেখিয়া বিচার,
অবাক্ হইয়া থাকি রে!

রুদ্ধ ক'রেছে আগে গল-নালী,
তীব্র বেদনা দেছে তাহে ঢালি,
করি কণ্ঠরোধ, বাক্যজ পাতক
হ'রেছে—খোল্ না আঁখিরে।

এমনি মনোজ, কায়জ পাতক,
ক্রমে লবে হরি, পাপ-বিঘাতক;
নির্ম্মল করিয়া, 'আয়' ব'লে লবে,
শীতল কোলে ডাকি রে!

কিন্তু এই নির্ব্বেদ অবস্থার মধ্যেও রজনীকান্ত শ্রীভগবানের করুণার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন,—

তখন বুঝি নি আমি,
দয়াল হৃদয় স্বামী,
পাঠায়েছ শুভাশিস্
দারুণ বেদনা-ছলে।

* * *

তারপরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম! একি?
শাস্তি কোথা? সুধু দয়া,
সুধু প্রেম—প্রতি পলে!

রজনীকান্ত এই ব্যথা-বেদনার মধ্যে দেখিলেন—সেই ব্যথাহারী শ্রীহরিকে। ব্যথা দিয়া যিনি স্থির থাকিতে পারেন না, ব্যথা দূর করিবার জন্য যিনি ব্যথাহারিরূপে ছুটিয়া আসিয়া ব্যথিতের প্রাণে শান্তি-প্রলেপ প্রদান করেন। ব্যথা দেন তিনি—ব্যথা দূর করিয়া ব্যথিতকে আপনার করিয়া লইবার জন্য। ভক্ত কবি বিহারীলালের ন্যায় তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

ব্যথাহারী ব'লে হরি
ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে?
ব্যথা দিয়ে তাই কি হে,
চাহ ব্যথা ঘুচাইতে?

সংসারের দুঃখ-কষ্ট, আধি-ব্যাধি, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক—এই সমস্ত অমঙ্গলের ভিতর যে কি মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না; এই সমস্ত অমঙ্গলের আবর্ত্তনে পড়িয়া সাধারণ মানব

শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে—ভক্ত কবির মত তাঁহারা বলিতে পারেন না—

জানি তুমি মঙ্গলময়,
সুখে রাখ দুখে রাখ
যে বিধান হয়।

সাধনা-মগ্ন রজনীকান্তও জানিতেন,—তিনি মঙ্গলময়। হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি প্রতি কার্য্যেই তাই তাঁহার মঙ্গল-হস্ত দেখিতেন। তাই তিনি বিপদ্‌কে আহ্বান করিয়া—বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। যন্ত্রণা যখন অধিক হইত, তখন তিনি লিখিতে বসিতেন;—রোজনাম্‌চার মধ্যে তাঁহাকে লিখিতে দেখি,—"যখন দয়াল আমাকে বেশি ব্যথা দেয়, তখন ভাবি যে এই আমার লেখার সময়। তখন উঠে বসি, দয়াল যা মাথায় যুগিয়ে দেয়, তাই লিখে চুপ্‌ করে শুয়ে থাকি।"—এত যন্ত্রণার মধ্যেও কখনও কোন দিন তাঁহাকে লিখিতে দেখি নাই—কখনও তাঁহার মুখে শুনি নাই—"আমার উপর সে কি অবিচার কর্‌ছে।" কখনও শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ত্বে তিনি বিশ্বাস হারান নাই—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—

আগুন জেলে, মন পুড়িয়ে
দেয় গো পাপের খাদ উড়িয়ে;
ঝেড়ে ময়লা মাটী, ক'রে খাঁটি
স্থান দেয় অভয় শ্রীচরণে।

তবে মাঝে মাঝে রজনীকান্ত তাঁহাকে পাইয়াও হারাইতেন—মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার দয়ালের দর্শন পাইতেন না—দর্শন-লালসায় তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল,—অথচ তিনি দেখিতেছেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া

তাঁহার প্রাণের দেবতা বধির হইয়া গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন—তাঁহার শত চীৎকার ও আকুল আহ্বানেও গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন না,—

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত
করিব ?
"ওগো, খুলে দাও," ব'লে আর কত পায়ে
ধরিব ?
আমি লুটিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া অধীর
হায় কি নিদয়, হায় কি বধির !
বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার বাহিরে,
মাথা খুঁড়ে আমি মরিব ?
হায় রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত
করিব ?
ঐ কণ্টকযুত বন্ধুর পথে,
ছিন্ন রুধির-আপ্লুত পদে,—
আহা বড় আশা ক'রে এসেছি, আমার
দেবতারে প্রাণে বরিব !
"ওগো, খুলে দাও," ব'লে কত আর পায়ে
ধরিব ?
ঐ, ওপারে আলোক ঝিকি-মিকি করে
কি মধু-সঙ্গীত আসে বায়ু-ভরে,
আমি, এপারে বসিয়া বিফল রোদনে,
আর কত কাল হরিব ?

দ্বার খুলিল না ; অভিমানী রজনীকান্তের অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের

পরতে পরতে যে ব্যথা বাজিয়া উঠিল, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার নিম্নলিখিত গানে পাই। তিনি তাঁহার নিদয় ঠাকুরের বধিরতা ঘুচাইবার জন্য, তাঁহার উপর অভিমান করিয়া 'আব্‌দারে ছেলে'র মত বলিলেন,—

তুমি কেমন দয়াল জানা যাবে,
আর কি তুমি আস্‌বে না?
কাঙ্গাল ব'লে হেলা ক'রে
হৃদি-মাঝে এসে হাস্‌বে না?

যে নিয়েছে তোমার শরণ
তারে দিলে অভয় চরণ,
আমি. ডাকিতে জানি না ব'লে
আমায় কি ভালবাস্‌বে না?

শ্রীভগবানের উপর যিনি অভিমান করিতে পারেন, তিনি ও তাঁহার অভয় চরণ পাইবেনই।

এই সমস্ত রচনার পরে রজনীকান্তের মনের ভাব কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী রচনাগুলি হইতে বুঝিতে পারি। তখন তাঁহাকে আর ডাকিয়া ডাকিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইতেছে না। তখন তিনি "আনন্দময়ী" মায়ের সন্ধান পাইয়াছেন। মনের এই অবস্থাতেই তিনি 'আনন্দময়ী'র গানগুলি রচনা করেন। দারুণ নিরানন্দের মধ্যেও তিনি মায়ের আনন্দময়ীরূপ দেখিয়াছেন। শুধু দেখিয়াই তৃপ্ত হন নাই, অপর পাঁচ জনকে তৃপ্ত করিবার জন্য ভাষার ভিতর দিয়া সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক বহু প্রাচীন সাধক-কবির রচিত আগমনী ও বিজয়ার

গান শুনিয়াছেন, এখন হাসপাতালে রোগ-শয্যায় শায়িত আমাদের আধুনিক কবি রজনীকান্তের রুগ্নাবস্থায় রচিত 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' কিছু রসাস্বাদন করুন।

মা আসিতেছেন, তাঁহার নগর-প্রবেশের ছবি রজনীকান্ত কি ভাবে আঁকিতেছেন, তাহা দেখুন,—

কে দেখ্‌বি ছু'টে আয়,
আজ, গিরি-ভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায়!
ঐ "মা এল, মা এল" ব'লে,
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে,
'উঠি পড়ি' ক'রে সবাই আগে দেখ্‌তে চায়।
নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে ক'চ্ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায়?
কি উন্মুক্ত শোভার সদন,
ফুল্ল অমল কমল বদন,
সিদ্ধি, শৌর্য্য, সোনার ছেলে অভয় কোলে ভায়।
কান্ত কয়, ভাই নগরবাসি!
তোদের, সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী,
দশমীতে অমাবস্যা, তোদের পঞ্জিকায়।

তাহার পর গিরিরাজ-মহিষী মেনকা উমার আগমনে—সারা বছরের পরে প্রিয়তমা কন্যাকে কোলের কাছে—বুকের কাছে পাইয়া কত দুঃখের কথা বলিতেছেন,—

সেই, তমালের ডালে, মাধবীলতারে
পেছিলি, মা, তু'লে দিয়ে,
সেই শুভলগনে, যেন দু'জনার
হয়েছিল, উমা, বিয়ে ;

ঐ সে মাধবী, ঐ সে তমাল,
জড়ায়ে, ঘুমায়ে, ছিল এত কাল,
প্রতিপদ হ'তে পল্লবে, ফুলে,
কে রেখেছে সাজাইয়ে।

তোর নিজ হাতে রোয়া চামেলী, বকুল,
এত ছোট, তবু দিতেছে, মা, ফুল,
ঐ তোর চাঁপা, ঐ সে যূথিকা,
ফুল-ডাল মাথে নিয়ে।

ফল, ফুল, কিছু ছিল না উদ্যানে,
মনে হ'ত, যেন মগ্ন তোর ধ্যানে ;—
তোর আগমন, নব জাগরণে
দিয়েছে মা জাগাইয়ে।

কান্ত বলে, রাণি, জে'নে রাখ খাঁটি,—
বিশ্বের জীবন-মরণের কাঠি
ওরি হাতে থাকে, কভু মে'রে রাখে,
কভু তোলে বাঁচাইয়ে।

এই গেল আগমনী, এইবার বিজয়া। দশমীর দিনে উমা

কৈলাসে যাইবেন। তাই নবমী-নিশার শেষ যাম হইতেই রাণী মেনকার মনে বিরহের ভাব উঠিয়াছে,—

'আজি নিশা, হয়ো না প্রভাত ;
পীড়িত মরমে আর দিও না আঘাত।
একবার বোঝ ব্যথা, একবার রাখ কথা,
নিতান্ত শোকার্ত্ত, কর কৃপাদৃষ্টি-পাত।
পরিশ্রান্ত কলেবর, হে কাল! বিশ্রাম কর,
ক্ষণমাত্র, বেশি নহে, আজিকার রাত ;
আমি তো জানি হে সব, অব্যাহত চক্র তব,
আজিকার মত, গতি মন্দ কর, নাথ!
উজ্জল নক্ষত্ররাজি, মলিন হয়ো না আজি,
ধ্রুব হও, দীপ যথা নিষ্কম্প—নির্বাত ;
তোমরা পশ্চিমাকাশে, চলিলে তো উমা সাথ
তোমরা মলিন হ'লে, শিরে বজ্রাঘাত।
চিরনিষ্ঠুরের ছবি, দশমী-প্রভাতরবি!
তুইও কি উদিত হবি? বিধির জল্লাদ!
কান্ত বলে, রাজমহিষি! পায় না যাকে যোগিঋষি
তিন দিন সে তোমার বুকে,—তবু অশ্রুপাত?

তাহার পর বিজয়ার দিন উমা কৈলাসে চলিয়া গেলে, মায়ের শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে।—মা বলিতেছেন,—

(ঐ) মা-হারা হরিণ-শিশু, চেয়ে আছে পথপানে.
অশ্রু ঝরিছে শুধু, কাতর দু'নয়ানে।

(ঐ) হংস-সারস-কুল, মলিন মুখে,
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে,
কি সোহাগে খে'তে দিত, অন্ন নয়—সে অমৃত,
সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড় ব্যথা দিয়ে প্রাণে।

(ঐ) শুক, শ্যামা এ ক'দিন "মা," "মা," ব'লে,
প'ড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গ'লে;
চ'লে গেছে নয়ন-তারা, আহার ছেড়েছে তা'রা,
(যেন) জিজ্ঞাসে নীরব ভাষে, "মা গিয়েছে কোন্‌খানে?"

নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ,
চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে নীরব শ্মশান;—
কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার!
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন দানে।

এই 'আনন্দময়ী'র পরিচয়। ইহার মধ্যে আনন্দের ছড়াছড়ি! নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্ত এমন সুন্দর রচনা করিয়া গিয়াছেন। জগজ্জননী মহামায়ার লীলা উপলব্ধি করিয়া সেই লীলা ভাষার সাহায্যে এমন সুন্দর ও সরল ভাবে ফুটাইয়া তোলা কত বড় শক্তি ও সাধনার কাজ, তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে গোটা বইখানি একবার পড়িতে হইবে।

"আনন্দময়ী" সম্বন্ধে তাঁহার রোজনাম্‌চার মধ্যে এমন কয়েকটি মূল্যবান্ কথা পাইয়াছি, যেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

"ভগবান্‌কে কন্যারূপে আর কোনও জাতি ভজন করে নি। যশোদার গোপাল, আর মেনকার উমা ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত।

সেই বাৎসল্য ভাবটা পরিস্ফুট ক'রে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। প্রেমই নানা আকারে খেলা করে। বাৎসল্য একটা আকার, যে বাৎসল্যে জগৎ চ'ল্‌ছে, সুধু দাম্পত্য-প্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ কর্‌তো, মানে সৃষ্টি হ'তো, কিন্তু বাৎসল্য না থাক্‌লে সৃজন পর্য্যন্তই থাক্‌তো—পালন আর হ'তো না, একেবারেই সংহার এসে উপস্থিত হ'তো। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার—এই তিনটে অবস্থার (Stage) মধ্যে স্থিতিটাই বাৎসল্য। এই ভাবটা মনে ক'রে বই আরম্ভ করেছি, এই ভাব দিয়েই বই শেষ কর্‌বো।"

হাসপাতালের রোগশয্যায় রজনীকান্ত বহু কবিতা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। উপরে মাত্র কয়েকটি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে রজনীকান্তের এই সাহিত্য-সাধনা দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরিচয় অন্য অধ্যায়ে আমরা বিবৃত করিতেছি। উপস্থিত এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্ব্বে রজনীকান্তের হাসপাতালে রচিত আর দুইটি গান উপহার দিতেছি। ইহার একটি হিন্দী ভাষায় রচিত; তাঁহার কোন হিন্দী গান আমরা ইতিপূর্ব্বে পড়ি নাই। গানখানি পড়িয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি—

আরে মনোয়া রে, কর্ লে অভি
দরিয়া-বিচ্‌মে নজর,
দিন্ রাত্ ভর্ কিস্তি চলায়া,
মিলা নে কৈ বন্দর্।
আরে জ্ঞান-ভক্তি দোনো ধারা বহে,
কহে বেদ-তত্তর্,
তুম্‌কো নয়া রাস্তা কোন্ বতায়া,
কোন্ দিয়া তুম্‌কো মন্তর্?

কিস্তি ভর্‌কে লিয়া কিত্‌না,
লাখ্ রূপয়া হন্দর্,
সব জমাকে বহুৎ ভুখা হো,
অভি জল্‌তা অন্দর্।
আরে খেয়াল্ কর্ লে দাঁড় হাল্ সব্
খরাব হুয়া যন্তর্,
তিনো বর্‌খা পার হুয়া, অউর্
ফুটা হুয়া অন্তর।
আরে ডুব্‌নে লগা কিস্তি,
পানিমে হৈয়ে হাঙ্গর্,
কিৎনা ফুটা বন্দ্ করোগে—
মুহ্‌মে বোলো 'শিউ শঙ্কর্'।

অপর গানটি আনন্দময়ী মায়ের দর্শনলাভ-পুলকিত-হৃদয়ের অভিব্যক্তি। সাহিত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহার সুর কি উচ্চ গ্রামে পৌঁছিয়াছে—তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় গ্রহণ করুন,—

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময় ;
সদানন্দে থাকেন যথা,—
সে যে সদানন্দালয়।

সেথা আনন্দ-শিশির পানে
আনন্দ-রবির করে,
আনন্দ-কুসুম ফুটি,
আনন্দ-গন্ধ বিতরে।

আনন্দ-সমীর লুঠি,
আনন্দ-সুগন্ধ-রাশি,
বহে মন্দ, কি আনন্দ—পায়
আনন্দ-পুরবাসী।

সন্তান আনন্দ-চিতে,
বিমুগ্ধ আনন্দ-গীতে,
আনন্দে অবশ হ'য়ে
পদ-যুগে প'ড়ে রয়।

আনন্দে আনন্দময়ী
শুনি সে আনন্দ-গান
সন্তানে আনন্দ-সুধা
আনন্দে করান পান ;

ধরণীর ধূলো-মাটি
পাপ তাপ রোগ শোক—
সেখানে জানে না কেহ,
সে যে চিরানন্দ-লোক।

লইতে আনন্দ-কোলে,
মা ডাকে "আয় বাছা" ব'লে,
তাই, আনন্দে চ'লেছি ভাই রে,
কিসের মরণ-ভয় ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ

২৮এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাসপাতালের কটেজ-ওয়ার্ডে মরণাপন্ন রজনীকান্তকে দেখিতে যান। বাঙ্গালার বরেণ্য কবির শুভাগমনে রজনীকান্ত অত কষ্টের মধ্যেও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন।

রজনীকান্তের বহু দিনের অপূর্ণ সাধ আজ পূর্ণ হইল! তাঁহার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া কৃতজ্ঞ কবি অবনতমস্তকে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। ভক্তি-যমুনা ও ভাব-গঙ্গার অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল! মরণ-পথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথের চরণতলে যে অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য এতদিন সাগ্রহ-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—আজ তাঁহার সে প্রতীক্ষা সফল হইল। অশ্রু-সজল-চক্ষে তিনি জানাইলেন—"আজ আমার যাত্রা সফল হইল! তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া, তোমারি 'কণিকা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'অমৃতে'র সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার যাত্রা সফল হয়।"

রজনীকান্তের এই আর্ত্তি, এই ব্যাকুলতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত—মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কান্তকবির এই ভাব দেখিয়া কবীন্দ্রের ভাব-প্রবণ-হৃদয়ে তুমুল তরঙ্গ উঠিল। তাহার পর তাঁহার কথার উত্তরে রজনীকান্ত যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার রোজনাম্‌চা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

—"শরীর কেমন আছে?

—এই tracheotomy ক'রে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। আমাকে একটু পায়ের ধূলা দিয়ে যান, মহাপুরুষ!

—আমি যখন বুঝ্‌লাম যে, এই উৎকট ব্যথা Penal Code (দণ্ড-বিধি) নয়,—এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্চে, আমাকে কোলে নেবে ব'লে—তখন বুঝ্‌লাম প্রেম। তার পর সব সচ্চি। একবার দেখ্‌তে বড় সাধ ছিল, নইলে হয় তো কৈফিয়ৎ দিতে হ'তো—সে দেখা আমার হ'ল। এখন বলুন, 'শিবা মে পন্থানঃ সন্তু!'

—আপনি আমাদের সাহিত্য-নায়ক, দার্শনিক; চরিত্রে, সহিষ্ণুতায়, প্রতিভায় দেশের আদর্শ। তাই দেখে গেলে একটু পুণ্য হবে ব'লে দেখ্‌তে চেয়েছিলাম। নিজের তো পায়ের কাছে যাবার শক্তি নাই।

—ভালবাসেন জানি, তাই এত কথা বল্‌লাম। কিছু মনে ক'র্‌বেন না।

—ছেলেটিকে বোলপুরে* দয়া ক'রে নিতে চেয়েছিলেন, শুনে কত আনন্দ হ'ল। আমি মহারাজকে † কথা দিয়ে বাগ্বদ্ধ হ'য়ে আছি; নইলে আপনার কাছে থেকে দেবতা হ'তো, তা'তে কি পিতার অনিচ্ছা হ'তে পারে?

—কি শক্তি আপনার নাই? অর্থ-শক্তি? তার যে গৌরব, তা আমি এই যাবার রাস্তায় বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। তার জন্যে মানুষ 'মানুষ' হয় না। এই যে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা আমার জন্য দিনরাত্রি

* রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত "বোলপুর-ব্রহ্মবিদ্যালয়ে"।

† মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

দেহপাত করছে, এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড়লোক।

—আর একবার যদি 'দয়াল' কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' আপনার কাছে একবার অভিনয় ক'রে দেখাতেম। আমি 'রাজা'র অভিনয় ক'রেছি। অমন কাব্য, অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পাট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে। আমার মাথা যেমন ছিল, তেম্নি আছে,—

'এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

(রাজা ও রাণী, ২য় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।)

একবার দেবতাকে শোনাতে পার্‌লাম না।

—আর 'কথা' আমার ছেলেরা recitation (আবৃত্তি) করে।

—আর 'কণিকা'র আদর্শে 'অমৃত' লিখেছি। লিখে ধন্য হ'য়েছি। — ঐ আদর্শে লিখে ধন্য হ'য়েছি! দীনেশবাবুর 'আদর্শ' কথাটা লেখাতে যতই কেন লোকের গাত্রদাহ হোক্ না। হাঁ, ঐ আদর্শে লিখেছি। সেটা আমার গৌরব না অগৌরব?

——আমি 'কাব্যে দুর্নীতি'ও জানি, সবই জানি। তবে জানাতে জানি না।

——আমি কি প্রতিভা চিনি না? আমি কি প্রতিভা দেখি নি? আমি কি পতিত-চরিত্র দেখ্‌লে বুঝি না? আমি কি দেবতা দেখ্‌লে বুঝি না? তবে এতদিন ওকালতি ক'রেছি কেমন ক'রে?

——বোঝে কে, নিন্দে করে কে? আমাকে আর উত্তেজিত কর্‌বেন না, দোহাই আপনার।

——'অমৃতে'র ছোট কবিতাগুলো কি প'ড়েছিলেন? আমার এই পীড়ার মধ্যে লেখা, কত অপরাধ হ'য়েছে। আপনার চরণে দিতে আমার হাত কাঁপে।

——আমাকে আর কিছু ব'ল্‌বেন না। 'দয়াল' আমাকে বড় দয়া ক'র্‌ছে। আমার ছেলেমেয়ের মুখে একটি গান শুনুন।"

ইহার পরে রজনীকান্তের ইঙ্গিতমত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিবালা ও পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাহাদের পিতার রচিত নিম্নলিখিত গানটি সুললিত-কণ্ঠে গাহিয়া রবীন্দ্রনাথকে শুনাইয়া দেয়। রজনীকান্ত নিজে তাহাদের গানের সহিত হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়াছিলেন।—

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক-উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ,—
তা'কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা' কে হারায়?
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

আসিছে রাত্তি, কত র'বি মাতি?
সাথীরা যে চ'লে যায়, খেলা ফেলে চ'লে আয়,
অবোধ-জীবন-পথ-যাত্রি!

গানটি শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাহার পর তাঁহার কথার উত্তরে রজনীকান্ত আবার লিখিতে লাগিলেন,—

——"আমি চার মাস হাসপাতালে।

——আমি চ'লে গেলে যেন নিতান্ত দীনহীন ব'লে একটু স্মৃতি থাকে,—এটা প্রার্থনা করবার দাবী কিছু রাখি না—কিন্তু ভিক্ষুক ত নিজের দাবী কতটুকু তা' বোঝে না।

——আমার হিসাবে আমি একটু শীঘ্র গেলাম।

——খুব মারে, আগে কষ্ট হ'তো, এখন আর বেশি কষ্ট হয় না।"

সেই দিন বৈকালে রজনীকান্ত তাঁহার সর্ব্বজন-আদৃত গানখানি,

——"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছে,

গর্ব্ব করিতে চূর!"

রচনা করেন এবং উহা বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দেন। কান্তকবির এই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। তিনি ১৬ই আষাঢ় তারিখে রজনী-কান্তকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন,—

ওঁ

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার-পূর্ব্বক নিবেদন—

সে দিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সে দিন আপনি

আমার "রাজা ও রাণী" নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

—"এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?"

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য !

যে দিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেই দিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম পরিচ্ছেদ

সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি

শ্রীভগবান্ যখন রজনীকান্তকে 'সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া,' তাঁহার যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি—একে একে সকলই কাড়িয়া লইলেন, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় করিলেন, যখন হাস-পাতালের রোগ-শয্যায় আশ্রয় লইয়া রজনীকান্ত ব্যাধির অরুন্তুদ যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন, যখন অভাবের তীব্র তাড়না তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়া তুলিল,—তখন তাঁহার সেই অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে কবিগুণমুগ্ধ বহু সহৃদয় ব্যক্তি ছুটিয়া আসিলেন। দেশের কত পণ্ডিত ও মূর্খ, কত ধনী ও নির্ধন, কত সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-বন্ধু—এমন কি কত অপরিচিত, অজ্ঞাত লোক রজনীকান্তের এই অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য হাসপাতালে, তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে উপনীত হইলেন,—প্রাণপণে রজনীকান্তের সেবা করিয়া তাঁহার অর্থ-কষ্ট দূর করিবার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করিয়া এবং নানা প্রকারে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সকলে নিজ নিজ সহৃদয়তার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই সমবেত সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া কবি মুগ্ধ ও ধন্য হইলেন,—কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তিনি তাঁহার রোজনাম্‌চার মধ্যে লিখিলেন,—"বঙ্গদেশ আমাকে ছেলের মত কোলে ক'রে আমার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করেছে, সেই জন্য আমি ধন্য মনে ক'রে ম'লাম।"

এই সমস্ত সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতির ভিতরে তিনি ভগবানের দয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন ;—দেখিতেন যেন তাঁহারই 'অফুরন্ত' করুণার ধারা সহস্র ধারায় রজনীকান্তের তপ্ত হৃদয়ে পড়িতেছে। এই ভাব যখন তাঁহার মনোমধ্যে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল, তখন রজনীকান্ত সমস্ত সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতির যিনি মূল, তাঁহারই চরণে শরণাগত হইয়া নিবেদন করিলেন,—

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ হরি, মোর কুটীরে নিয়ত।
মোর দশা হেরি তারা,
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা,
(তারা) যত মোরে বড় করে, আমি তত হই নত।
একান্ত তোমার পায়,
এ জীবন ভিক্ষা চায়,—
(বলে) "প্রভু, ভাল ক'রে দাও তীব্র গল-ক্ষত।"
—শুনিয়া আমার হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি',
কতরূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত।
এই অধমের প্রাণ,
কেন তারা চাহে দান ?
পাতকী নারকী আর, কে আছে আমার মত ?
তুমি জান, অন্তর্য্যামি,
কত যে মলিন আমি ;
রাখ ভাল, মার ভাল, চরণে শরণাগত।

তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, আমার জন্য এত ক'র্‌ছে—তাঁরি মানুষ, সুতরাং তাঁরি প্রেরণায়।”

বাঙ্গালার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদিন দাতব্য চিকিৎসালয়ে অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্রের মত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন আর কেহ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য ও সেবা করেন নাই; সমগ্র দেশবাসীর অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে তিনি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। জীবনের গোধূলি-সময়ে চক্ষু-হারা হইয়া বরেণ্য কবি হেমচন্দ্রকে কত কষ্টই না পাইতে হইয়াছিল? এই সকল কথা বাঙ্গালী ভুলে নাই। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় সে জগতের কাছে এতদিন মুখ দেখাইতে পারিতেছিল না, এ যে তাহাদের জাতির কলঙ্ক। ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদা ফুটিতেছিল, আর সে এই জাতিগত কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তাই রজনীকান্তের সেবা করিয়া বাঙ্গালী বহু দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ, বহু দিনের অন্তর্দাহী জ্বালা নিবারণ করিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের ঋণ বাঙ্গালী এতদিনে পরিশোধ করিবার অবসর লাভ করিয়া দেশ ও জাতিকে ধন্য করিয়াছিল। আমরা এই পরিচ্ছেদে সেই জাতিগত কলঙ্ক-ক্ষালনের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

সেবা

হাসপাতালের কটেজ-ওয়ার্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রজনীকান্ত মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও ছাত্রদিগের নিকট হইতে যে সেবা ও শুশ্রূষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আশাতীত। মেডিকেল কলেজের ছেলেরা পালা করিয়া রজনীকান্তের সেবা করিতেন, তাঁহাকে ঔষধ

একটি বিশেষ বিশেষণ “[illegible] সেবিকা,” যে দেশের রাজা গৃহাগত ক্ষুধার্ত অতিথির সেবার জন্য একমাত্র পুত্রের দেহ-মাংস-দানেও কাতর হন নাই, সেই দেশেরই বুকে আবার বহুদিন পরে সেবাধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। বাঙ্গালার বিপন্ন কবির সেবা করিয়া বাঙ্গালী জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

সাহায্য

কাশীযাত্রার পূর্ব্ব হইতেই রজনীকান্ত অর্থকষ্টে নিপতিত হন, তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যখন তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। হাসপাতালে অবস্থান-কালে তিনি বহু লোকের কাছ হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছেন।

লোকে রজনীকান্তকে তাঁহার এই অন্তিমসময়ে যে সাহায্য করিতেন,—তাহার মধ্যে কোন প্রকার কুণ্ঠা বা বিরক্তির ভাব ছিল না। রজনীকান্তকে সাহায্য করিতে পারিলে, কি ছোট, কি বড়—সকলেই আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। এই প্রসঙ্গে অনেকের নামই উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে এক জনের কথা বলিতেছি,—তিনি দীঘাপতিয়ার মহাপ্রাণ কুমার শরৎকুমার রায়। কাশী হইতে রজনীকান্ত কুমার শরৎকুমারকে সাহায্যের জন্য পত্র লিখিলে, কুমার উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—

“আমার নিকট আপনি প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার লজ্জার বিষয় কিছুই নাই, কেন না আমি যে আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য

বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

মহাপ্রাণ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়

করিতে সুযোগ পাইয়াছি—ইহা আমার নিজের গৌরবের বিষয় এবং ইহা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি। আপনার ন্যায় বাণীর বরপুত্র, আমাদের রাজসাহী কেন, সমগ্র বঙ্গদেশের শ্লাঘার বিষয়। আপনি নিরাময় হইয়া বঙ্গের সারস্বত-কুঞ্জ চিরকাল আপনার সুমধুর বাঁণা-নিক্কণে মুখরিত করিয়া রাখুন, ইহাই ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি।"

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া কুমার শরৎকুমারের নাম আজ বাঙ্গালাদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে—কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালার এই প্রিয় কবিকে অপরিমেয় সাহায্য করিয়া তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবকদিগকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। রজনীকান্তের কৃতজ্ঞহৃদয়ের যে অভিব্যক্তি ভাষার আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাঙ্গালী চিরদিন মরণাহত কবির কৃতজ্ঞহৃদয়ের এই অকপট অবদান শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে কুমার শরৎকুমারের মহাপ্রাণতার উদ্দেশে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে থাকিবে।

"শরৎকুমার সাত জন্মের সুহৃদ্ ছিল। শরৎকুমারের প্রাণটা আকাশের মত। শরৎকুমার এই চিকিৎসা চালিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে। শরৎকুমার সাহায্য না ক'র্‌লে আজ আমাকে দেখ্‌তে পেতে না।"

"কুমার, আপনি করুণাময়, আমার পক্ষে ভগবৎ-প্রেরিত। আমার এই ছেঁড়া মাদুরে ব'সে আমাকে আশ্বাস দেওয়া, আর আমার সাহায্য করা—এটা বড় লোকদের মধ্যে বিরল। আপনার গুণে আপনি উঁচু। অর্থের জন্য উঁচু বলি না, রূপের জন্য বলি না, ক্ষমতা কি মান-সম্ভ্রমের জন্য বলি না—উঁচু বলি আপনার প্রাণটার জন্য। ভগবান্ আপনাকে

আশীর্ব্বাদ দিয়ে ঢেকে ফেলুন, আপনার দীর্ঘ পরমায়ু হউক, আর বড় সুখের জীবন হউক।"

রজনীকান্তের হৃদয় কুমার শরৎকুমারের আন্তরিকতায়, সহৃদয়তায় এবং সহবেদনানুভূতিতে ভোরপূর হইয়া উঠিয়াছিল। হইবারই কথা। তাই কৃতজ্ঞ রজনীকান্ত বহু পত্রে কুমারের নিকট তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন। সেই চিঠিগুলি বাস্তবিকই তাঁহার প্রাণের কথায় পূর্ণ। পত্রগুলিতে তোষামোদের চাটুবাদ নাই—আছে কেবল প্রাণঢালা কৃতজ্ঞতা। মাত্র দুইখানি চিঠি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"আমি কি কখনও আশা করিয়াছিলাম যে, আপনার ন্যায় ব্যক্তি আমার বাসায় পদধূলি দিবেন? আপনার উদার চিত্ত আপনার সিংহাসন অনেক উচ্চে তুলিয়া দিয়াছে। ছোটকে যে জিজ্ঞাসা করে না, সে বড় নয়। আপনি সাহিত্যিক, তাহা জানিতাম—আপনি ধনবান, তাহা জানিতাম—আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী তাহাও জানিতাম, কিন্তু আপনার হৃদয় এত কোমল, পরের দুঃখ দেখিলে আপনি এত সমবেদনা বোধ করেন, তাহা আমি জানিতাম না। কুমার, আমি তো কত ক্ষীণ—কত ক্ষুদ্র, আমাকেই যখন খুঁজিয়া লইয়া প্রাণদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা জগতের অনেক উপকার হইবে।"

"মনে মনে আশা করিতেছি যে, আপনার দেওয়া প্রাণ লইয়া আবার পৃথিবীতে কিছু দিন আপনাদের সঙ্গসুখ ভোগ করিতে পারিব। আপনার দেওয়া প্রাণই বটে! আপনার সুদৃষ্টি না হইলে আমি এতদিন অস্তিত্ব হারাইয়া a thing of the past (অতীতের লোক) হইয়া থাকিতাম। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার পরোপকার-স্পৃহা। কি দিয়া ইহার পরিশোধ করিব জানি না। মঙ্গলময় আপনাকে

সুস্থ, নীরোগ, দীর্ঘজীবী করুন। কুমার, এই দুর্বল, রুগ্নের হৃদয়টুকু গ্রহণ করুন। আপনি দেবতা, আপনার চরণ-প্রান্তে পড়িয়া আমার হৃদয় পবিত্র হউক।”

হাসপাতালে রচিত ‘অমৃত’ পুস্তকখানি রজনীকান্ত কুমারের নামে উৎসর্গ করিবার সময় কৃতজ্ঞ-হৃদয়ের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসে লিখিয়াছিলেন,—

নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা ;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ’তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক’রেছে তুমি ছাড়া ? আর কেবা পারে ?
কি দিব, কাঙ্গাল আমি ? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মালা, বহু কষ্ট করি ;
ধর দীন উপহার ; এই মোর শেষ ;
কুমার ! করুণানিধে ! দে’খো র’ল দেশ।

কুমারের ন্যায় কুমারের বিদুষী ভগিনী,—‘বৈভ্রাজিকা, ‘কাননিকা,’ ও ‘শেফালিকা’ প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভাও রজনীকান্তকে বিশেষভাবে অর্থ-সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞ কবি তাঁহার হাসপাতালে রচিত ‘আনন্দময়ী’ গ্রন্থখানি ইঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই উৎসর্গ-পত্র হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

দূর হতে, স্নেহময়ী ভগিনীর মত,
কেঁদেছিল করুণায় ও কোমল প্রাণ,
তাই বুঝি সাধিবারে দুঃস্থহিত-ব্রত,
পাঠাইয়াছিলে, দেবি, করুণার দান !

বিশীর্ণ, [illegible] ম্পিত [illegible]ক্ষরে,
র'চেছি "আনন্দময়ী," শুধু মার নাম ;
যে করে ক'রেছ দান, ধর সেই করে ;
ধন্য হই, সিদ্ধ হোক্ দীন মনস্কাম।

মৃত্যুপথযাত্রী কবির রচিত এই কবিতা কবি ইন্দুপ্রভার কীর্ত্তি চিরদিন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবে।

বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক সাধু অনুষ্ঠান যাঁহার অপরিমেয় দানে পুষ্ট বাঙ্গালীর সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সম্মিলন যাঁহার করুণা-বারিপাতে জীবন পাইয়াছে—বাঙ্গালার সেই বদান্যচূড়ামণি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কান্তকবিকে হাসপাতালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপন্ন পরিবারবর্গকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র হাসপাতালে কয়েকবার রজনীকান্তকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিয়া রোগাহত কবির সংবাদ লইতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কবির পুত্রদিগের পড়াইবার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং কবির 'অভয়া' পুস্তকের দুই হাজার কপি বিনা খরচায় ছাপাইয়া দেন। আর মহারাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য—কবির মৃত্যুর পর বিনাসুদে তের হাজার টাকা ধার দিয়া উত্তমর্ণগণের কবল হইতে রজনীকান্তের যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা। কিন্তু ইহাতেই মহারাজের বদান্যতা পরিসমাপ্ত হয় নাই। তিনি বহুকাল যাবৎ কবির বিপন্ন পরিবারবর্গকে নিয়মিতরূপে মাসিক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে "অভয়া" উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-কবিতার কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি,—

বঙ্গসাহিত্য ও সাহিত্যসেবীর অকৃত্রিম বন্ধু

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

আপনি খুঁজিয়া নিয়া, শাপভ্রষ্ট দেবতার মত
আসিয়াছ কুটীর-দুয়ারে,—
শারীর-মানসশক্তি-বিবর্জ্জিত সেবক তোমার
রুগ্ন, আজি কি দিবে তোমারে ?

*

যে সাজি লইয়া আমি বার বার আসিয়াছি ফিরি',
তাতে দু'টি শুষ্ক ফুল আছে ;
দেবতা গো ! অন্তর্য্যামি ! একবার নিয়ো করে তুলি'
রেখে যাই চরণের কাছে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে আসিলে, রজনীকান্ত তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—"মহাপুরুষ ! আকাশের মত প্রাণটা—আমার কাছে এসেছেন। সাধু এসেছেন, আমি কি দিই ? আমি নির্ব্বাক্, নির্ব্বাণোন্মুখ। আমি বৃহৎ পরিবার রেখে গেলাম, আমার আনন্দবাজার—কেমন আনন্দবাজার তা'তো জানেন না ! আমি তা ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্চি। আমি—গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা। আমাকে হরিনাম দিন, মা'র নাম দিন। আমার কোন্ সুকৃতি ছিল যে, আমার যাবার রাস্তায়, আপনার মত সাধু মহাপুরুষের দর্শন পেলাম। এই রুগ্ন, বিপন্নের সর্ব্বান্তঃকরণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করুন, আমার আর কিছুই নাই যে দেবো। যদি বাঁচি তবে দেখাবার চেষ্টা কর্‌বো যে, আমি অকৃতজ্ঞ নই। যদি মরি, তবে আমার সমাধির কাছে মহারাজের কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে।"

মহারাজ চলিয়া যাইবার পর রজনীকান্ত তাঁহার পত্নীকে মহারাজের সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—"আমি ঢের মানুষ দেখেছি, এমন মানুষ দেখিনি যে, ধূলো থেকে একেবারে বুকে তুলে নেয়। ওঁর

নাম যেখানে হয়, সে স্থান অতি পবিত্র ও মহাতীর্থ। ও ত মানুষ নয়, ও ত মানুষ নয়, ছল ক'রে শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা এসেছে, জানো না?"

মহারাজ রজনীকান্তের কণ্ঠে তাঁহার রচিত তত্ত্বসঙ্গীত শুনিতে চাহিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে রজনীকান্তকে ব্যাকুলভাবে লিখিতে দেখি,—"দয়াল, আর একদিন কণ্ঠ দে, দেবতাকে দেবতার নাম শোনাই। একদিন কণ্ঠ দে, দয়াল! খালি ওঁকেই শোনাব, তারপর কণ্ঠ বন্ধ ক'রে দিস্।"

এতদ্ব্যতীত নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, দীঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুর, দুবলহাটীর কুমারগণ, মেদিনীপুরের কুমার শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন পাল, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বরিশালের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকে কবির এই বিপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে সাহায্য করেন। স্কুল-কলেজের ছেলেরা কবির রচিত 'অমৃত' হাতে হাতে বিক্রয় করিয়া দিয়া তাঁহার আর্থিক কষ্টের আংশিক লাঘব করেন। পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কবির 'অমৃত' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের ক হাজার কপি বিনা খরচায় ছাপাইয়া দেন এবং সময়ে সময়ে তিনি রজনীকান্তকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কবির সাহায্যের জন্য মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য ও উদার-হৃদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়কে বলিয়া 'মিনার্ভায়' একটি সাহায্য-রজনীর আয়োজন করাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ১৩১৭ সালের ২৬শে শ্রাবণ ঐ থিয়েটারে "রাণাপ্রতাপ" ও "ভগীরথ" অভিনীত হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ-লিখিত একটি সুন্দর প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ

অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। প্রবন্ধটির কিয়দংশ পাঠ করিলেই রজনীকান্ত সম্বন্ধে নাট্যসম্রাটের মনোভাব সহজেই উপলব্ধি হইবে,—

"মেডিকেল কলেজে যাইতে যাইতে পথে ভাবিতেছিলাম যে, রোগ-তাড়নায় পূর্ব্বপরিচিত যুবার কান্তি অতি মলিন অবস্থায় শয্যাশায়িত দেখিতে হইবে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, দারুণ রোগে যদিও সেই জনমনোহর কান্তি নাই, কিন্তু এ কঠোর অবস্থায়ও শান্ত পুরুষ কিছুমাত্র বিচলিত নন। * * * রজনীকান্ত তখন কবিতা-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় পরিশ্রম করিতেছেন,তাহাতে আমার কষ্ট বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহাতে ত অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে;' তাহাতে তিনি পেন্সিলে লিখিয়া উত্তর করিলেন, তাঁহার এই এক শান্তির উপায় আছে। ভাবিলাম, হায় বঙ্গমাতা, তোমার এই কোকিলের কলকণ্ঠ কেন রুদ্ধ হইল! রজনীবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আমার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইল যে, এই দুঃখের অবস্থাতেও কবি মঙ্গলময়ের মঙ্গলপ্রদ শ্রীচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান্ যে সর্ব্বমঙ্গলময়—ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন। 'আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া গর্ব্ব করিছে চুর' গানটি আমার মনে পড়িল, বুঝিলাম যে, এই গানে তাঁহার হৃদয়ের অকপট বিশ্বাস অঙ্কিত। কাঙ্গাল হওয়া তাঁহার আনন্দ, তাঁহার দেহাদি ভাব এখনও যে লুপ্ত হয় নাই, এই তাঁহার খেদ। ইহা সামান্য লক্ষণ নয়, ইহা মোক্ষলুব্ধ চিত্তের খেদ। প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁহার হৃদয়ের নির্ম্মল ভাব প্রতিফলিত এবং সকল কবিতাই বাগাড়ম্বরে অনাবৃত। সেই স্বভাব-কবির শোচনীয় অবস্থা মর্ম্মে লাগিল। ভাবিলাম, কি অভিশাপে বঙ্গ-জননী এই রত্নহারা হইতে বসিয়াছেন।

যিনি এই কঠিন পীড়াশায়িত কবিকে না দেখিয়াছেন, তিনি আমার বর্ণনায় বুঝিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরে চিন্তার্পিত কবি কিরূপ অবিচল ও প্রশান্তচিত্তে কবিতা-গুচ্ছ রচনা করিতেছেন.—দেখিলে বুঝিবেন যে যাঁহারা ঐশ্বরিক শক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসেন, তাঁহাদের মানসিক গঠনও স্বতন্ত্র। এইভাব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। গাড়ীতে আসিতে আসিতে বুঝিলাম, আমার সহযাত্রী ডাক্তারও সমভাবাপন্ন হইয়াছেন।" এই অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের প্রায় বারশত টাকায় কবির যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল।

বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় রজনীকান্তকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন বরিশালের আরও অনেকে রজনীকান্তকে অর্থ-সাহায্য করেন। এখানে মাত্র একজনের কথা বলিতেছি, ইনি বরিশালের জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার সহিত রজনীকান্তের পরিচয় ছিল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরিশালের উকিল-মহল হইতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং সেই টাকা পাঠাইবার সময়ে রজনীকান্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"কবিগণ চিরদিনই আপন-ভোলা—আপনি উকিল-কবি হইলেও তাহাই। চিকিৎসা-পত্রে যথেষ্ট খরচ হইতেছে জানি; বাণীর উপাসক চিরদিন কমলার বিরাগ-ভাজন। আমরা আমাদের এই 'বার' হইতে আমাদের বন্ধুবরের চিকিৎসা-ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য কিছু অর্থ পাঠাইতেছি —আপনি যদি আমাদের ধৃষ্টতা মাপ করিয়া, দয়া করিয়া গ্রহণ করেন, কৃতার্থ হইব। আপনি আমাদের কাছে প্রার্থী হয়েন নাই। আমাদেরই অবশ্যকর্ত্তব্য আমাদের দেশের কবিকে, আমাদের সমকর্ম্মী ভ্রাতাকে রোগমুক্ত করা এবং সেই কার্য্যের সর্ব্ববিধ ব্যয় বহন করা।"

সহানুভূতি

হাসপাতালে দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে রজনীকান্তের সাহিত্য-সাধনা, অপরিসীম ধৈর্য্য, তাঁহার সাধক-ভাব ও ঈশ্বরে একান্তনির্ভরতা দেখিয়া বাঙ্গালাদেশ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সাধনার এই অপূর্ব্ব চিত্র বাঙ্গালাদেশ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। শুধু বাঙ্গালার কেন, ভারতবর্ষের—এমন কি জগতের চিত্র-পটেও এরূপ অতুলনীয় সমাধি-চিত্রের প্রতিলিপি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ! তাই বাঙ্গালার জন-সাধারণ, ধনি-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, বাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলে সমবেতভাবে কবির সেবা করিয়া, তাঁহার সাহায্য করিয়া—সহানুভূতির ধারায় তাঁহার রোগদগ্ধ দেহে শান্তি-প্রলেপ দিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল।

কবিকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, তাঁহার রচিত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া, তাঁহাকে নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার উপহার দিয়া—নানা ভাবে নানা শ্রেণীর লোক রজনীকান্তের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, কুমার শরৎকুমার, সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ, হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ, গুরুদাস, সব্-জজ তারকনাথ দাশগুপ্ত, প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, কবি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর, আদর্শ শিক্ষক রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ধর্ম্মপ্রাণ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা—সুরেশচন্দ্রের জননী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিদুষী কন্যা

শ্রীমতী কুমুদিনী ও শ্রীমতী বাসন্তী, বাঙ্গালার ছোট-বড় বহু সাহিত্য-সেবক এবং কাশীর ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রাণস্বরূপ জ্ঞানানন্দ স্বামী প্রভৃতি সমগ্র বাঙ্গালার, নানা শ্রেণীর, নানা সম্প্রদায়ের, নানা অবস্থার বহুতর ব্যক্তি রজনীকান্তের এই দুঃসময়ে তাঁহার প্রতি অযাচিতভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

দেশবাসীর এই সহানুভূতিতে কবির হৃদয় কিরূপ বিগলিত হইত, তাহা তাঁহার রোজনামচার নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে—"আমাকে সারদা মিত্র, গুরুদাসবাবু, রবিবাবু, অশ্বিনী দত্ত—সবাই কত আশ্বাস দিয়ে চিঠি লিখেছেন সেই চিঠিগুলো এক একখানি আমার দয়ালের চরণামৃত। সেইগুলো আমি পড়ি, আর আমার কান্না পায়।"

অশ্বিনীবাবু রজনীকান্তকে বহু পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানে মাত্র তাঁহার একখানি পত্রের কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম,—

"আপনি প্রকৃতই অমৃতের অধিকারী। আপনার সঙ্গীতগুলিতেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। লক্ষ লক্ষ লোক নিঃসংশয় ভগবৎ-চরণে আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছেন,—আমিও তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ মিলাইয়া সপরিবারে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিলেন—"আপনি ও আপনার স্বাস্থ্য সমগ্র বাঙ্গালীজাতির সম্পত্তি। করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যাহাতে আপনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন।"

হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ লিখিলেন, "আপনার অবস্থা দেখিয়া বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছি। মনে হয়, ভারতবাসিগণ কত কি পাপ করিয়াছে, তজ্জন্য দেবতাগণ রুষ্ট হইয়া আমাদের অমূল্য রত্নগুলিকে

তিরোহিত করিতেছেন। তবে সে দিন যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আশা হইয়াছে।"

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র একখানি পত্রে রজনীকান্তকে লিখিলেন,—"আপনি অনেকটা ভাল আছেন জানিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। মঙ্গলময় ভগবান্ আপনাকে একেবারেই সুস্থ করুন। আপনার হইতে আমাদের মাতৃভাষার ঢের কাজ হইবে। আপনার অমৃত-নিস্যন্দী বীণার ঝঙ্কার কে না ভালবাসে?"

হাসপাতালে রোগশয্যা-শায়িত রজনীকান্তকে দেখিতে যাইবার সময়ে লোকের মন খুবই বিমর্ষ, উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইত, কিন্তু হাসপাতাল হইতে ফিরিবার সময়ে তাঁহাদের মনোভাব অন্যরূপ ধারণ করিত। প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিয়া আসিবার পর যে পত্র লিখেন, তাহা পড়িলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে,—

"বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে যে দিন রজনীকান্তকে হাসপাতালে প্রথম দেখিতে যাই, সে দিনকার কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। কবির অবস্থা যে এতদূর শঙ্কটাপন্ন, তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। ক্যান্সার রোগে কণ্ঠনালী ক্ষত, কথা কহিবার শক্তি নাই, জ্বর প্রায় এক শত চার ডিগ্রী, এরূপ অবস্থায় কবি উঠিয়া বসিয়া কাগজ-কলমে লিখিয়া আমাদের সহিত যেরূপভাবে আলাপ-পরিচয় করিলেন, তাহা কেবল প্রাণে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। সামান্য রোগেই আমরা কিরূপ অধীর ও কাতর হইয়া পড়ি, আর এই দুরারোগ্য রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তের কি গভীর ভগবৎপ্রেম, কি অচলা নিষ্ঠা, কি জীবন্ত বিশ্বাস, কি অসামান্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা! ভগবদ্ভক্তি কোন্ বলে অসহ্য যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকেও পরাভব

করে, তাহা সে দিন বুঝিলাম। কবির যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া যদিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি ফিরিয়া আসিবার সময় মনে হইল যেন, কোন তীর্থস্থান হইতে ফিরিলাম। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না।" বাস্তবিকই ভুলিবার নয়, এ মহনীয় দৃশ্য দেখিয়া সাধারণে বিস্মিত, মুগ্ধ ও ভক্তিতে নত হইয়া গেল। রোগের ও দারিদ্র্যের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় রজনীকান্তের বিশুদ্ধি যখন সাধারণের গোচরীভূত হইল, তখন বাঙ্গালার বহু সাহিত্য-সেবক নানা প্রবন্ধ ও কবিতায় এই অতুলনীয় দৃশ্যের ছবি আঁকিতে লাগিলেন। গ্রন্থের কলেবর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, তাই নিম্নে মাত্র দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

১

থামো, থামো—দেখে' নিই পিপাসিত দু'টি আঁখি-ভরে,'
থামো কবি,—এঁকে নিই হৃদি-পটে আরো ভাল করে'
ওই সাধনার মূর্ত্তি—নির্ভরের চিত্র মনোহর ;
কলঙ্কী দর্পণ মোর, মাজি' লব—দাও অবসর।
হে সাধক, হে তাপস, আশীর্ব্বাদ—কর আশীর্ব্বাদ,
একবার এ জীবনে লভি তব সাধনার স্বাদ!
আজিকে তোমায় হেরে' চক্ষে মোর ভ'রে আসে জল,
বাণীর পূজার লাগি বিকশিয়া উঠে চিত্তদল
শুভ্র শতদল সম—ভুর ভুর গন্ধে ভরপূর ;
হৃদয় মাতিয়া উঠে ভক্তিরসে বেদনা-বিধুর।

*　　*　　*

—কে বলিবে মন্দভাগ্য? অসহ্য এ বেদনার সুখ
সেই জানে, একনিষ্ঠ সাধনায় যে জন উন্মুখ

উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধলোকে—কে বুঝিব মোরা সাধ্যহীন,
মোরা শুধু কাঁদি, হাসি, ভালবাসি—কেটে যায় দিন!
মধুর কোমল কান্ত! হাসি, অশ্রু, করুণার কবি,
ফুটাও মলিনচিত্তে আজি তব সাধনার ছবি।
এ সাধনা আরাধনা ধন্য হোক—আজি ধন্য হোক,
ফুটুক্ এ শীর্ণকুঞ্জে নন্দনের অম্লান অশোক!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

গভীর ওঙ্কারে যেথা সামগান ঝঙ্কারিয়া উঠে,
সেথায় গাহিতে হ'বে এই সাজে গিয়াছিলে মরি!
মঙ্গল কিরণে দিব্য হয়ে যবে প্রাণ-পদ্ম ফোটে—
মর্ম্মকোষে, পদরেণু তবে তায় রাখেন শ্রীহরি!
তুমি তা' জানিতে কবি, গেয়েছিলে তাই সে সঙ্গীত,
মর্ম্ম-মলিনতাটুকু নিয়েছিল সরমে বিদায়।
তার পর সে কি গান! বিশ্ব-হিয়া স্পন্দন-রহিত—
বিহ্বল, চেতনাহারা, যোগ-ভক্তি-প্রেম-মদিরায়!
গাও কবি, বুক-ভ'রে, কণ্ঠ-চিরে গেয়ে যাও গান,
এ দুর্ভাগ্য-নীল-নদে ভেসে যাও মিশর-মরাল*—
গানে দিক্ ছেয়ে ফেল, সঙ্গীতেই পূর্ণ অবসান—
তোমার এ কবি-জন্ম; কভু যদি হও অন্তরাল,

* মিশর দেশের মরাল নাইলনদে গান করিতে করিতে মরিয়া যায়, ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

বঙ্কিম নীলের গতি* রাখে যদি লুকায়ে তোমারে,
তবু গান গেয়ো কবি—সুদূর সিন্ধুর পরপারে ।
† শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কতলোক হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে আসিতেন, সকলকেই রজনীকান্ত এই দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও, নানাভাবে আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতেন ; অবিরাম লেখনী-চালনা দ্বারা কবিতা রচনা করিয়া, হাসির গল্প লিখিয়া ও নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি সকলকে পুলকিত করিতেন। সঙ্গীতময় রজনীকান্ত, সঙ্গীত-সাহিত্য-সেবক রজনীকান্ত নিজে কণ্ঠহারা হইয়াও, পুত্রকন্যা ও প্রিয়শিষ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা স্বরচিত গান গাওয়াইয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। এই প্রিয়দর্শন ও সুকণ্ঠ দেবেন্দ্রনাথই স্বীয় মধুস্রাবী সঙ্গীত-ধারায় হাসপাতালকে নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিলেন। তাই রজনীকান্তকেও লিখিতে দেখি,—"এই দেবেন্দ্র বড় সুন্দর গায় ও না থাক্‌লে, আমি আরো শীঘ্র মর্‌তাম।"

সমাগত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি পাইয়া কবি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে যে ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে ; এখানে তাঁহার রোজনাম্‌চা হইতে আরও দুই চারিটি কথা তুলিয়া দিতেছি,—

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি লিখিয়াছিলেন,—
"আমার যে ক্ষমতাটুকু আছে, তা আপনার ন্যায় সাহিত্য-রসোন্মাদ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির সংস্পর্শে।"

---

* নাইলের বক্রগতির কথা সকলেই জানেন।

† সুহৃদবর ইন্দু "টাইটানিক" জাহাজের সহিত সাগরজলে চির অস্তমিত হইয়াছেন। সুসন্তানের এই শোকাবহ অকালমৃত্যুতে আজিও বঙ্গদেশ শোকার্ত্ত।

তিনি শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—

"আপনি একজন self-made man, (স্বাবলম্বী ও কৃতী ব্যক্তি) আর এখন ত ঋষিতুল্য লোক। আপনার দয়াতে আমি তাঁর দয়া দেখ্‌তে পাচ্চি। আপনাকে দেখ্‌লেই আমার ভগবৎ-প্রেম হয়। কেন জানি নে, আপনার মুখে সেই আভা পাই। আপনি ঠিক রামতনু লাহিড়ীর ছেলে, তাতে আর ভুল নাই।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে গিয়া, তাঁহার অরুন্তুদ যন্ত্রণা দেখিয়া বিগলিত হইয়া যান এবং বলেন, "আমার আয়ু নিয়ে আপনি আরোগ্য লাভ করুন।" তাঁহার এই কথার উত্তরে রজনীকান্ত লেখেন,—"ডাঃ রায়, আপনি প্রার্থনা কর্‌ছেন, না ঋষি প্রার্থনা কর্‌ছেন। আমাকে আপনি আয়ু দিতে পারেন। হাঁ, আত্মত্যাগ!—আপনার মত কয়টা লোক ক'রেছে? না করে, না পারে? এই ত বলি মানুষ। বিবাহ করেন নাই,—কেবল পরার্থে আত্মোৎসর্গ!"

ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের জ্ঞানানন্দ স্বামী হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে যান; তাঁহাকে রজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন,—

"ভগবদ্দর্শনের পূর্ব্বে সাধুর সাক্ষাৎ হয়। আমার তাই হ'ল। আমি কি সৌভাগ্য ক'রেছিলাম? আমার এ সাধ কোন্ সৌভাগ্যে পূর্ণ হ'ল? মহাপুরুষ! আমি কি দিয়ে অভ্যর্থনা কর্‌বো? চরণের ধূলো এক কণা দিন, মাথায় করে নিয়ে যাই। সমস্ত সারল্য আশীর্ব্বাদ-রূপে আমার মাথায় ঢলে পড়ুক। দেবতা, কত দিনের বাসনা যে পূর্ণ হ'ল! পথে দেবদর্শন হ'ল, গিয়ে বল্‌বো। আপনাকে যে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে না। যত স্বামীজী এসেছেন, তার সকলের চেয়ে বড় স্বামীজী এসেছেন।"

বরিশালের একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পত্র পাইলে বা তাঁহার প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করিলে রজনীকান্ত ভাবে বিগলিত হইয়া যাইতেন। তাই রোজনাম্‌চার মধ্যে অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিতে দেখি,—

"অশ্বিনীবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখেছেন, আমি আমার স্ত্রীকে বলে রেখেছি যে, যখন মরি তখন তুলসীর পাতা যেমন গায়ে দেয়, তেমনি ঐ পত্রখানা আমার গায়ে বেঁধে দিও। কি লোক! নিজের শরীর অসুস্থ, সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা। কেবল আমার কথা সমস্ত পত্রে। যাঁহারা মহানুভব, তাঁহারা পরের জন্য জীবিত থাকেন। বরিশাল গিয়ে যে আনন্দ ক'রে এসেছিলাম, তা মনে ক'রে কষ্ট হয়। মাতানো বরিশাল আমি মাতাব কি? ও যে একজনই পাগল ক'রে রেখেছে। তার কাছে আবার বাঙ্গালায় লোক আছে কোথায়? একটা এই আক্ষেপ র'য়ে গেল, একবার অশ্বিনী দত্তের মত রাজর্ষি মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হ'ল না।"

অনেকের মত এই দীন গ্রন্থকারও রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে যাইত এবং অনেকের মত রজনীকান্তের সাহিত্য-সাধনা ও ঈশ্বর-নির্ভরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। রজনীকান্তের "দয়ার বিচার" (আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে, গর্ব্ব করিতে চুর) গানখানি শুনিয়া আমার হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহারই আঘাতে বিহ্বল হইয়া "ন্যায়ের বিচার" নামে নিম্নলিখিত গানখানি রচনা করিয়া আমি রজনীকান্তকে উপহার দিই,—

বিপদের বোঝা চাপিয়ে মাথায় আপনি সে ছুটে এসেছে।

(ও সে পিছু পিছু ছুটে এসেছে)

(মজা দেখ্‌তে ছুটে এসেছে)

(রইতে না পেরে পিছু পিছু ছুটে এসেছে)

ব্যথা দিয়ে ব্যথাহারী দয়াময় তোমারে যে ভাল বেসেছে।

আজি, যত দুঃখ তাপ অভাব দৈন্য

ঘিরেছে তোমারে করিতে ধন্য,

তোমার, স্বাস্থ্য সুখ আশা (তাই) সকল হরণ ক'রেছে।

তৃণাদপি নীচু করিতে তোমায়, গর্ব্ব কাড়িয়া লয়েছে ;

সব চুরি ক'রে চতুর সে চোর আপনি যে ধরা দিয়েছে।

(অ-ধরা নামটি ঘুচাইয়ে আজ নিজে এসে ধরা দিয়েছে)

'কাঙ্গাল করিয়া' কাঙ্গাল ঠাকুর কোলে তুলে তোমা নিয়েছে।

সজলনয়নে রজনীকান্ত গানখানি পাঠ করিয়া লিখিয়া জানাইলেন,—"চমৎকার হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ কর যেন, তোমার কথা সত্য হয়। গানটার কি সুর হবে—কীর্ত্তনাঙ্গ ? সেই ভাল।"

কবির শোচনীয় অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া ঐতিহাসিকের হৃদয়ও বিগলিত হইয়া কবিত্বমন্দাকিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। রজনীকান্তের চিরসুহৃদ্ অক্ষয়কুমারের হৃদয়ভেদী কাতরতা ও মঙ্গল-কামনা কবিতার ভাষায় ফুটিয়া উঠিল। নববর্ষার সহস্রধারা যেমন রৌদ্রতপ্ত ধরণীবক্ষকে শীতল করিয়া দেয়, তেমনি অক্ষয়কুমারের এক একটি কবিতা কবির রোগক্ষতের উপর শীতল প্রলেপ প্রদান করিল।

প্রথমে অক্ষয়কুমার লিখিলেন,

"আমরা মায়ার জীব, কাঁদি অহরহ ;
কেন ছেড়ে চ'লে যাবে কিছু কাল রহ,—
কিছুকাল—দীর্ঘকাল—চিরকাল রহ,
হৃদয়ের প্রীতি, স্নেহ, আশীর্ব্বাদ লহ।
আকুল প্রার্থনাপূর্ণ বাঙ্গালার গেহ ;
দেবতা দিবেন বর, নাহিক সন্দেহ।"

কবিতা লিখিবার সময় অক্ষয়কুমার নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন, সমগ্র বঙ্গবাসীর হইয়া তিনি বলিতেছেন,—

"কিছুকাল—দীর্ঘকাল—চিরকাল রহ,
হৃদয়ের প্রীতি স্নেহ আশীর্ব্বাদ লহ।"

তারপর তাঁহার দ্বিতীয় পত্র। এ পত্র লিখিবার সময় রজনীকান্তের জীবনাশা একবারেই ছিল না, তাই অক্ষয়কুমার কবিকে পরলোকের উজ্জ্বল পথ দেখাইতেছেন,—

"চিরযাত্রি! মহাতীর্থ সম্মুখে তোমার,—
অনিন্দ্য আনন্দধাম, জরামৃত্যুহীন,
অক্ষয় অমৃত-রসে পূর্ণ চারিধার,—
পরীক্ষার পরপারে, ভূমানন্দে লীন।
সকল সন্তাপে শান্তি, পরাজয়ে জয়।
সকল সঙ্কটে মুক্তি, অমোঘ আশ্রয়॥
কল্যাণী অভয়া বাণী স্বর্গ নিরাময়।
অমৃতে অমর তুমি, বল জয় জয়॥"

তিনি সর্ব্বশেষে লিখিলেন,—

"কত প্রীতি কত আশা কত স্নেহ ভালবাসা
অনিমিষে চেয়ে আছে কাতর শিয়রে;
এখনি মঙ্গল-গান কেন হবে অবসান
আকাশে দেবতা আছে বরাভয় করে।
মৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্রে আহত-হৃদয়-যন্ত্রে
বাজিয়া উঠিছে গান নব নব রাগে;
টুটায়ে বাসনা বন্ধ নব প্রাণে নব ছন্দ
নাচিয়া উঠিছে বিশ্বে দেব অনুরাগে।

অনাহত অকুণ্ঠিত অকম্পিত গান
মৃত্যুমাঝে অমৃতের পরম সন্ধান ॥"

এ পত্র যখন রজনীকান্তের হস্তগত হইল, তখন তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর বড় বিলম্ব নাই,—সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কবিত্ব-শক্তি—তাহাও আর নাই, তবুও কবিতা-জননীর স্নেহের দুলাল হৃদয়ের কবিত্ব-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ক্ষীণ ও কম্পিত হস্তে লিখিলেন,—

একস্‌টেম্‌পোর পত্র পেয়ে হয়েছি অবাক্,
হাজার হ'লেও দাদা, মরা হাতি লাখ্।
তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা হ'ল না সফল,
—জীবন ফুরায়ে গেল, ভেঙ্গে যায় কল।
আরতো হ'ল না দেখা, কর আশীর্ব্বাদ—
এড়িয়ে সমস্ত দুঃখ বেদনা বিষাদ ;
বড় যে বাসিতে ভাল, শিখাইতে কত—
ছাপাল কবিতা তাই সে নব্যভারত।
বিদায় বিদায় ভাই ! চিরদিন তরে,
মুমূর্ষুর হিতাকাঙ্ক্ষা রেখ মনে ক'রে।
একান্ত নির্ভর আমি ক'রেছি দয়ালে,
মারে সেই, রাখে সেই যা থাকে কপালে।
প্রীতি দিও তথাকার প্রিয় বন্ধুগণে
ভক্তি দিও তথাকার নমস্য সুজনে।

ঠিক এই সময়ে কাতরকণ্ঠে কুমার শরৎকুমার রজনীকান্তকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "সুস্থ শরীরে আপনার যে সৌভাগ্য ঘটে নাই

অসুস্থ শরীরে ঈশ্বর তাহা ঘটাবার অবকাশ দিলেন। লোকে এত দিন আপনার এত পরিশ্রমের ফলের যথার্থ স্বাদ পাইতে লাগিল, ভগবানের অভিপ্রায় বুঝা কঠিন। আজ লোকে বুঝিতেছে, আমাদের রাজসাহীর কবি সমগ্র বঙ্গের কবি। আপনার এই গৌরবে আজ সমগ্র রাজসাহী গৌরবান্বিত। ভগবান্ কি আপনাকে পুনঃ রাজসাহীতে ফিরাইয়া দিবেন না? আমরা রাজসাহীর কবিকে সমগ্র বঙ্গের কবিরূপে ফিরিয়া পাইয়া ধন্য হইব।"

দেশবাসীর নিকট হইতে এইরূপ অজস্রভাবে সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া, ক্রমে রজনীকান্ত কেমন যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাই তাঁহাকে বিরক্তির সহিত লিখিতে দেখি,—"মনে হয় যে, বিধাতা আমাকে সপরিবারে উপবাস দিন, তাও ভাল, তথাপি লোকের দয়ার উপর এত আঘাত দেওয়া উচিত নয়।" কান্ত-গুণমুগ্ধ দেশবাসী অযাচিতভাবে, অকুণ্ঠিতচিত্তে, হাসিমুখে তাঁহার সেবা ও সাহায্য করিতেছিল, তাহাতে ত তাহারা একটুও আঘাত অনুভব করে নাই, বরং এতদিনের একটা জাতিগত কলঙ্ক ক্ষালন করিবার সুযোগ পাইয়াছে ভাবিয়া তাহারা আনন্দিত হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের সে আনন্দ স্থায়ী হইল কৈ? সারা বাঙ্গালার সমবেত চেষ্টা ও সাহায্য ব্যর্থ হইল,—বাঙ্গালী আর ত রজনীকান্তকে রোগমুক্ত করিতে পারিল না। কেন হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে মৃত্যুশয্যাশায়ী রজনীকান্ত আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। "ডাক্তার ডাক্‌চ,—ডাক্তার কি কর্‌বে? বাপ যখন তার ছেলেকে টানে, তখন জগতের এমন কি সাধ্য আছে যে, তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে।" অধম আমরা—ভক্তের ভক্তিভরা এই উক্তি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, তাই চোখের জলে আমাদের বুক ভাসিয়া যায়।

কবি রজনীকান্ত

(হাসপাতালে—মৃত্যুর পনের দিন পূর্ব্বে

দশম পরিচ্ছেদ

মহাপ্রয়াণ

প্রায় আট মাস কাল ক্রূর ব্যাধির অবিশ্রান্ত যন্ত্রণায় রজনীকান্তের জীবন-দীপ প্রায় নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল। ক্রমে অবস্থা এমনি হইল যে, একটু বাতাসের ভরও যেন আর তাঁহার দেহে সহ্য হয় না। শরীর দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হইয়াছে, দুরারোগ্য ব্যাধির তাড়নায় কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে—আর কোনও মতে, কোন চিকিৎসায় রজনীকান্তকে রক্ষা করা যায় না।

ক্রমে যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি হইল যে, রজনীকান্ত যেন আর সহ্য করিতে পারেন না। দয়ালের কাছে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি লিখিলেন,—"আমাকে আস্ত রাখ্‌ল' না। কেটে কুচো কুচো ক'র্‌লে। কেন একটু প্রাণ রাখা? এখন যেতে চাই। এই দেহ গেলে ত এত কষ্ট হবে না, হেমেন্? দেহ গেলে, কোথাকার ব্যথা—মন বা আত্মা অনুভব কর্‌বে? ভাই রে, আমি heart fail ক'রে (হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে) মরি, একটু শীঘ্র মরি, একটু শীঘ্র মরি, তোরা যদি বন্ধু হ'স্ তবে তাই ক'রে দে। না খেয়ে, কি হঠাৎ শ্বাস আট্‌কে মরা—তার চেয়ে ওই ভাল। আর এই জড়কে বাঁচিয়ে কি হবে, ভাই রে? আমাকে শীঘ্র যেতে দে, তারি যে পথ থাকে তাই কর্। অকর্ম্মা ঘোড়াগুলোকে গুলি ক'রে মারে, তাই কর্। আমি বুক পেতে দিচ্ছি। সেখানে একজন আছে, সে আমার নিতান্ত আপনার, তাঁর কাছে চ'লে যাই।"

শেষ অবস্থায় রজনীকান্তকে একজন সন্ন্যাসীর ঔষধ সেবন করান হয়।—কালীঘাটের একজন প্রসিদ্ধ গ্রহাচার্য্য তাঁহার আরোগ্য-কামনায় স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ দ্রুত-গতিতে বাড়িতেই লাগিল। যন্ত্রণার উপশমের জন্য এই সময় রজনী-কান্তকে দিনে প্রায় চার পাঁচ বার করিয়া 'ইন্‌জেক্‌সন্‌' দেওয়া হইত। কিন্তু ইন্‌জেক্‌সনের ফলও আর স্থায়ী হইত না—যন্ত্রণা লাঘব করিবার শক্তিও যেন উহার কমিয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজগণের উত্তেজক ঔষধ-সমূহ প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গেল। বিধাতার বিধানের কাছে মানুষের শত চেষ্টা পরাজিত হইল।

বিষাদের কাল-ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। রজনীকান্তের বৃদ্ধা জননী, পতিগতপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, পিতৃবৎসল পুত্রকন্যাগণ, সেবাপরায়ণ বন্ধুবর্গ—সকলেরই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইতে লাগিল। সকলেই সদাই সন্ত্রস্ত ও সশঙ্ক—যেন কখন কি হয়!—নিষ্ঠুর কাল কখন আসিয়া তাঁহাদের অলক্ষিতে, তাঁহাদের বড় আদরের রজনীকান্তের দেহ হইতে প্রাণ-পুষ্পটিকে ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে!

অনন্তের তীরে দাঁড়াইয়া রজনীকান্তকে লিখিতে দেখি,—"হে আমার মঙ্গলকর্ত্তা!—আমার পরম বন্ধু, তোমার জয় হউক!" পরপারের যাত্রী, যাত্রা আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহারই জয় ঘোষণা আরম্ভ করিলেন—অন্তপারের সেই অভয়-নগরে পাড়ি দিবার জন্য—তাঁহার দয়ালের কাছে পৌঁছিবার জন্য পারের কড়ি সম্বল করিয়া লইলেন। রজনীকান্ত জানিতেন, সেই দয়াল ছাড়া তাঁহার আর কোন গতি নাই, আর কেহ তাঁহার আপনার নাই, আর কেহ তাঁহাকে তাঁহার 'নিজ হাতে গড়া' বিপদ্‌-সমুদ্রের মাঝে কোলে করিয়া বসিয়া থাকে না। চন্দন-চর্চ্চিত ভক্তি-পুষ্পে অর্ঘ্য

সাজাইয়া তাঁহার দয়ালের চরণে উপহার দিতে দিতে তিনি কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান্, শীঘ্র নাও। শীঘ্র তোমার কাছে ডেকে নাও, তোমার কোলে ডেকে নাও। আর ত পারি না দয়াল!"

পতির এই অরুন্তুদ যন্ত্রণা দেখিয়া সাধ্বী পত্নীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; মরণোন্মুখ পতির আসন্ন অবস্থা বুঝিয়া মর্ম্মভেদী কাতরকণ্ঠে তিনি পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?" অকম্পিতহস্তে রজনীকান্ত উত্তর লিখিলেন,—

"আমাকে দয়াল ডাক্‌চে, তাই আমি যাচ্ছি।"

২৪এ ভাদ্র, শুক্রবার রাত্রিতে তিনি একবার কি দুইবার 'সুপ্' পান করেন। এই আহারই তাঁহার শেষ আহার। শনিবার হইতে তাঁহার আহার বন্ধ হইয়া যায়। কণ্ঠনালী দিয়া একবিন্দু জলও গ্রহণের শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। রোগের প্রারম্ভে তিনি একদিন লিখিয়াছিলেন,—"আমার বোধ হয় আহারের সমস্ত আয়োজন সম্মুখে নিয়ে আমি অনাহারে মর্‌ব।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল—সত্য সত্যই আহার বন্ধ করিয়া নিষ্ঠুর কাল তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিবার আয়োজন করিল।

যথার্থই আহার্য্য সম্মুখে উপস্থিত, কান্ত ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর, কিন্তু গলাধঃকরণ করিবার কোন উপায় নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, সুশীতল জল সম্মুখে আনা হইল—কিন্তু পান করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে! ক্রমে কান্তের আহার-নালী একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে প্রাণরক্ষার জন্য জলীয় আকারে আহার্য্য রজনীকান্তের পাকস্থলীতে প্রবেশ করান হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ

কোন ফল হইল না। ক্ষুধায় ও পিপাসায় তিনি আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিলেন। তখন আর তাঁহার লিখিবার সামর্থ্য নাই। শুক্রবার হইতেই তাঁহার লেখা বন্ধ হইয়া গেল—মনোভাব জানাইবার যে একমাত্র উপায়—তাহাও লুপ্ত হইল! এই সময় তিনি কেবল নিজের ডান হাতখানি মুখে স্পর্শ করাইয়া জানাইতে লাগিলেন—দারুণ পিপাসা।

রবিবার সকাল হইতে ক্ষুধার যাতনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। একবার উদরের উপর তাঁহার শীর্ণ হাতখানি রাখেন, আবার পরক্ষণেই উহা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া ইঙ্গিতে পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেন। মুমূর্ষু রজনীকান্ত নীরব-ভাষায় যেন বলিতে লাগিলেন—"পেটে ক্ষুধা, কিন্তু খাবার ক্ষমতা নাই, দয়াল আমার সে ক্ষমতা হরণ করিয়া লইয়াছেন।"

তাঁহার আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবর্গ তখন আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় সন্ত্রস্ত। তাঁহাদের সে সময়ের অবস্থা অবর্ণনীয়। চোখের সামনে রজনীকান্তের সে অবস্থা আর দেখা যায় না!—প্রাণ বাহির হইয়া আসে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়,—বাক্যহারা, কণ্ঠহারা কবির সঙ্গে সকলেরই কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। সমস্তই নীরব ও নিস্তব্ধ!

সোমবার রজনীকান্তের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। রাত্রিতে যাতনায়—গায়ের জ্বালায় রজনীকান্ত এত কাতর হইয়া উঠিলেন যে, তিনি ছুটিয়া বাহিরে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু হায়! চলচ্ছক্তি-রহিত, ক্ষীণ, দুর্ব্বল রজনীকান্তের তখন উঠিবার শক্তি কোথায়? জীর্ণ ও কঙ্কালসার দেহকেও বহন করিবার শক্তি তখন তাঁহার স্ফীত পদদ্বয়ে আর নাই।

মঙ্গলবার সকালে রজনীকান্ত একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন সকলেই লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার শরীরে যেন অবসাদের ভাব আসি-

য়াছে। সকালে ৭টা ও ৮টার সময় উপর্য্যুপরি 'ইনজেকসন' দেওয়া হইল; দশটার সময় তাঁহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়া পড়ায়, আবার ইন্‌জেকসন দেওয়া হইল। মধ্যাহ্নে তিনি কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তিনি বিছানায় আর শুইয়া থাকিতে চাহেন না। সকলে বুঝিল আর দেরী নাই— রজনীকান্তের 'শেষ ডাক' আসিয়াছে—

"শেষ আজ সব গান ওরে গানহারা পাখী,
অশেষ গানের দেশে করে তোমা ডাকাডাকি।"

রজনীকান্ত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। পিপাসায় প্রাণ যায়। মুখ নাড়িয়া কত রকমে কান্ত তাঁহার দারুণ পিপাসার কথা ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিলেন। হায় বিধাতা, তুমি কি নিষ্ঠুর! সংসারের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করিয়া যে তোমার অভয়চরণে শরণ লইবার জন্য মহাযাত্রা করিয়াছে, যাত্রার পূর্ব্বে নিদারুণ পিপাসায় এক বিন্দু জলও তাহাকে পান করিতে দিলে না! সত্য সত্যই তাহাকে 'সকল রকমে কাঙ্গাল' করিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইলে! তাহার সুখ, সম্পদ্, আশা, ভরসা, স্বাস্থ্য, আহার, এমন কি তৃষ্ণার জলটুকুও হরণ করিয়া লইয়া তবে তাহাকে আশ্রয় দান করিলে! এ কি লীলা লীলাময়!

রাত্রি আটটা বাজিল, তখনও রজনীকান্তের বেশ জ্ঞান রহিয়াছে, অল্পে অল্পে তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইতেছে। কিন্তু একি! পনর মিনিট পরে দেখা গেল, নাড়ী পাওয়া যায় না! আটটা পঁচিশ মিনিটের সময় রজনীকান্তের শ্বাসটান আরম্ভ হইল। তারপর? তারপর সাড়ে আটটার সময় সব ফুরাইল! ভাবময়, স্নেহময়, কৌতুকময়, হাস্যময়, সঙ্গীতময় রজনীকান্ত চারিদিনের অনাহারে নির্জ্জীব অবস্থায় ইহজগৎ হইতে বিদায়

লইলেন ! অকালে—মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা জননী*, গুণবতী সহধর্ম্মিণী, চারি পুত্র (শচীন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, শৈলেন্দ্রনাথ) এবং তিনটি কন্যাকে (শান্তিবালা, প্রীতিবালা ও তৃপ্তিবালা) অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া কান্তের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল। হাসাইয়া যাহার পরিচয়, কাঁদাইয়া সে চলিয়া গেল ! মায়ের আনন্দ-দুলাল আনন্দময়ী মায়ের কোলে চির-শান্তি লাভ করিল !

আনন্দের যে নিত্য-নিকেতনে উপস্থিত হইবার জন্য রোগ-শয্যায় পড়িয়া তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, হৃদয়ের অতৃপ্ত পিপাসা মিটাইবার জন্য বাক্যহারা কবি কবিতার মধ্য দিয়া—ভাষার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ আটমাস কাল যে মর্ম্মকাতরতা ব্যক্ত করিতেছিলেন, নীরবে নয়নধারায় বক্ষঃতল সিক্ত করিয়া শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে যে অকুণ্ঠিত 'আত্মনিবেদন' জানাইতেছিলেন,—আজ সে সমস্ত সার্থক হইল ! মৃত্যুযন্ত্রণা-জয়ী, অমর কবি কীর্ত্তির অক্ষয় কিরীট ধারণ করিয়া মহালোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন ! বঙ্গে রজনীকান্তের মধুমাখা বীণার অমৃত-ঝঙ্কার চিরতরে থামিয়া গেল ! কান্তকবির প্রতিভার কণক-কিরণে ভারতীর মন্দির-প্রাঙ্গণ সবেমাত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু অকালে কাল-মেঘে সেই প্রতিভার জ্যোতিঃ চিরতমসাবৃত হইল ! উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর চাঁদের আলো খেলা করিতে লাগিল, কিন্তু আমাদের বুকের ভিতর আঁধার—আঁধার—আঁধার হইয়া গেল !

এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে হাসপাতালে বহু লোক

---

* রজনীকান্তের ন্যায় একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত সন্তানকে হারাইয়া মনোমোহিনী দেবী বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ১৩১৭ সালের ৩রা কার্ত্তিক (রজনীকান্তের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে) কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আসিয়া সমবেত হইল। ভক্ত কবির পূতদেহ ফুল দিয়া সাজান হইল, তাঁহাকে ধীরে ধীরে 'কটেজের' বাহিরে লইয়া আসা হইল। মেঘমুক্ত শারদাকাশে দশমীর চাঁদ হাসিতেছিল, আর রজনীকান্তের সেই পুষ্পদাম-সজ্জিত দেহের উপর নিজের রজতকিরণ অজস্রধারে বর্ষণ করিয়া যেন বলিতেছিল —"রোগের জ্বালায় বড় জ্বলিয়াছ, পিপাসায় তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সন্তাপহারিণী পূততোয়া ভাগিরথীর কোলে যাইতেছ,—যাও, তার পূর্ব্বে এস কবি, তোমার এ রোগদগ্ধ শরীরের উপর আমার স্নিগ্ধ কিরণ মাখাইয়া দিই।"

বহু দিন পূর্ব্বে একদিন রজনীকান্ত স্বল্লকণ্ঠে যে গান গাহিয়া শত শত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যে গানের প্রতি মূর্চ্ছনায় নব নব উন্মাদনার সৃষ্টি হইত, সেই মধুর প্রাণ-স্পর্শী গান—

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল-নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !
কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হ'বে প্রাণ,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে !
কবে, ভবের সুখ-দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,—
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

গাহিয়া রজনীকান্তকে লইয়া সকলে শ্মশানে যাত্রা করিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। কলিকাতা নগরীর বিরাট্ জন-কোলাহল কমিয়া আসিলেও, তখনও একেবারে থামিয়া যায় নাই। শত কণ্ঠের করুণ ঝঙ্কার কলিকাতার বিশাল রাজপথকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল,—

"শতকণ্ঠে উৎসারিয়া সঙ্গীতের দিব্য সুধা-ধারা
করি হরিধ্বনি,
শ্মশানের মুক্ত-বক্ষে রাখিল সে অমূল্য-সম্ভার
বহি ল'য়ে আনি।"

সব শেষ হইল,—সব ফুরাইয়া গেল! সংসারের তৃষিত মরু ছাড়িয়া, রসময়ের 'রসালনন্দনে'র স্নিগ্ধ ছায়ায় 'তাপিত চিত' জুড়াইবার জন্য, হে কবি! তুমি একদিন ব্যাকুল হইয়াছিলে—তাই তোমারই ভক্তগণ তোমার বর-দেহ পুষ্পমাল্য-চন্দনে ভূষিত করিয়া তোমার চির-বাঞ্ছিত 'রসালনন্দনে'র পথ 'নন্দিত' করিয়া দিল।

তুমি ত যাও নাই, তোমার ত শেষ হয় নাই—এই যে তুমি আমাদের অন্তরের অন্তরে রহিয়াছ! তোমার কণ্ঠ-রবও ত নীরব হয় নাই,—যাহা 'কাণের ভিতর' বাজিত, আজ তাহা মর্ম্মের ভিতরে গিয়া কি অপূর্ব্ব মধুরসুরে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে! আজ তুমি, হে প্রিয় কবি,

"অন্তপার—তবু হের রঙ্গে চারিধার—
রজোহীন রজনীর জ্যোস্না-পারাবার!
সঙ্গীত থামিয়া যায়—রহে তার রেশ,
জীবন আলোকময়—কোথা তার শেষ!"

———

৩

বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে

"সেই ধন্য নরকুলে,

লোকে যারে নাহি ভুলে,

মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

— মধুসূদন।

বঙ্গবাসীর মনোমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবি রজনীকান্ত

হাস্যরসে

আমরা বাঙ্গালী। বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে হৃদয় ভরিয়া যায়, বাস্তবিকই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তবু স্পষ্টভাষায় বলিতে হইতেছে যে, বাঙ্গালীর স্মরণ-শক্তি,—বাঙ্গালীজাতির স্মরণ-শক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে,—ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। পুরাণের কথা ধরি না, ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিতেছি—সে সকল কথা মনে রাখিবার ক্ষমতা আমাদের একেবারেই নাই,—কাল যাহা হইয়া গিয়াছে, আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, সে দিন চক্ষুর সম্মুখে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, দুই দিন পরে তাহা বিস্মৃত হইতেছি; এটা আমাদের জাতির দোষ।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাসকে ভুলিয়া গিয়াছি, সমাজ-সংস্কারক রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দকে ভুলিয়া গিয়াছি, সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথিকে ভুলিয়া গিয়াছি, কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, বিহারীলালকে ভুলিয়া গিয়াছি, ধর্ম্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণপ্রসন্ন, শশধরকে ভুলিয়া গিয়াছি। আর কত নাম করিব? যাঁহাদের লইয়া বাঙ্গালীজাতি নব-ভাবে, নব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, যাঁহারা শিক্ষায় দীক্ষায়, আচারে ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সঙ্গীতে কবিতায়, ব্যাখ্যায় বিবৃতিতে বাঙ্গালীর জীবন নুতন-ভাবে, নূতন-ভঙ্গিতে, নূতন-ধরণে গঠন করিয়া নবযুগের বোধন করিয়া গিয়াছেন—আমরা বাঙ্গালী তাঁহাদের সকলকেই—সেই মনস্বী, তেজস্বী, বরেণ্য সকলকেই একে একে ভুলিতে বসিয়াছি,—দুঃখ হয় না?

আমাদের এই প্রখর স্মরণ-শক্তির পরিচয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে যেন কিছু বেশিমাত্রায় পাওয়া যায়। শেক্‌সপীয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়া গেলেন একজন, আর প্রজার নিকট খ্যাতি পাইলেন এবং রাজার নিকট খেতাব পাইলেন আর একজন। মধুর সুললিত সঙ্গীত রচনা করিলেন একজন, সেই গান প্রচারিত হইল, প্রসিদ্ধি লাভ করিল আর একজনের নামে। নাটক লিখিলেন একজন, সেই নাটক যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল স্পষ্টাক্ষরে অন্যের নাম পুস্তকের প্রচ্ছদপটে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে কি, এখন শুনিতেছি—"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী"—গানটি কোন ক্ষণজন্মা নিজের নামে চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 'পরিব্রাজক বলে চরণতলে লুটাই চির দিন-যামিনী'—এই শেষ চরণের ভণিতা তুলিয়া দিলেই আপদের শান্তি!

আর কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী যে গানের ভণিতায় 'পরিব্রাজক' লিখিতেন, তাহাই বা আজ কয়জন লোকে অবগত আছেন?

তাই যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বা ডি এল রায় 'হাসির গান' গাহিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বাঙ্গালী—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার গানে আত্মহারা হইয়াছিল, বিভোর হইয়াছিল, আনন্দে আটখানা হইয়াছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী—ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরাজদিগের দেখাদেখি ঘোরতর আত্মস্তর হইয়াছিল,—দুঃখবাদের 'গেল গেল' রবে, 'নেই নেই' ধ্বনিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল—পরস্পরের সহিত, প্রতিবেশীর সহিত, আত্মীয়-স্বজনের সহিত বাক্যালাপ করিতেই তাহার কুণ্ঠা বোধ হইত, তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত, লজ্জা বোধ হইত—হাসির গান গাহিবার বা শুনিবার বা স্মরণ রাখিবার তখন তাহার অবসর ছিল না, সে তখন গ্যানো পড়িয়া বৈজ্ঞানিক, কোমৎ-তন্ত্রের আলোচনা করিয়া নব তান্ত্রিক, মিল পড়িয়া দার্শনিক, শেক্‌সপীয়র পড়িয়া কবি—তখন সে হাস্যরসের ধার ধারে না, হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলে; কেবল—দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ—আর টাকা, টাকা, টাকা,—কেবল লাভ-লোকসানের খতিয়ান, আর জমা-খরচের কৈফিয়ৎ। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায় বলি,—"ঐ যে অভিনব 'কাসেলে' মর্ম্মর-হর্ম্ম্যতলে সোফাধিষ্ঠিত সট্‌কা-নল-হস্ত স্বয়ং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, আর এই যে কদমতলার পুকুরপাড়ে, ছিন্নবাস, শীর্ণবপু, জীর্ণপ্রাণ, তরগুদৃষ্টি দরিদ্র যুবা, উভয়ের অবস্থার মধ্যে সুমেরু কুমেরু ভেদ থাকিলেও, উভয়েই জানেন, তাঁহারা বড় দুঃখী অতি দুঃখী। কলেজে দুঃখ, কোর্টে দুঃখ, ট্রেণে দুঃখের আলাপ, নদীতীরে দুঃখের বিলাপ—দুঃখ নাই কোথায়? সকলই দুঃখ।—দুঃখ আর দুঃখ। শিক্ষিত বাঙ্গালী সকল অবিশ্বাস করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন দুঃখে।"

তাই যখন শিক্ষিত বাঙ্গালী দেখিল যে, ইংরাজি-শিক্ষিত ডি এল রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী ডি এল রায়, বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডি এল রায়, হ্যাটকোটবুটপরা ডি এল রায়, ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ডি এল রায় হাসির গান রচনা করিতেছেন, আর সভা-সমিতিতে, বৈঠক-খানার বৈঠকে, বন্ধুবান্ধবের মজ্‌লিসে স্বয়ং স্বরচিত হাসির গান নানা অঙ্গভঙ্গি-সহকারে সুললিতকণ্ঠে গাহিতেছেন,—তখন তাহারা অবাক্ হইয়া গেল, স্তম্ভিত হইয়া গেল—একেবারে 'হতভম্ব!' এ যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অবাক্ কাণ্ড।—তখন তাহাদের প্রাণ খুলিয়া হাসিবার ক্ষমতা নাই, হাততালি দিয়া বাহবা দিবারও শক্তি নাই।

ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের অশ্লীলতাশূন্য, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, স্বচ্ছ হাসির গান বাঙ্গালীকে—শিক্ষিত বাঙ্গালীকে হাসাইয়া, নাচাইয়া, মাতাইয়া তুলিল। "কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব" নাটকের কথা বাঙ্গালী বহু পূর্ব্বেই বিস্মৃত হইয়াছিল,—তাহার হাসির গানগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী ঈশ্বর গুপ্তকেও ভুলিতে বসিয়াছিল, তিনিও যে বহুতর হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বিস্মৃতি-সলিলে ভাসাইয়া দিয়াছিল—যে দুই একটি গান তখনও কোন রকমে মনে করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের পাশে বসিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না—উৎকট অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ অনুমিত হইল; প্যারীমোহন কবিরত্নের হাসির গান, পরিব্রাজকের হাসির গান,

"ষড়ানন ভাই রে, তোর কেন নবাবী এত!
তোর বাপ ভিখারী মা যোগিনী,
তোর পায়ে ঘোঁড়তোলা জুত!"

প্রভৃতি প্রাচীন হাসির গান, "বিঘোরে বেহারে চড়িনু একা,"

"মা, এবার ম'লে সাহেব হব ;
রাঙ্গাচুলে হ্যাট্ বসিয়ে পোড়া নেটিভ নাম ঘোচাব।
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব।
(আবার) কালো বদন দেখ্‌লে পরে 'ডার্কি' বোলে মুখ ফেরাব।"

এবং "গা তোল রে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারাণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
স্কাভেঞ্জারের গাড়ী নিয়ে যায় গাড়োয়ান।"

প্রভৃতি আধুনিক হাসির গান—সমস্ত হাসির গানই শিক্ষিত বাঙ্গালী ইতিপূর্ব্বে ভুলিয়া গিয়াছিল। হেমচন্দ্র হাসির গান লেখেন নাই, তাঁহার জাতীয়-সঙ্গীত তাঁহার ব্যঙ্গ্য-কবিতাকে চাপা দিয়াছিল,—তিনি "জাতীয়" কবি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র ব্যঙ্গ্য-রঙ্গ, রস-রসিকতার দিক্ দিয়া যান নাই। রবীন্দ্রনাথ রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত—তাঁহার ব্যঙ্গ্য-কবিতা,—তাঁহার 'বঙ্গবীর', তাঁহার 'হিং টিং ছট্' ব্যঙ্গ্য-কাব্য-সাহিত্যের অলঙ্কার, কিন্তু তিনি কখন হাসির গান লেখেন নাই। 'গানাৎ পরতরং নহি'—সঙ্গীত যে স্বর্গের সামগ্রী—তাহার সাধনা করিতে হয়, আরাধনা করিতে হয়,—পূজা করিতে হয়। সঙ্গীত ত হাসি-তামাসার বিষয় নয়, ব্যঙ্গ্য-রঙ্গের বস্তু নয়, ছেলেখেলার জিনিস নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ হাসির গান লেখেন নাই—একটিও নয়। তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়া তাঁহাকে মাথায় করিয়া নাচিয়াছিল।

তাহার পর, দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই হাসির গান লিখিলেন, রাজসাহীর রজনীকান্ত। দ্বিজেন্দ্র-ভক্তগণ বলিয়া উঠিলেন,—"রজনীকান্ত

রাজসাহীর ডি এল রায়।” সংবাদ-পত্রে, মাসিক পত্রিকায় এই উক্তির সমর্থন ও প্রতিবাদ হইয়াছিল। রজনীকান্তের ভক্তগণ—শিষ্য-গণ এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন, যেন ইহাতে রজনীকান্তকে খাটো করা হইয়াছে, আর দ্বিজেন্দ্রলালকে বাড়ানো হইয়াছে। আমরা এই উক্তির একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই। প্রথমে এই সম্বন্ধে দুইজন আধুনিক কবির মত উদ্ধৃত করিব। কবিশেখর কালি-দাস রায় লিখিয়াছেন,—“কেহ কেহ বলেন—ইঁহার (রজনীকান্তের) কৌতুক-সঙ্গীতগুলি দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনুকরণে' রচিত। অনুকরণের অর্থ যদি সুর বা ছন্দের অনুকরণ হয়—তাহা হইলে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু গ্রন্থের অন্তরস্থ অংশের সহিত কোন মিল নাই।......রজনীবাবুর রচনা দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনুকরণে ত নয়ই, পরন্তু রজনীবাবুর কৌতুক রচনা অধিকতর সদিচ্ছাপ্রণোদিত।” আর সুকবি রমণীমোহন ঘোষ লিখিয়াছেন,—“রজনীকান্তের হাসির গানে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাকে ‘রাজসাহীর ডি এল রায়’ বলিতেন। বস্তুতঃ বঙ্গসাহিত্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যতীত অন্য কোন কবি হাসির গান রচনায় তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রজনী-কান্তের কোন কোন হাসির গান রায়-কবির অনুসরণে রচিত থাকিলেও ঐ সকল রচনায় তাঁহার নিজস্ব যথেষ্ট আছে। তাঁহার রচনা ছায়া অথবা প্রতিধ্বনি মাত্র নহে। একজন প্রবীণ সমালোচক লিখিয়াছেন,—‘পরবর্ত্তী লেখকদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভাশালী লেখকদের কতকটা অনুবর্ত্তী হইতেই হইবে, ইহা অপরিহার্য্য। তাহাতে ক্ষমতার অভাব বুঝায় না,—পৌর্ব্বাপর্য্য মাত্র বুঝায়।’ রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্ত্তী এই হিসাবেই তাঁহাকে হাস্যরসের রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্ত্তী বলা যাইতে পারে।”

আমরা কিন্তু উভয় কবি-সমালোচকেরই উক্তি সমর্থন করিতে পারি না,—আমরা অন্য রকম বুঝি। স্পষ্ট করিয়াই বলি—আমরা বুঝি, 'রজনীকান্ত রাজসাহীর ডি এল রায়' বলিলে ডি এল রায়কে খেলো করা হয়, খাটো করা হয়। যাঁহারা ঐ কথা বলেন, তাঁহারা রায় মহাশয়ের ভক্ত হইলেও, তাঁহারা গোঁড়ামী করিতে গিয়া তাঁহাকে খেলো করিয়া বসেন। যিনি ডি এল রায়ের প্রকৃত ভক্ত অর্থাৎ যিনি ডি এল রায়কে বুঝিয়াছেন, ভালরূপে তাঁহার কাব্যালোচনা করিয়াছেন, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাটকগুলি পাঠ করিয়াছেন—তিনি কখনই ঐ কথা বলিতে পারেন না। ঐ কথা ভণ্ড ভক্তের উক্তি—যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত, না জানিয়া সমালোচক—তাঁহাদের উক্তি।

দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার অনুকরণে বলি—দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব—সাজাহান, দুর্গাদাস ও রাণাপ্রতাপে,—বিরহ, পাষাণী ও কল্কি অবতারে,—সীতা-কাব্যে ও কালিদাসের সমালোচনায়, —দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব আমার দেশে, আমার জন্মভূমিতে ও ভারতবর্ষে,—দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, অনাবিল হাস্যরসের অবতারণায়—যাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বটতলা হইতে সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া বাবুর বৈটকখানার আসরে এবং ঠাকুরঘরে নৈবেদ্যের পার্শ্বে সগর্ব্বে বসাইয়াছিলেন। এক হাসির গান ও স্বদেশ-সঙ্গীত ভিন্ন এই সকল কোন বিষয়েই ত রজনীকান্তের গৌরবের কিছুই নাই। তবে কিসে 'রজনীকান্ত রাজসাহীর ডি এল রায়?' আবার রজনীকান্তের যাহা আছে—তাহা ত ডি এল রায়ের সাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। রজনীকান্তের গৌরব—তত্ত্ব-সঙ্গীতে, বৈরাগ্য-সঙ্গীতে ও সাধন-সঙ্গীতে,—ডি এল রায় সে পথ কখন মাড়ান নাই। তবে কিরূপে 'রজনীকান্ত রাজসাহীর ডি এল রায়?' না, ও ভাবে কোন দুইজন ব্যক্তিকে

সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না—দুইজন কবি ত কখনই একশ্রেণীর হইতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার শেলী, মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক পরিচয়ের ন্যায় 'রজনীকান্ত রাজসাহীর ডি এল রায়' অবিবেচকের উক্তি।

আর একটি কথা। অনেকে বলেন, রজনীকান্ত হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের শিষ্য। ঠিক কথা। আমরাও এ কথা স্বীকার করি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করিবার পর কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রজনীকান্তের পরিচয় হয়। দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত মুগ্ধ হন। তাহার পর হইতেই তিনি হাসির গান লিখিতে আরম্ভ করেন। মুগ্ধ হইবার যে যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তখন যৌবনের ভরা জুয়ারে আবাল্য-সঙ্গীতসেবী রজনীকান্তের বুকের ভিতর সঙ্গীত থৈ থৈ করিতেছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাহাতে বান ডাকাইল। রজনীকান্ত দেখিলেন,—হাসির গানে শ্রোতা মোহিত হয়,—অনায়াসে, অল্প পরিশ্রমে লোককে হাসাইতে পারা যায়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হাসির গান উপভোগ করে, তাহাতে আনন্দ পায়—মাতিয়া উঠে। কাজেই যৌবনে রজনীকান্ত হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের একান্ত অনুগত শিষ্য। এ শিষ্যত্বে অগৌরব ত নাই, অবমাননাও হয় না। রজনীকান্ত স্বয়ং বিনয়ের অবতার ছিলেন, তিনি এই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন, আর আমরা এ কথা লিখিয়া যে রজনীকান্তের অগৌরব করিলাম,—এমনও মনে করি না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ফাদার লাফোঁর শিষ্য, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজীবন-সাহিত্য-সেবক অক্ষয়চন্দ্রের শিষ্য। কিন্তু

অক্ষয়চন্দ্র স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—"রামেন্দ্রসুন্দর এক সময়ে আমার সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন, কিন্তু 'বয়সেতে বিজ্ঞ নয়—বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে,' —তিনি জ্ঞানবলে গরীয়ান্,—সুতরাং আমার গুরু।" তাই বলিতে-ছিলাম, হাসির গানে রজনীকান্তকে দ্বিজেন্দ্রলালের শিষ্য বলিলে রজনীকান্তের অগৌরব করা হয় না; তবে আমরা দেখিতে পাই, এই হাসির গানে অনেক স্থলে শিষ্য গুরুকে হারাইয়া দিয়াছেন,— 'জ্ঞানবলে গরীয়ান্' হইয়া, অধিকতর সূক্ষ্মদৃষ্টি-সাহায্যে, বিদ্রূপবাণে ও কৌতুকের কশাঘাতে তিনি গুরুকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং গুরুর অপেক্ষা অধিকতর গৌরবলাভ করিয়াছেন। শিষ্যের নিকট গুরুর পরাজয়— সে ত গুরুর পরম গৌরবের কথা। তবু অতি ভয়ে ভয়ে, অতি সন্তর্পণে এই সকল কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। এখন বাঙ্গালার সাহিত্য-রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা, স্ব-স্ব-প্রধান ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; এখন আমরা সকলেই ঐতিহাসিক, সকলেই প্রত্নতাত্ত্বিক, সকলেই দার্শনিক, সকলেই কবি, সকলেই সম্পাদক। আর সমালোচক?—সে কথার উত্থাপন না করিলেই ভাল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র গিয়াছেন, অক্ষয়চন্দ্র গিয়াছেন, চন্দ্রনাথ গিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ গিয়াছেন, বিশারদ গিয়াছেন, সমাজপতি গিয়াছেন,—চন্দ্রশেখর যাওয়ার সামিল হইয়াছেন। কাজেই হাসিও পায়, কান্নাও আসে,—আর ভবানন্দের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে,—"আরে ম'ল! স্বব্যে—সে হ'ল সেনাপতি! সূয্যিগুহ—সুয্যো—যাকে আমরা ক্যাব্‌লা ব'লতুম! যা বাবা, সব মাটি!" রজনীকান্তের হাসির গান ও কবিতার আলোচনা করিতে বসিয়া রসচূড়ামণি কান্‌হাইয়ালাল দ্বিজেন্দ্রলালকে বাদ দেওয়াও যায় না, আবার রায়-কবি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে গেলেই সমালোচক ফোঁস্ করিয়া উঠেন। আমাদের উভয় সঙ্কট,—

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ,—
সীতার হরণে যেন মারীচ-কুরঙ্গ।"

হাস্যরস-সৃষ্টিতে রজনীকান্ত বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু।" অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর গুপ্ত কেবল কেন? মনীষী মাত্রেই মেকির শত্রু। হেমবাবুও মেকির শত্রু। মেকির উপর কশাঘাত করিতে হেমবাবু ছাড়েন নাই। ...... তিনি সমানে গাড়ী চালাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর ডাইনে মেকি, বাঁয়ে 'হম্বগ্' উভয়ের পৃষ্ঠেই সমানে চাবুক চালাইয়াছেন।" বাস্তবিকই মনীষী মাত্রই মেকির শত্রু,—দ্বিজেন্দ্রলালও মেকির শত্রু, আর আমাদের রজনীকান্তও মেকির শত্রু। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত—এই চারিজন মনীষীর মধ্যে মেকির শত্রুতা সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ ঈশ্বর গুপ্ত অধিকাংশ স্থলেই পদ্যের ভিতর দিয়া কশাঘাত করিয়াছেন, গানের ভিতর দিয়া কম,—আর সেই সকল পদ্য তাঁহার সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইলেও, আধুনিক পাঠক অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া—সেগুলিকে তেমন আদর করেন না। হেমচন্দ্র একটিও হাসির গান লেখেন নাই। তাঁহার যাবতীয় ব্যঙ্গ ও কৌতুক কবিতার মধ্যে লিপিবদ্ধ। হেমচন্দ্রের কৌতুক-কবিতাগুলির মধ্যে অধিকাংশই তৎসাময়িক বিশেষ বিশেষ সামাজিক ঘটনা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল, সুতরাং এখনকার সময়ে, এখনকার সমাজে সে সকলের আর তেমন কদর নাই। 'টেম্পল চাচা' কে ছিলেন তাহাই জানি না, মিউনিসিপল বিলের কথা, ইলবর্ট বিলের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই হেমচন্দ্রের রসাস্বাদ করিতে পারি না; 'মুখুয্যের বাক্যিবাৎ' উপাদেয় ব্যঙ্গ-কবিতা হইলেও—

"আমি স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হ'তে পারে,
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে।"

—ইহার শ্লেষ, ইহার দ্যোতনা বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর গুপ্তে "কেবল ঘোর ইয়ারকি।"—তিনি ঈশ্বরের নিকটে ইয়ারকি করিয়া বলিতেছেন,—

"তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হোলে কালা॥
কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম।
—তুমি হে, আমার বাবা, 'হাবা আত্মারাম'॥"

আবার পাঁটার সঙ্গে ইয়ারকি করিয়া বলিতেছেন,—

"এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়বংশ বোকা॥"

আর ঈশ্বর গুপ্তের হাতে নারী নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। পাঠক! "ভয়ানক শীত" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া দেখুন,—উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার উপায় নাই।

হেমচন্দ্রের আক্রোশ বা আক্রমণ অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তি-বিশেষের উপর—অনেক সময়েই personal attack, কেমন একটু বিদ্বেষপ্রসূত। তখনকার দিনে অনেকেই ব্যক্তি-বিশেষের উপর চাবুক চালাইতে ভাল বাসিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'ফতোয়া' দিয়া গিয়াছেন,—"ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ্যে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ।" কিন্তু অতি বিনীতভাবে বলিতেছি, বঙ্গ-সাহিত্যের সায়েন্‌সা খাঁদসার

এই ফতোয়া আমরা আভূমি কুর্নিশ করিয়া মানিয়া লইতে পারিলাম না। মার্শম্যান সাহেবকে (Marshman) লক্ষ্য করিয়া গুপ্ত-কবি যে "বাবাজান্ বুড়া শিবের স্তোত্র" লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে মাত্র চারিছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—পাঠ করিয়া দেখুন বিদ্বেষ-ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না।—

" 'ধর্ম্মতলা' ধর্ম্মহীন—গোহত্যার ধাম।
'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সেরূপ তব নাম॥
বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর।
'ফ্রেণ্ড' হ'য়ে ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি R (আর)॥" *

তাহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানের রাজা, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার গানে ও কবিতায় ব্যঙ্গ্য অপেক্ষা কৌতুক বেশি, মেকির উপর কশাঘাত অপেক্ষা তাহাকে লইয়া রসিকতা করার ভাবটা বেশি, কেবল হাসির জন্য লোককে হাসাইবার চেষ্টা অধিক,বেশির ভাগ ভাঁড়ামী বা fun বা রঙ্গ—humour বা satire কম।

"পুরাকালে ছিল শুনি,
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি—
আজানুলম্বিত জটা মেজাজ বেজায় চটা,
দাড়িগুলো ভারি কটা।"—

ইত্যাদি ধরণের পদ্য বা গান প্রচুর, আর সেই সকল পদ্যে ভাঁড়ামীই বেশি। দ্বিজেন্দ্রলালের চেষ্টা ছিল—কেবল লোককে হাসাইবার। তবে সমাজের ত্রুটি, বিচ্যুতি, ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়া তিনি স্থানে স্থানে ঘা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার তত বেশি লক্ষ্য ছিল না। আর

* Friendএর 'R' বাদ দিলে 'Fiend' থাকে। Fiend মানে শয়তান, দুশমন্।

তিনিও personal attackএর, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আক্রমণের ঝোঁক এড়াইতে পারেন নাই। তিনি শশধর ও হাক্সলির খিচুড়ি রাঁধিয়া গিয়াছেন,—

"আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
Of শশধর, Huxley and goose."

আর তাঁহার "শ্রীহরি গোস্বামী" (চূড়ামণির অভিশাপ) শ্রদ্ধাস্পদ শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপর আক্রমণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি 'হিং টিং ছট্' ব্যঙ্গ্য-কাব্যসাহিত্যের অলঙ্কার, কিন্তু সকলেই জানেন, ইহাও ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল।

রজনীকান্তের সমগ্র হাসির গান ও কবিতার মধ্যে কোথাও কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আক্রোশ বা আক্রমণ নাই। ইহা তাঁহার রস-রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব। বিনয়ের অবতার রজনীকান্ত, ভাবুক রজনীকান্ত, জনপ্রিয় রজনীকান্ত, সাধক রজনীকান্ত কখন কোন দলাদলির মধ্যে ছিলেন না, কখন কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে বা অবজ্ঞাভরে দেখেন নাই, কখন কাহাকেও ছোট বলিয়া, নীচ বলিয়া তাচ্ছীল্য করেন নাই। তিনি সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, আত্মজন ভাবিয়া স্নেহ করিতেন, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনগণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন, জ্ঞানগরীয় ব্যক্তিদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন—তাই রজনীকান্ত ছিলেন সকলের,—সকলের ছিলেন রজনীকান্ত। তাঁহাতে কোন সমাজ-বিশেষের পক্ষপাতিত্বজনক অন্য সমাজ সম্বন্ধে বিদ্বেষ ছিল না, তিনি কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন না,—সকল সমাজকে, সকল জাতিকে, সকল ধর্ম্মকে সমানভাবে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। আর তিনি ছিলেন—আধুনিক সাহিত্যিক দলাদলির—ঘোঁটের বাহিরে, সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র তাঁহার চরিত্রে কখন দেখি নাই। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে

ভালবাসিত, আপনার বলিয়া ভাবিত। তাই তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকেও দেখিয়াছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলালকেও দেখিয়াছিলাম, —সুরেশচন্দ্রকেও দেখিয়াছিলাম, কৃষ্ণকুমারকেও দেখিয়াছিলাম,— শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকেও দেখিয়াছিলাম, আবার বিদ্যালয়ের অপোগণ্ড ছাত্রমণ্ডলীকেও দেখিয়াছিলাম। এ হেন রজনীকান্তের লেখনীমুখে কখনই personal attack বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আক্রমণ বাহির হইতে পারে না। তিনি কখন কোনও ব্যক্তিকে কশাঘাত করেন নাই।

রজনীকান্তের আর একটি বিশেষত্বের কথা বলিতেছি। ইহা তাঁহার হাস্যকাব্যের বিশেষত্ব না হইলেও, ইহা হইতে হাস্যকাব্যে তাঁহার সংযমের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। আধুনিক হাস্যকাব্যে Parody বা বিকৃতানুকৃতি ব্যঙ্গ্য-কবিতা বা নকলের অভাব নাই। কে এই প্যারডি প্রথম বঙ্গ-সাহিত্যে চালাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না,—তবে এইটুকু বলিতে পারি যে তিনি যিনিই হউন, তিনি বঙ্গসাহিত্য-রসের কালাপাহাড়—হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে গিয়া ধিক্কারজনক বিকৃত বীভৎস-রসের আমদানী করিয়া গিয়াছেন—সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া সৌন্দর্য্যের স্থানে কদর্য্য-কুৎসিতকে স্থানদান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কোন কোন কুৎসিত কদাকার মূর্ত্তি দেখিলে মনে একটু ক্ষণিক হাসি আসে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদে ও ঘৃণায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। প্রস্ফুটিত-কুসুম-উদ্যান যদি কোন কারিগরের রচনা-নৈপুণ্যে বিকট বীভৎস শ্মশানে পরিণত হয়—তবে সে দৃশ্য দেখিয়া যে হাসিতে পারে হাসুক, আমরা কিন্তু হাসিতে পারি না, কাঁদিয়া ফেলি। হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ"—গভীর বিষাদময় করুণ-রসের কবিতা। রসরাজ অমৃতলালের হাতে পড়িয়া এই কবিতা—

"আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে।

জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,

জঠর-মাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে!" ইত্যাদি

বিকৃত হাস্য-রসাত্মক ব্যঙ্গ্যে পরিণত হইয়াছে। পড়িলে হাসি পায় না, দুঃখ হয়।

রবীন্দ্রনাথের সেই মধুর কীর্ত্তন—

"এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস!

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে ফিরে এস!

ওহে নিঠুর ফিরে এস, আমার করুণ-কোমল এস,

আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্ত সুন্দর ফিরে এস!"—

দ্বিজেন্দ্রলালের হস্তে কিরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছে দেখুন,—

"এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,

ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে,

ওহে দন্তমাণিক এসো হে;

এসো সরিষার-তৈল-স্নিগ্ধকান্তি, পমেটম চুলে এসো হে।

ওহে লম্পটবর এসো হে,

ওহে বক্কেশ্বর এসো হে;

ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক—ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে

* * *

ওহে অঙ্কল-দড়ি-বন্ধন গরু, গোয়ালেতে ফিরে এসো হে।"

আপনাদের হাসিতে ইচ্ছা হয়, হাসিতে পারেন,—আমরা অরসিক, ইহার রসিকতা 'পরিপাক' করিতে পারিলাম না। দুঃখ কিছু নাই, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার "জন্মভূমির" বিচিত্র প্যারডি শুনিয়া গিয়াছেন,—সেই "আমি এই আফিসে চাকরী যেন বজায় রেখে মরি।" দ্বিজেন্দ্র

লাল ইহার রহস্য 'পরিপাক' করিতে পারিয়াছিলেন, কিংবা ইহার মিষ্টরস অম্ল হইয়া বমন হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এইবার কবিশেখরের কীর্ত্তি দেখুন। ভগবৎ-কৃপা-বিশ্বাসী ভক্ত রজনীকান্তের সেই সর্ব্বজনপ্রিয় সঙ্গীত—

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি,—
পাব জীবনে, না হয় মরণে !
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকি-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে' না ল'বে গো,—
হ'য়ে, পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে, পারে ব'সে, 'পার কর' ব'লে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে ? ইত্যাদি

কবি কালিদাসের কলা-নৈপুণ্যে লাঞ্ছিত হইয়া বিকট বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে।—

"কেন বঞ্চিত হবো ভোজনে,
মোরা—কত আশা ক'রে, নিজ বাসা ছেড়ে,
খেতে—এসেছি এখানে ক'জনে।
ওগো—তাই যদি নাহি হবে গো,
এত কি গরজ বাড়ীতে তোমার
ছুটিয়া এসেছি কবে গো ?

হয়ে—ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে—দেখিব কি খাওয়া বন্ধ ?
তবে—তাড়াতাড়ি পাত কর ব'লে ডাক'
তব আত্মীয়-স্বজনে।" ইত্যাদি।

রজনীকান্তের "দীন ভক্ত" এই ভাবে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। আমরা কবিশেখর মহাশয়কে মহাকবি কালিদাসের প্রতি কর্ণাট-রাজপ্রিয়ার সেই সর্ব্বজনবিদিত উক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

রহস্যবিদ্ রবীন্দ্রনাথ কখনও প্যারডি রচনা করেন নাই। ইচ্ছা করিলে একটা কেন তিনি শতসহস্র প্যারডি লিখিতে পারিতেন,—কিন্তু তাহাতে রসের সৃষ্টি হয় না—রসের সংহার হয়, তাই তিনি এই রচনায় কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর রজনীকান্ত—তিনিও 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অবলম্বন করিয়াছিলেন,—কখনও কোন পদ্যকে বিকৃত করিয়া, তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া, তাহার রুধিরপানে অট্টহাস্য করেন নাই। ইহাই তাঁহার হাস্যকাব্যের সংযম। তিনি যে প্রকৃত রসজ্ঞ ও রসবিদ্ ছিলেন,—তাহা বুঝিতে পারি।

রজনীকান্তের হাস্যরসের বিশদভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, হাস্যরস বা ব্যঙ্গ্য ও রঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত রোজনামচা ইহাতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"—That splendid sort of comic with an exceptionally serious vein like the ফল্গুনদী। Comic element is not altogether useless in this world, provided it is covertly instructive."
(যে হাস্যরসের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অসামান্য গভীর ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট হাস্যরস। হাস্যরস কোন

প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশ-মূলক হয়, তাহা হইলে হাস্যরস ইহ জগতে কখনই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নয়।)

'বাণী,' 'কল্যাণী,' 'বিশ্রাম' এবং 'অভয়া'তে রজনীকান্ত বহুতর হাসির গান ও কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কবিতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম শ্রেণীর কথা আমরা এক্ষণে আলোচনা করিতেছি—সেই হাসির সহিত উপদেশ-মিশ্রিত গান। রজনীকান্তের তত্ত্ব ও বৈরাগ্য-সঙ্গীতসমূহে এইরূপ হাসির সহিত উপদেশের সুন্দর সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। অবশ্য রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কাঙ্গাল হরিনাথ প্রভৃতি অনেকে ঐ প্রকার সঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রজনীকান্ত-কৃত এইরূপ হাসির গানের তীব্রতা অধিকতর বলিয়া অনুমিত হয়,—অথচ তিনি কখন গুরুর আসনে উপবেশন করিয়া পাঠককে গুরুগম্ভীর বচনে উপদেশ দেন নাই,—উপদেশ যাহা দিয়াছেন—তাহা পাঠকের উপদেশ বলিয়াই বোধ হয় না—এমনি ঠারেঠোরে,—এমনি মুন্সিয়ানার সহিত তিনি সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা দুই চারি স্থল উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"শেষ দিনের" কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কবি বলিতেছেন,—

মল-মূত্রে, কফে, জ'ড়ে প'ড়ে রবে
এই সোণার শরীর পরিপুষ্ট।
"ধনে প্রাণে বিনাশ ক'রে গেলে" ব'লে,
কাঁদ্‌বেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ;
আর, আমরণ বৈধব্যের ক্লেশ ভেবে' পত্নী
কাঁদ্‌বেন পার্শ্ব-উপবিষ্ট।

পণ্ডিতেরা বল্‌বেন, "প্রায়শ্চিত্ত করাও,
একটু রক্ত হ'য়েছিল দুষ্ট ;
একটা গাভী এনে ত্বরা করাও বৈতরণী,
বাঁচা-মরা সব অদৃষ্ট !"

এই সঙ্গীত শুনিলে প্রকৃতই মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়—'তুমি আমায় এমন ক'রে ফেলে রেখে কোথায় গেলে গোও-ও'—বাঙ্গালার সেই চিরপরিচিত ক্রন্দনের সুর কাণে বাজিয়া উঠে! বাস্তবিকই মনে হয়—আমি গেলে পত্নী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিবেন—'আমার এমন দশা কেন ক'রে গেলে গোও-ও,' পুত্র কাঁদিবেন,—'ধনেপ্রাণে বিনাশ ক'রে গেলে'—সকলেই ত তাহার নিজের নিজের অবস্থা ভাবিয়া শোক করিবে—আমার জন্য ত কেহ শোক করিবে না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আমার মৃত্যুতে সন্তপ্ত না হইয়া, নিজের প্রাপ্য—নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝি ফস্‌কাইয়া যায় এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি প্রায়শ্চিত্ত করাইবার ব্যবস্থা দিবেন। এই ত সংসারের অবস্থা। কবি স্বল্প ভাষায়, অল্প কথায় শেষ দিনের ছবি চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন, কিন্তু ঐ কয় ছত্রই যথেষ্ট—ঐ কয় ছত্রেই সকল কথা পরিস্ফুট হইয়াছে ; ভণ্ডামীর উপর, স্বার্থপরতার উপর বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে,—পাঠক হাসিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন।

কবি কিন্তু পরক্ষণেই আবার "পরিণাম" চিন্তা করিতে পরামর্শ দিলেন,—সেই যখন

ব'স্‌বে ঘিরে মাগ্ ছেলে ;
ব'ল্‌বে, 'ব'লে যাও গো, কোন্ সিন্দুকে কি রেখে গেলে,'
শুন্‌বি 'টাকা', কাণে কেউ দিবে না তারক-ব্রহ্ম বাণীরে।

সেই এক কথা—টাকা, টাকা, টাকা। তুমি মর' তা'তে দুঃখ নাই,—কিন্তু কোথায় কি রেখে গেলে তা ব'লে যাও! কবি বলিতে-ছেন, ইহাতেও কি তোমার চৈতন্য হবে না? চৈতন্য একটু হইল বৈকি—আধুনিক শিক্ষিত কবি রজনীকান্তও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। ঐ কথাটা লিখিতে গিয়া তাঁহার লেখনী কাঁপিয়া উঠিল না? কি আশ্চর্য্য! রজনীকান্ত কি জানিতেন না যে, এখন 'মা' কথাটাও ঘোরতর অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে, ও কথাটা ত মুখে আনাই যায় না, তিনি লিখিলেন কি করিয়া?—শিক্ষিত নব্য বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, ক'দিন তাঁহাকে দেখেন নাই কেন? তিনি উত্তরে বলিবেন,— "কি ক'রে আসি বলুন—আমার 'মাদারে'র আর 'সিষ্টারে'র ভারি অসুখ।"

তাহার পর "ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে' লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন,—

আছ ত' বেশ মনের সুখে!
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুক্‌টি ঠুকে।
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আন্‌লে টাকা গাড়ি গাড়ি।
প্রেয়সীর গয়না-সাড়ী, হ'ল গেল লেঠা চুকে!

* * *

সবি টের পাবে দাদা, সে রাখ্‌ছে বেবাক টুকে;

* * *

এর মজা বুঝ্‌বে সে দিন, যে দিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে।

এই পদ্য পাঠ করিলে পাপীর মন, ভণ্ডের মন বিচলিত হয় না কি? তাহার বুকের ভিতর গুরু গুরু করিয়া উঠে না কি? ভণ্ডকে ভণ্ড বলিলে, চোরকে চোর বলিলে, তাহাদের রাগ হয় বটে—কিন্তু বলিবার মত

করিয়া বলিলে, মিষ্টকথায় বলিলে, মোলায়েম করিয়া বলিলে সে গোলাম হইয়া যায়, নিজের চরিত্র সংশোধন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়। রজনীকান্ত যখন চোরকে চোর বলিয়াছেন, ভণ্ডকে ভণ্ড বলিয়াছেন, আত্মগর্ব্বীকে 'হামবড়াই' বলিয়াছেন, তখন এইরূপই মিষ্টমুখে মোলায়েম করিয়া বলিয়াছেন। অঙ্কশায়িনীর সহোদরকেও চোখ রাঙ্গাইয়া 'দূস্ শ্যালা' বলিলে যে, সেও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঘুঁসি পাকাইয়া 'দূস্ শ্যালা' বলে, অথবা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে—এ কথাটা রজনীকান্ত ভালরূপই জানিতেন ও বুঝিতেন; তাই শ্যালাকে শাসাইতে হইলেও তিনি যেন মিষ্টমুখে বলিতেন,—"ওহে সম্বন্ধি, বলি ও বড়কুটুম, বলি ও দাদা! রোজ রোজ এত রাত ক'রে বাড়ী ফের কেন? ওটা ভাল নয়।"—এই ভাব। এই ভাবে কথা বলিলে, এইরূপ উপদেশ দিলে, তবে সে উপদেশে ফল হয়। রজনীকান্তের উপদেশ সর্ব্বত্রই এইরূপ, তাই সেগুলি ফলপ্রদ ও চিত্তরঞ্জক।

"হবে, হ'লে কায়া বদল" গানে সমাজের ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, স্বর্গ-নরক—দুইদিক্ দেখাইয়া কবি ভণ্ডের সম্মুখে দুইখানি ছবি পাশাপাশি ধরিয়াছেন; তাহাতেও যদি ভণ্ডের চক্ষু ফুটে।

যে পথে বিষয়ত্যাগী, প্রেম বিরাগী আস্‌ছে কাঁধে
ফেলে কম্বল!
সেই পথে টেড়ি কেটে, চেন ঝুলিয়ে যাচ্ছে হাতে
মদের বোতল!
ওরে, গীতাপাঠের সভায় কার কি ক'র্‌বে চুরি
ভাব্‌ছ কেবল;
কান্ত কয়, আর ব'লো না, আর হ'লো না, হবে হ'লে
কায়া বদল।

তাহার পর রজনীকান্ত "সাধনার ধনকে" অন্বেষণ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শ্যামার মত,
ডালা কুলো ধামার মত—যে পথে ঘাটে দেখ্‌তে পাবে?

*　　　*　　　*

সে কিরে মন, মুড়্‌কী মুড়ী—মণ্ডা জিলাপী কচুরী,
যে, তাম্র-খণ্ডে খরিদ হ'য়ে উদরস্থ হ'য়ে যাবে?

*　　　*　　　*

মন নিয়ে আয় কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ' তার অন্বেষণে,
প্রেম-নয়নে সঙ্গোপনে, দেখ্‌বে, যেমন দেখ্‌তে চাবে।

হাসিতে হাসিতে এবং হাসাইতে হাসাইতে, সোজা কথায় এবং সোজা ভাষায় এমন গুরুগম্ভীর উপদেশ,—সাধনার ধন লাভ করিবার জন্য আকুল হইয়া ব্যাকুল হইবার এরূপ ইঙ্গিত আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এইরূপ অনেক গানে রজনীকান্ত হাস্যরসের সহিত শান্ত-রস মিশাইয়া দিয়াছেন। এই সকল গানের মধ্য দিয়া সত্যই শান্ত-রসের বিমল, স্নিগ্ধ, শীতল স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ধীরে ধীরে চিরদিন প্রবাহিত হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রজনীকান্তের হাসির গান ও কবিতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম শ্রেণী—হাসির সহিত উপদেশ মিশ্রিত গানের কথা আমরা আলোচনা করিলাম। এই বার তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর—সমাজ-সম্পর্কীয় হাসির গান এবং বিশুদ্ধ আমোদের জন্য হাসির গানের কথা বলিব।

রজনীকান্তের রোজনামচা হইতে আর একটু অংশ উদ্ধৃত করি-

তেছি,—"আবার একটা চেষ্টা ছিল যে, Poetry (পদ্য) আর গানে সব class of readerদের (শ্রেণীর পাঠকদের) মনস্তুষ্টি ক'র্‌ব। এই জন্য average readerদের (সাধারণ পাঠকদের) জন্য Serio-comic (গম্ভীর রস ও হাস্যরসের সংমিশ্রণ) ক'রেছিলাম; একটু higher circleএর জন্য (শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য) serious (গম্ভীর) ক'রেছিলাম; আর একটু বিশুদ্ধ আমোদের জন্য Comic (রঙ্গ) ক'রেছিলাম।"

এই শেষোক্ত রঙ্গ-সঙ্গীত বা Comic songsকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করিয়া বুঝিতে চাই। কতকগুলিতে কেবল হাসির জন্য—বিশুদ্ধ আমোদের জন্য হাসাইবার চেষ্টা। অন্য সকলগুলিতে——দেশের, সমাজের এবং সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের ত্রুটি-বিচ্যুতি, গ্লানি-ভণ্ডামি, হাম্বাগিজম্‌-হাম্‌বড়াই, মেকি-ঝুটো, জাল-জুয়াচুরি প্রভৃতি ছোট-বড় সকল প্রকার ব্যভিচার ও কদাচারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই সকল দোষের প্রতি সমাজবাসী, তথা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রঙ্গ ও রসিকতা এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিবার চেষ্টা—সমাজ-সংস্কার করিবার প্রয়াস। এই চেষ্টা বা প্রয়াস যে সফল ও সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিতেই হইবে।

রজনীকান্তের হাসির গানের বিশেষত্ব—তিনি কখনও কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর আক্রমণ করেন নাই, বিদ্বেষভাবে ভরা কোন গান বা কবিতা লেখেন নাই, তীব্র কশাঘাত করিয়া কাহাকেও কাঁদাইয়া আনন্দ উপভোগ করেন নাই,—বরং শাসন করিবার জন্য, সৎপথে আনিবার জন্য তীব্র ভৎর্সনা করিতে গিয়া, তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিতে গিয়া, কাণ মলিয়া দিতে গিয়া—নিজেই অনেক স্থলে কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। এ কিসের ক্রন্দন জানেন? কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিয়াছেন, এ যেন—'বুক ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরম

বেদনা !' কোন সমালোচক কমলাকান্তের ভাবে বলিয়াছেন, এ যেন— 'হাসির ছলনা করে কাঁদি !' আমরা কিন্তু এই কান্নাকে একটু অন্য ভাবে দেখি ।—মাতা হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—সন্তান একান্ত নিরিবিলিতে গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, দ্রব্য-সম্ভার নষ্ট করিয়াছে,—অপচয় করিয়াছে ; আর্শি ভাঙ্গিয়াছে—সেটার কাচগুলা ভাঙ্গা-চুরা হইয়া মেজেতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিন্দূর-কৌটা খুলিয়া খানিকটা সিন্দূর চারিদিকে ছড়াইয়াছে, আর খানিকটা 'আপনার নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিয়াছে.' বিছানার উপর দোয়াত উপুড় করিয়া দিয়াছে,—শাদা চাদর কালীতে ভাসিতেছে, খানিকটা কালী হাতে ও মুখে মাখিয়াছে, আর তাঁহার পূজা করিবার গরদের সাড়ীখানিতে কালীঝুলি মাখাইয়া, নিজের মাথায় বাঁধিয়া, এক বিচিত্র বীভৎস সং সাজিয়া দুলালচাঁদ হাসিমুখে একখানা কেদারায় বসিয়া আছেন,—চাঁদের মুখে হাসি আর ধরে না! এই কিম্ভূতকিমাকার জীবটিকে দেখিয়া মা কি করিলেন? চাঁদের সেই অবস্থা, সেই হাব্‌ভাব—রকম-সকম দেখিয়া তিনিও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই—"ও আমার পোড়া কপাল,—এ সব কি হ'য়েছে রে বাঁদর,"—বলিয়াই সজোরে সোণার চাঁদের গোলাপী গণ্ডে চপেটাঘাত। কিন্তু সে আঘাত চাঁদের গালে যত না বাজিল—তাহার শতগুণ বাজিল মায়ের প্রাণে—মায়ের বুকে। দুষ্ট ছেলেকে শাসন না করিয়াও মা থাকিতে পারেন না, আবার শাসন করিতে গেলে—মারিতে গেলে, সে ঘা নিজেরই বুকে বাজে! এই আমাদের বাঙ্গালী মা! তাই চপেটাঘাত খাইয়া দুলালচাঁদও যেই 'ভ্যাঁ' করিয়া উঠিলেন,সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতারও চক্ষু হইতে অলক্ষিতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তারপর ছেলেও যত কাঁদে, আর ছেলেকে

কোলে লইয়া গণেশ-জননীও তত কাঁদেন। এই আমাদের বাঙ্গালী মা! রজনীকান্ত যখন কাঁদিয়া ফেলেন, এই ভাবেই কাঁদিয়া ফেলেন। তাঁহার প্রাণটি যে বাঙ্গালী মায়ের মতই কোমল ও সরল ছিল।

সমাজের সকল খুঁটিনাটি এবং সামাজিক সকল প্রকার ব্যক্তি-গণের ভণ্ডামী, জেঠামী ও গ্লানি—কিছুই রজনীকান্তের তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিলাতী হাওয়ার গুণে অকালপক্ব, অজাতশ্মশ্রু জেঠা ছেলে, সহুরে সভ্যতা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য যুবক, পল্লী-গ্রামের বর্ণশুদ্ধি-বিহীন বুড়ো বাপ, বিবাহে পণগ্রহণ, বালিকা বিধবার 'নির্জলা' একাদশী, বুড়ো বরকে 'গৌরী-দান,' অখাদ্য-ভোজন প্রভৃতি ম্লেচ্ছাচার, এবং দুর্গোৎসবে 'অশুদ্ধ মন্ত্র,' বিলাতী কাপড় ও তেলেভাজা লুচি পর্য্যন্ত যাবতীয় সামাজিক ছোট-বড় আচার, ব্যবহার ও অনুষ্ঠান এবং ডাক্তার-মোক্তার, হাকিম-উকিল, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, পুলিশ-প্রহরী, কবি-বৈজ্ঞানিক, কেরাণী-নব্যনারী প্রভৃতি সমুদায় সামাজিক ব্যক্তিগণের ভিতরে যেখানে যেটুকু ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই খানেই রজনীকান্ত খড়্গহস্ত,—যেন মারমুখী।

"পতিত ব্রাহ্মণ"-সম্বন্ধে অনেক কবিই যথেষ্ট আক্ষেপ করিয়াছেন। বাস্তবিকই—

> "যবে গণ্ডূষে সাগর-জল করিলাম পান,
> যবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগর-সন্তান,
> যবে দ্বিজ-পদাঘাত-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি
> স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হ'তেন শ্রীহরি।"—

তাঁহাদের অধঃপতন দেখিলে অতিবড় পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হয়, কোমলপ্রাণ কবির ত কথাই নাই। তাই শুককবি ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

"কেবল মুখেতে জাঁক, ভিতরে সকলি ফাঁক,
মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে।
কেঁদে ঢোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল,
গোলে মালে হরিবোল পাড়ে॥

* * *

কালী কালী মুখে ডাকি, যতদিন বেঁচে থাকি—
আশীর্ব্বাদ করিব তোমায়।
কোরো এই উপকার,— যেন কটা পরিবার—
অন্ন বিনা মারা নাহি যায়॥"

গুপ্তকবি কখন তাঁহাদিগকে 'মণ্ডালোষা দধিচোষা' বলিতেছেন, কখন 'নস্যলোসা' বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন, আবার কখন বা 'কোমাভরা গোঁসাভরা' বলিয়া ইয়ারকি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের লইয়া ইয়ারকিই ঈশ্বরগুপ্তে অধিক। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন,—

"শাস্ত্রিবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধারেন না এক বর্ণ ধার।"

* * *

"তোমরা বিপ্র হ'য়ে ভৃত্য-কার্য্য ক'রে বাড়ী ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি কোরে শুধু রাখ্‌বে সমাজটিরে?
—তা সে হ'বে কেন!"

তাহার পর টিকির উপর তাঁহার আরও আক্রমণ দেখুন,—

"আহা! কি মধুর টিকি আর্য্যঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো!

সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে,
(অথচ) চতুর্ব্বর্গ ফল গো।
আহা এমন কত্র, এমন নম্র,
(আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে,
অথচ সে সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজমি গুলি এ!''

এইবার রজনীকান্ত কি লিখিয়াছেন শুনুন।—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, কিন্তু নিজের জাত্যাভিমান, নিজের অহঙ্কার হারাইতে না পারিয়া বরং তাহার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছেন। কথাটা সত্য বটে। তাই "পতিত ব্রাহ্মণ" বলিতেছেন,—

আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ায় না মাথা কে আছে এমন হিন্দু?
আমাদেরই কোনও পূর্ব্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
গিরি-গোবর্দ্ধন ধ'রে ছিল যেই, মেরেছিল রাজা কংসে,—
তা'র বক্ষে যে লাথি মারে, সে যে জন্মেছিল এ বংশে।
বাবা, এখনো রেখেছি গলায় ঝুলিয়ে অমন ধোলাই পৈতে,
তোমরা মোদের সম্মান করিবে—সে কথা আবার কইতে?—

ইত্যাদি ক্রমাগত অতীতের বাজে বড়াই, আর সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার ও দর্প। তাহার পর তাঁহারা 'নরক হইতে দু'হাত তুলিয়া স্বর্গের সিঁড়ি দেখান,' 'চটির দোকান করেন,' 'হাতা ও বেড়ি ঠেলেন,' কিন্তু 'টিকিটি সুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা।' তাঁহারা মদ্‌টা আস্‌টা খান, খানাতে পড়িয়া থাকেন; তাঁহারা সন্ধ্যা ও গায়ত্রী এবং জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা—সকলই ভুলিয়াছেন—'(কিন্তু) ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে? সোজা কথাটা বুঝিতে পার না?' আবার—

আমরা হচ্ছি জেতের কর্ত্তা, আমাদের জাত নিবে কে?

(এই) স্বার্থের পাকা বেদীর উপরে গলা টিপে মারি বিবেকে।

বাবা, এখনো ঝুল্‌ছে ব্রহ্মণ্য তেজের Leyden Jarএ পৈতে,

তোমরা মোদের সম্মান করিবে—সে কথা আবার কইতে?

এতদ্‌ভিন্ন যখন যে পদ্য বা গানের ভিতর সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই রজনীকান্ত এই ভণ্ড ব্রাহ্মণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন:—

বাবা দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" অবধি
পʼড়ে আসিয়াছি চʼলে।

*

মা-সকল বামুন খাইয়ে সুখী;
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি?
এই কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পান্‌তোয়া ঠুকি।

তাহার পর কান্ত টিকির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই টিকিও কান্তের হাতে বা ভণ্ডের কাছে 'হজমী গুলি।' কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই হজমী গুলির প্রথম আমদানী করেন—দ্বিজেন্দ্রলাল,—রজনীকান্ত কেবল বিজ্ঞাপনের চটকে বেশি গুলি বিক্রয় করিয়াছেন মাত্র।—

ফেʼলনা পৈতে, কেটোনা টিকিটে
সব্ব বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা সিকিটে
মেলেও ত ক্যাকা বুঝিয়ে।

—প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের নকল।

রজনীকান্ত ছিলেন ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, মন্ত্র-বিশ্বাসী, একটু অধিক মাত্রায় গোঁড়া হিন্দু। তাই অশুদ্ধ মন্ত্র, অশুদ্ধ শাস্ত্রপাঠ তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না; মনে করিতেন, এইসব অনধীতশাস্ত্র, মূর্খ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্ম সকলই পণ্ড হইতেছে। তাই তাহাকে অতি দুঃখের সহিত লিখিতে দেখি,—

কোন্ পূজকের মুখে মন্ত্র, মন রয়েছে লুচির থালে,—
আর কিছু বলুক না বলুক, 'ভ্যোনম'টা বল্লেই চলে।

*

'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে, সেই দশকর্ম্মান্বিত।

*

অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূর্খ পূজক,
পুরুত সঙ্গে টিকি এল, বিশুদ্ধাচার-সূচক।
রেশমী নামাবলী এল—নিষ্ঠাবত্তার সাক্ষী,
"ইদং ধূপ"—এবং-প্রকার এল শুদ্ধ বাক্য।

*

ঐ "সিন্দূরশোভাকরং,"
আর "কাশ্যপের দিবাকরং"—
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি, 'দক্ষিণাবাক্য করং'।

লক্ষ্মীর এই স্তোত্র পড়িয়া আমাদের সরস্বতীর স্তব মনে পড়ে—"বিদ্যাস্থানে ভ্যএ বচ", আর হাসিতে গিয়া কান্তের মত কাঁদিয়া ফেলি। ভণ্ডামীতে ক্রমেই দেশ ভরিয়া উঠিতেছে, ধর্ম্মের নামে ঘোরতর অধর্ম্ম চলিতেছে, পূজার্চ্চনা পর্য্যন্ত ভণ্ডামীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই কান্তের সহিত বলিতে ইচ্ছা করে,—

কান্ত বলে, শোন্ মা তারা! আসছে বছর আবার এলে,
নাও যদি মারিস্ প্রাণে,—এই অসুরগুলো পুরিস্ জেলে।

আবার যখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রায় বাহাদুর রামমোহনের কাছে গলা-ধাক্কা খাইয়া,

ঐ মধুময় ধম্‌কানি খেয়ে পাছে হয় তার জোলাপ,
থতমত খেয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া বাঁচে ব্রাহ্মণ,—

তখন এই রজনীকান্তই রায় বাহাদুরের প্রতি রোষ-রক্তিম নয়নে বজ্রদৃষ্টিপাত করিলেন, গর্জ্জন করিয়া ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

সে যে তোমা হ'তে কত মিতাচারী, সংযমী সে যে কতটা,
সে যে তোমা হ'তে তত বোকা নয়, তুমি মনে কর যতটা;
বিলাসিতা তারে মজায়নি, কত সামান্ত অভাব;
একটি পয়সা দাও না তাহারে, তুমিতো মস্ত নবাব!
কথাটি বলিলে খেঁকী মেরে ওঠ, যেন এক ক্ষেপা কুকুর,
'দোস্‌রা যায়গা দেখে নাও, হেথা কিছু হবে না ঠাকুর।'

এই সঙ্গে গুপ্তকবির নিম্নলিখিত চারি ছত্র পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।—

"যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুঁসি ধ'রে ওঠেন তবে!
বলে, গতোর আছে—খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে?"

যাহার যেটুকু ভাল, তাহার প্রতিও রজনীকান্ত অন্ধ ছিলেন না। তিনি গুণের গৌরব করিতে জানিতেন।

চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর কেরাণী-জীবন দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত উভয়েই চিত্রিত করিয়াছেন—গানে নহে, কবিতায়। কান্তের 'কেরাণী-জীবন' বৃটিশ-রাজের অদ্ভুত-সৃষ্টি কেরাণী-জীবনের নিখুঁত ছবি—অবিকল ফটো; দীর্ঘ পদ্যে কেরাণীর দৈনিক জীবনযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত তিনি নিপুণ হস্তে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ্য-রঙ্গ বেশি নাই। কেরাণীর জীবনটাই যে রঙ্গময়! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্যে মাঝে মাঝে বেশ ব্যঙ্গ্য আছে,—সমাজের উপর ঘা আছে।—

"——আর না খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটি আইবুড় মেয়ে;
বেছে বুড় বরে
ভালো কুলীন ঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও বিষম কষ্ট কোরে;
স্ত্রী হোলেন গতাসু, কি করি? শোকতপ্ত অমনি—
আমি কোল্লাম বিয়ে একটি ন' বর্ষীয়া রমণী।"

আবার রজনীকান্তের কেরাণী-জীবনের শেষ চার ছত্রের মধ্যে যে শ্লেষ ও দ্যোতনা আছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য —

এত গিরি তুমি চূর্ণ করেছ,
"কেরাণী-গিরি"টে রাখিবে?
হে বিধি! তোমার শক্তির সুযশে
কলঙ্কের কালী মাখিবে?

কান্ত হাসিতে গিয়া শেষে কাঁদিয়া ফেলিবার জোগাড় করিয়াছেন।

যাঁহারা বিজ্ঞানের ক খ পড়িয়া বৈজ্ঞানিক—দুই পাতা 'জাঁনো'-

পড়িয়া জ্ঞানী, আর দেড় পাতা 'রস্‌কো' পড়িয়া রাসায়নিক, সেই ইংরাজি-শিক্ষিত আধুনিক নব্য যুবকেরা—যাঁহারা কথায় কথায় 'কেন' জিজ্ঞাসা করেন, নিজে যাহা বুঝেন তাহাই ঠিক,—বাকি সব ভুয়ো বলিয়া মনে করেন, যেটা তাঁহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারেন না —সেটা পূরামাত্রায় গাঁজাখুরি—এইরূপ যাঁহাদের শিক্ষা, বিশ্বাস ও ধারণা —সেই সকল লোকের উপর রজনীকান্ত বেজায় চটা। তাঁহারা যেন তাঁহার চক্ষুঃশূল।—

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
দেখ্‌বো সে উপাধি নিলে—
ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে।

*

কোকিল কেন কুহু বলে,
জোনাকীটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে—
কেন ফুটায় কুসুমটিকে ?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে,
চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
কমল কেন চায় রবিকে ?

*

গোটাদুই ভেদ বুঝে তুই গর্ব্বে অধীর
বৈজ্ঞানিক বীর।

কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ্,
'প্যানো' খুলে পড়্ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ,'
মাপ্ছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচছে।

*

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধ'রে,
বাইরের আঁখি দুটো ফুটোচ্ছি বেশ ক'রে ;
মনশ্চক্ষু অন্ধ, তার খবর কে করে ?
সে বেচারী আঁধারে ঘুরছে।

*

তোর ভারি পক্ক মাথা,
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
ক'রেছিস্ প্রশস্ত !

*

দু'দিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস্ তো অশ্বডিম্ব ;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত—
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ !

*

বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ !
বীর কি বীভৎস, হাস্য কি করুণ ;—
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুণ' ;—
তর্কে পঞ্চানন—এয়ারকিতে জ্যাঠা !

দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত উভয়েই 'ডেপুটী'র চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ডেপুটী-কাহিনী দীর্ঘ পদ্য হইলেও ডেপুটীর চরিত্র চিত্রিত হয় নাই,—যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিই আধুনিক যে কোন হাকিম বা উচ্চ-কর্ম্মচারীর প্রতি সমভাবে প্রয়োজ্য,—পদ্যের নাম ডেপুটী-কাহিনীর পরিবর্ত্তে 'হাকিম' বা 'হুজুর' হইলেও কোন ক্ষতি হইত না, ডেপুটীর চরিত্রের বিশেষত্ব ইহাতে আদৌ ফুটে নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং ডেপুটী ছিলেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের—

"—— অষ্টমাস পর্য্যটন,
দুর্ভিক্ষ কোথায় কিছু নাই ;
উপরে রিপোর্ট গেল—বলিহারি যাই !"

এই তিন ছত্র এবং রজনীকান্তের—

——খালাসটা বেশি হ'লে
উঠেন কর্ত্তাটি ভারি জ্বলে ?
আর শাস্তি ভিন্ন Promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।

এই চারি ছত্র পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি। রজনীকান্তের 'ডেপুটী' উৎকট ঝালে ভরা, আস্বাদনে চোখ দিয়া জল বাহির হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল ডেপুটীগিরী করিয়াও কড়া হাকিম হইতে পারেন নাই, কিন্তু রজনীকান্ত অল্প কয়েকবৎসর ওকালতি করিয়াই 'জবর্' উকিল সাজিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, প্রথম প্রথম ওকালতিতে ভাল পসার জমাইতে পারেন নাই বলিয়া রজনীকান্ত গাত্রজালায় ঐরূপ তীব্রশ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক গান রচনা করিয়াছেন। আমরা

ইহা স্বীকার করি না। ওকালতির উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল—মনুষ্যত্বহীন না হইলে ভাল উকিল হওয়া যায় না। রোজনাম্‌চা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কত লোককে যে ঠকিয়ে ওকালতিতে পয়সা নিয়েছি, তা কেমন ক'রে লিখি?—তা আমিই জানি, আর জানেন ওই ভগবান্‌,—মাগ-ছেলে পর্য্যন্ত জানে না।"* "একে অনর্থক ওকালতি পড়াচ্ছেন। ওকালতি ক'র্‌তে পার্‌বে না। ওর প্রাণ আছে—উজ্জ্বল, আর ও তেজস্বী। ও কি ওকালতি ক'র্‌তে পারে?"

তাই রজনীকান্ত অত্যন্ত জোরের সহিত লিখিয়াছেন,—

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত Public movementএ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing,
(which) we sell to the highest bidder.

এইবার মোক্তারের পালা। সেই—

পরি, চাপকান-তলে ধুতি—
যেন যাত্রার বৃন্দেদূতী।
দু'টো ইংরেজি কথাও জানি,
শুধু ভুলেছি Grammarখানি,—
এই 'I goes,' 'he come,' 'they eats' বেরোয়
ক'রে খুব টানাটানি।

তাহার পরেই রজনীকান্ত 'ডাক্তার'কে লইয়া টানাটানি করিয়াছেন।

Medical certificateএর জন্যে
এলে ধনী কেহ,

ঐ জলপানী কিঞ্চিৎ হাতিয়ে, ব'লে দেই—
"অতি রুগ্ন দেহ,
আমার চিকিৎসার নীচে আছেন,
জানিনে মরেন কিম্বা বাঁচেন।
এর ব্যারাম ভারি শক্ত, ইনি
হাই তোলেন আর হাঁচেন ;
আর কষ্ট হ'লেই কাঁদেন, আর
আহ্লাদ হ'লেই নাচেন"।

ইহার উপরে কোনরূপ টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। ট্রাভলিং বিল আর মেডিকেল সার্টিফিকেট না থাকিলে ইংরাজ-রাজত্বে অনেক গরীব কেরাণীর অন্ন মারা যাইত এবং অনেক মোটা মাহিনার চাকুরের নবাবী করা চলিত না,—সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই দুইটি জিনিসই ইংরাজ-রাজের অশেষ অনুকম্পার ফল, আর উভয় জিনিসেই সত্যের মর্য্যাদা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে!

রজনীকান্তের অন্তঃপুর-মধ্যেও গতিবিধি ছিল,—তবে সে 'নব্যা নারী'র কক্ষেই বেশি, 'গিন্নীর' রান্নাঘরে একটু উঁকি মারিয়াছেন এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করিয়া তাঁহার মাথায় 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' করিয়াছেন। আর একবার সখার ক'নে বৌএর সঙ্গে পরিহাস করিয়াছেন। কিন্তু নব্যনারীর নিকটে কান্ত যেন কেমন জড়সড়, তাঁহাদের দুই কথা শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু অতি ভয়ে ভয়ে,—তাঁহারা যে, 'রাগিয়া বলিতে মোদের কর্ণ' বেশ পটু। গিন্নীর আগুন ছুঁলেই গোল, তাই—

খেয়ে বামুনের রান্না, ভাই আমার আসে কান্না,
তবু পাক-ঘরে যান না, গিন্নীর আগুন ছুঁলেই গোল।

(আবার) ডালের সঙ্গে জল মেশে না,
বেগুন পোড়া, নিম পটোল।
(হায় হু'বেলা)

স্বামী—কেমন হ'ল পয়লা কাঁঠি, কাটাবাজু, এ চন্দ্রহার?
(আর) হীরের সাতনহরী মালা, বলকে নাশে অন্ধকার!
জরির বডি, পার্শী-সাড়ী বড্ড বেশী দামী এ!
স্ত্রী—(আহা) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বড্ড গেছ ঘামিয়ে।
স্বামী—এসব এনেছি বড় ব'য়ের তরে,—তোমার তরে আনিনি!
ও কি ও? আরে, কাঁদ কেন? ছি! রাগ ক'রো না মানিনি।
তোমার সব গহনা আছে, বড় ব'য়েরি নাই গো!
স্ত্রী—হায় কি হ'ল! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি যাই গো।

—এ ত বাঙ্গালীর ঘরের প্রতিদিনের ঘটনা।

বুদ্ধি হ'লে এম্‌নি দেবে বসেন,
এম্‌নি নিজের সংসার ব'লে টান্‌টি,
বরাহূত কোন বন্ধু এলে,
চারটি খিলি করেন, চিরে পান্‌টি।

—এ অতি উপাদেয় পরিহাস।

"পুরাতত্ত্ববিৎ" রজনীকান্তের হাতে নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। এখন ত সকলেই ঐতিহাসিক, সকলেই পুরাতত্ত্ববিদ্, সকলেই প্রত্নতাত্ত্বিক। সুতরাং এই সম্বন্ধে আমরা সাহিত্যিক—আমাদের কোন কথা না বলাই ভাল। কবির লেখা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

রাজা অশোকের ক’টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক’টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক’টা ছিল ছাতি,—
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক’রেছি জাহির।

*

ক’ আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল ক’টা টিকটিকি,
গৌতম-সূত্রে রেশম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,—
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক’রেছি জাহির।

তাহার পর ‘ডেঁপো ছেলে’র উপর ভীষণ আক্রমণ,—কিন্তু কোথাও একটুও অতিরঞ্জন নাই।

এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চশ্‌মা ধ’রেছে,
আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া,
আর রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না বাবুর খাওয়া।
চব্বিশ ঘণ্টা চুরট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর এক পেয়লা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই।

*

একটু চুটকী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ,
Football ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্ট-সহ।
গজটেক কালো ফিতে নৈলে, পায় না
পোড়ার চোখে কান্না;
একটু পলাণ্ডুর সংসর্গ ভিন্ন, হয় না মাংস রান্না।

রজনীকান্তের 'মৌতাতের' মাত্রা অতিশয় চড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তবু প্রত্যেক পাঠককে আমরা ঐ গানটি পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। এমন সুন্দর ও সুললিত হাসির গান বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্লভ। মৌতাতে যখন আমাদের ভরপুর নেশা হইয়াছিল, তখন প্যারীমোহন কবিরত্নের সেই—

"যাদের আঁতুড়ে গন্ধ গায় পাওয়া যায়,
(তাদের) চশমা নাকের ডগে—এ বড় বেজায়।" ইত্যাদি

গানটি মনে পড়িয়াছিল। তাহার পর "জাতীয় উন্নতি" গানের মধ্যে আবার নব্য যুবককে লক্ষ্য করিয়া কান্ত কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

(আর) যে হেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী,
প্রাণপণে যোগাই গহনা;
আর বাপ্‌রে! তাঁর রুষ্ট আঁখি-তাপে
শুকায় প্রেমনদীর মোহনা।
(সে যে) মাকে বলে 'বেটী'—হেসে দেই উড়িয়ে
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে,
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয়, 'এ মাসী, খুড়ী এ'—
ভুলে প্রণাম করি না পূজ্যে।

আর 'বরের দর' বাৎলাইবার সময়েও বরের বাপ বলিতেছেন,—

হ্যাদ্দ্যাখো ধরিনি 'চস্‌মা'—কেমন ভুলো মন!
ছেলে ঠুসি পেলে খুসি, একটু খাটো নয়ণন।

রজনীকান্ত প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার দেশহিতৈষণার মধ্যে ভণ্ডামী ছিল না, জাল ছিল না, হুজুগ ছিল না, বাহবা লই-

বার আগ্রহ ছিল না। তাই তিনি ভণ্ড, মেকী দেশহিতৈষিগণের প্রতি সদাই খড়্গহস্ত, যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই তাহাদের বহিরাবরণ উন্মোচন করিয়া, মুখোস খুলিয়া দিয়া আসল মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়াছেন।—

ভদ্র সেই, যার ফর্সা ধুতি, ফুট্‌ফুটে যার জামা ;
দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে "ডসনের" বিনামা।

*

(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট ক্যারেক্টার দেখ' না ;
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না।

তাহার পর রজনীকান্ত "উঠে প'ড়ে লাগ্" গানে ভণ্ড স্বদেশী নেতাদের বুকে মিছরীর ছুরী বসাইয়া দিয়াছেন,—

আরো এক উপায় হ'তে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস,'
বিলিতী যা কিছু সবি Nonsense bosh,—
(জোরে) লিখে বা Lectureএ ক' !
কান্ত বলে, একবার জাগ্ তোরা জাগ্,
ভারত-মাতার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্,
ব'সে বিছানাতে, খ'বুলে গিঁঠে বাতে ;
(দেখ্ না) হ'লি হাঁটুভাঙ্গা 'দ' ।

তখন স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে যত বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টারই হইয়াছিলেন, আমাদের নেতা বা Leaders,—সেই যাঁহারা মাকে 'মাতা' বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন অথবা ইচ্ছা করিয়া সাহেবী অনুকরণে

বিকৃত বিজাতীয় স্বরে 'মাটা' বলিতেন। বাঙ্গালী হইলে কি হয়, 'মাতাকে' 'মাটা' উচ্চারণ না করিলে যে, তাঁহাদের 'ইনের', তাঁহাদের 'টেম্পলের', তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার, তাঁহাদের সাহেবীয়ানার মুখে চুণ-কালী পড়ে! এই সব বাঙ্গালী-সাহেবই হইয়াছিলেন, তখন আমাদের জাতির নেতা! রবীন্দ্রনাথও ইঁহাদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"এঁরা সব বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি ব'লে গণ্য;
কোট্‌পরা কায় সঁপেছেন হায়,
শুধু স্বজাতির জন্য!"

কিন্তু রজনীকান্ত এত খোলাখুলি বলেন নাই, একটি মাত্র "অরত-মাটা" শব্দে—বোড়ের কিস্তীতে বাজী মাৎ করিয়াছেন। "Brevity is the soul of wit."—স্বল্পতাই রসের জান্। রজনীকান্ত এক বুঁদ মিছরীর দানা ফেলিয়া দিয়া সমস্ত রসটাকে দানা বাঁধিয়াছেন।

পুথি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। কাজেই 'বাণী'র "জেনে রাখ," "বরের দর," "বেহায়া বেহাই" ও ইহার শেষ গান "বিদায়" আগাগোড়া পাঠ করিবার ভার পাঠকের উপর দিতে বাধ্য হইতেছি। তবে এই সুযোগে একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে—সে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ সার আশুতোষ সরস্বতী মহাশয়ের নিকটে। অমৃত-বাজারের হেমন্তকুমার 'নয়শো রূপেয়া' লিখিয়া, রসরাজ অমৃতলাল 'বিবাহ-বিভ্রাট' লিখিয়া, নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্র 'বলিদান' লিখিয়া এবং কান্তকবি রজনীকান্ত 'বরের দর' ও 'বেহায়া বেহাই' রচনা করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, সরস্বতী মহাশয় সারদা-সদনের দ্বার অবারিত—উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, সারা বাঙ্গালায় সস্তার ডিগ্রী ছড়াইয়া দিয়া তাহা সুসম্পন্ন

করিয়াছেন,—পাশকরা বরের দর, পাশকরা ঠাকুরের মাহিনার অনুপাতে যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। তাই কত মেয়ের বাপ দুই হাত তুলিয়া সরস্বতীর মহিমা গান করিতেছেন। ভবিষ্য রজনীকান্ত আর ত লিখিতে পারিবেন না—

যদি দিতেন একটি 'পাশ,' তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল্ ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠ্‌ল কম্পন ?

—সরস্বতীর কৃপায় এখন মুড়ী-মিছরীর এক দর—পাশকরা ছেলের আর কোন কদর নাই।

"সমাজ" শীর্ষক গানে এবং অন্যান্য নানা গানে ও কবিতার মধ্যে রজনীকান্ত আধুনিক সমাজের দুর্দ্দশা-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু সকলগুলি আলোচনা করিবার সময় নাই। "সমাজ" হইতে তিনটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।—

তোরা ঘরের পানে তাকা ;
এটা কফ্‌ভরা রুমালের মত,—
বাইরে একটু আতর মাখা।

—এমন সহজ, সরল, শাদাসিধা উপমা সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ। বাস্তবিকই আজকাল আমাদের সমাজের—'বাহিরে চাকন-চিকন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন,' 'মুখে মধু, হৃদে বিষ।'—এই বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে জোর-কলমে, নানা দৃষ্টান্ত দিয়া কান্তকবি বুঝাইয়া দিয়াছেন। একটি কথাও বাজে বকেন নাই, কোন বিষয়ই অতিরঞ্জিত করেন নাই—তিনি এই অধঃপতিত সমাজের হুবহু নক্‌শা আঁকিয়াছেন। 'অভয়া' হইতে এই গানটি পাঠ করিবার জন্য আমরা সকলকে সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধ করিতেছি। ছোটর ভিতরে, অতি সংক্ষেপে সমাজের এমন নিখুঁত ছবি বঙ্গ-সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য।

এইবার যেগুলি কেবল হাসির গান—যে গুলির উদ্দেশ্য 'কেবল হাসান', সেই গানগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। "বুড়ো বাঙ্গাল" (তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি), "বৈয়াকরণ-দম্পতীর বিরহ" এবং "ঔদরিক" এই তিনটি গান এই শ্রেণীর সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বুড়া বাঙ্গাল্ ও ঔদরিক যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে,—লোকের মুখে মুখে, গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে যেরূপ প্রসারতা পাইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের "নন্দলাল" ভিন্ন আজকালকার অন্য কোন হাসির গানের ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। তবে নন্দলালের পিছনে খোঁটার জোর ছিল—তাঁহার মুরুব্বী ফনোগ্রাফ্ ও গ্রামোফন তাঁহার এই পদবৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

> বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়;
> তোমার লগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায়।

এই গানটি এমন অনেকের মুখে শুনিয়াছি, যাঁহারা জানেন না যে, রজনীকান্তই ইহার রচয়িতা।

"দম্পতির বিরহ" আগুস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলেই ভাল হয়, তাহার আগাগোড়া রসে ভরা, কেবল হাসি—বেদম হাসি; কিন্তু উপায় নাই—দুইচারি চরণ উদ্ধৃত করিতেছি,—

(পত্র)

> কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি;
> যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভ যোগ,
> দ্বন্দ্ব-সমাসে হইব বন্দী।

তুমি মূল ধাতু, আমি হে প্রত্যয়,
তোমাযোগে আমার সার্থকতা হয়,
কবে 'স্তুতি, স্তুতঃ, স্তুতি'র ঘুচে যাবে ভয়,
হবে বর্ত্তমানের 'তিপ্, তস্, অন্তি!'

(উত্তর)

প্রিয়ে! হ'য়ে আছি বিরহে হসন্ত;
শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ রোগ,
জীবনে কি লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত!

এই শেষ দুই ছত্রের উপর টিপ্পনী করিবার উপায় নাই,—"বুঝ ভাব ভাবুক যে হও!"

মনোহরসাই সুরে 'ঔদরিক' গান গাহিয়া কান্তকবি 'কল্যাণী' সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা যদিও আজকাল সবাই গানে তান্‌সেন,—এই গানটি গাহিতে পারিব না, তবুও ইহার আবৃত্তি করিয়া—ইহার রসাস্বাদ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিব। হরিনাথ—কাঙ্গাল, তাঁহার পক্ষে লুচি-মোণ্ডার লোভ সংবরণ করা অসাধ্যসাধন, তাঁহাকে বরং ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু বিলাত-ফের্ত্তা ডি এল রায়, যাঁহারা "স্ত্রীকে ছুরি-কাঁটা ধরান্", —সেই বিলাত-ফের্ত্তা ডি এল রায়েরও 'সন্দেশ' দেখিয়া মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইয়াছিল। তাই দ্বিজেন্দ্রলালকে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারি না। কিন্তু রজনীকান্তের মত ঔদরিক বা পেটুক আমাদের জানে আমরা কখনও দেখি নাই। জানি না কেন, এই পেটুক গণেশটিকে তাহার বা খাঁড়ুড়ে গলায় পাব্‌তোয়া দিয়া মারিয়া

ফেলেন নাই,—তাহা হইলে আপদ্‌-বালাই দূর হইত! এমন পেটুক সমাজের কলঙ্ক!

প্রথমে লুচি-মোণ্ডা খাইতে গিয়া কাঙ্গালের নাকাল দেখুন,—

> "লুচিমোণ্ডা খেয়ে মন্‌টা তুষ্ট—কিন্তু প্রাণটা গেল,
> কুঁচ্‌কি-কণ্ঠা এক হোয়েছে (বাপ) বুঝি দফা ঠাণ্ডা হ'ল।
> জল রাখিবার স্থল রাখি নাই—উপায় কি বল'?
> উঠ্‌তে উদর ফাটে (ও বাবা) শীঘ্র আমায় ধ'রে তোল।
> লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু তাই আমার ঘটিল;
> পুরি দিয়া উদর পূরি (ও বাবা) যমের পুরী দেখ্‌তে হ'ল

তাহার পর ডি এল রায়ের লালা-নিঃসরণ লক্ষ্য করুন,—

> "উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর, রসকরা সরপুরিয়া,
> উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি! কতনা বুদ্ধি করিয়া।
> যদি দাও তাহা খালি—আঃ!
> মদীয় বদনে ঢালিয়া,—
> উহু, কোথায় লাগে বা কুর্ম্মা কাবাব, কোথায় পোলাও কালিয়া;
> উহু, খাই তাহা হ'লে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
> আহা, ক্ষীর যদি হোত ভারত-জলধি, ছানা হোত যদি হিমালয়,
> আহা, পারিতাম গিলে ক'রে নিতে কিছু সুবিধা হয় ত মহাশয়।
> অথবা দেখিয়া শুনিয়া
> বেড়াতাম ভণভণিয়া,
> আহা, ময়রা-দোকানে মাছি হ'য়ে যদি—কি মজারি হোত ছুলিয়া;
> আহা, যেজায় যেমন যেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে 'মরিয়া'।

ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়া ;
ওহো, মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চ'খে ব'হে যায় দরিয়া !

এইবার 'ঔদরিকের' উক্তি শুনুন,—

যদি, কুম্‌ড়োর মত চালে ধ'রে র'ত
পানতোয়া শত শত ;
আর, স'রষের মত, হ'ত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মত !
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে ;)
(গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে।)
যদি তালের মতন হ'ত ছ্যানাবড়া,
ধানের মতন চ'সি ;
আর, তরমুজ যদি রসগোল্লা হ'ত,
দেখে প্রাণ হ'ত খুসি !
(আমি পাহারা দিতাম ; কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম ;)
(সারা রাত তামাক খেতাম, আর পাহারা দিতাম।)
যেমন, সরোবর-মাঝে, কমলের বনে
শত শত পদ্মপাতা—
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে শত শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা !
(আমি নেমে যে যেতাম ; গামছা প'রে নেমে যে যেতাম।)
যদি, বিলিতি কুম্‌ড়ো হ'ত লেডিকিনি
পটোলের মত পুলি ;
(আর) পায়েসের [illegible] ব'য়ে যেত,—পান
ক'র্‌তাম দু-হাতে তুলি' ।

(আমি ডুবে যে যেতাম ;) (সেই সুধা-তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম ;)
(আর, বেশি কি ব'লব, গিন্নীর কথা ভুলে ডুবে যে যেতাম ;)

সকলি ত হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম ;
শুধু এই খেদ, কান্ত আগে ম'রে যাবে,
(আর) হবে না মানব-জন্ম !

(কান্ত আর খেতে পাবে না ;) (মানব-জন্ম আর হবে না,—খেতে পাবে না ;) (হয় তো শিয়াল কি কুকুর হবে,—আর খেতে পাবে না ;) (ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইবে, খেতে পাবে না ;) (সবাই তাড়া হুড়ো ক'রে খেদিয়ে দেবে গো—খেতে পাবে না ।)

রঙ্গ করিতে গিয়া রজনীকান্ত কল্যাণীর শেষে শৃগাল-কুকুরের জন্যও অশ্রুবর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পেটুক কান্ত কেবল 'নিজের পেট্টা জানেন সার' নয়—শৃগাল-কুকুর তাঁহার মত রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে পারে না বলিয়া, তিনি তাহাদের জন্যও বেদনা অনুভব করেন। তাই বলিতেছিলাম, কৃষ্ণনগরের সরপূরিয়া—দ্বিজেন্দ্রলালের 'সন্দেশ' ভীমনাগের সন্দেশ হইলেও বাঙ্গাল্-দেশের কাঁচাগোল্লা অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে,—"৺ভীমচন্দ্র নাগ—তস্য ভ্রাতা" ভীমচন্দ্রের নিকটেই সন্দেশের পাক শিখিয়া যেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'ছুয়ো' দিয়াছেন,—শিষ্যের নিকট গুরু হারিয়া গিয়াছেন।

রজনীকান্তের রোজনাম্‌চা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া হাস্যরসের আলোচনা শেষ করিতেছি।—"প্রকৃত Humour (ব্যঙ্গ) তাই, যাতে সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের weakness (গলদ্) দেখিয়ে, তার rediculous side expose ক'রে (হাস্যরসাত্মক বিকৃত দিক্‌টা লোকের সাম্‌নে ধ'রে) সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেয়। আমি যে সব

humourএর (ব্যঙ্গের) অবতারণা ক'রেছিলাম, তার একটাও নিষ্ফল বাজে লিখি নি।"—এই উক্তির মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন নাই, ইহাতে একটুও অত্যুক্তি হয় নাই। রজনীকান্ত কখনও 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাহেন নাই, তিনি কখনও আমাদের মত শিব গড়িতে বানর গড়েন নাই।—তাঁহার সমগ্র হাসির গান ও কবিতার মধ্যে এমন একটিও ছত্র নাই—এমন একটিও কথা নাই, যাহা বাজে কথা, নিরর্থক প্রয়োগ অথবা যাহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল বা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার ব্যঙ্গ, তাঁহার রঙ্গ, তাঁহার রহস্য—স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, শরতের আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, শিশুর হাসির মত সুন্দর, মাতার স্নেহের মত পবিত্র ;—ঔজ্জ্বল্যে মনের আঁধার ঘুচিয়া যায়,—সুনীল, নির্ম্মল স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়াইয়া আসে, আর সুন্দর, সরল ও পবিত্র—স্নেহে ও হাসিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। তাঁহার ব্যঙ্গে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই, সঙ্কীর্ণতার সঙ্কোচন নাই, অশ্লীলতার স্থান নাই, অনর্থক খোঁচা মারিয়া রক্তপাতের চেষ্টা নাই,—তাঁহার ব্যঙ্গে যাহা আছে তাহা খাঁটি সোণা—তাহার সবটুকু সুন্দর, মনোহর ও পবিত্র।

দেশাত্মবোধে

রজনীকান্ত দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন,—তিনি ছিলেন খাঁটি দেশভক্ত। তিনি 'হুজুগে' মাতিয়া দেশভক্ত, বৃথা আন্দোলনকারী দেশ-প্রেমিক বা হাততালির প্রলোভনে ছদ্মবেশী স্বদেশী ছিলেন না। ভাবপ্রবণ কবি হইলেও তিনি ভাবের স্রোতে গা ভাসান দিয়া হঠাৎ কবির মত কেবল কবিত্বের উচ্ছ্বাসে এবং তাবার উদ্দীপনায় মায়ের আবাহন করেন নাই বা দেশবাসীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গান নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গানের মধ্য দিয়া, সুরের ভিতর দিয়া আমাদের জাতিগত অনেক জটিল সমস্যার সমাধান তিনি করিয়া গিয়াছেন; ঘুমঘোরে অচেতন বাঙ্গালার চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, বাঙ্গালীকে সৎপথে চালিত করিবার উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশবাসীকে তাহার অবস্থার স্বরূপভাব বুঝাইয়া দিবার এই চেষ্টা এক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ভিন্ন আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

অন্য সকলের দেশভক্তি হইতে রজনীকান্তের দেশভক্তি বা স্বদেশ-প্রাণতা একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। দেশ বলিতে, বাঙ্গালী হইলেও, তিনি কেবল বঙ্গদেশকেই বুঝিতেন না, তিনি বুঝিতেন সমগ্র ভারত-বর্ষকে। তাই প্রথমেই তিনি 'সুমঙ্গলময়ী মাকে' জাগাইয়াছেন—'ভারতকাব্যনিকুঞ্জে',—বঙ্গকাব্যনিকুঞ্জে নহে; তিনি দেখিয়াছেন, 'চির-দুখশয়নবিলীনা ভারতকে',—দুখিনী বঙ্গজননীকে নহে। তিনি কেবল সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা বঙ্গজননীর শ্যামল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন নাই, তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন 'যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত' ভারতকে

দেখিয়া, যাহার কণ্ঠ—'সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,' আর যাহার কিরীট—'ধূর্জ্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত'; যে দেশ 'রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত' এবং 'অর্জ্জুন-ভীম্ম-শরাসন-টঙ্কৃত'। সেই দেশের গৌরব গাথা গাহিয়া, তাহাকেই জননী-জন্মভূমি বলিয়া প্রণাম করিয়া রজনীকান্ত দেশবন্দনা করিয়াছেন।

স্বদেশী-আন্দোলনের বহুপূর্ব্ব হইতে রজনীকান্ত কাঁদিয়াছেন—ভারতের দুঃখে। তাহারই অতীত ও লুপ্ত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দারুণ হতাশে তাঁহার লেখনী-মুখে বাহির হইয়াছে,—

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

হিন্দু তিনি—সমগ্র হিন্দুস্থানের জন্ম বহু পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশী-আন্দোলনের হুলহুলাধ্বনি শুনিয়া, সপ্তমীপূজার বাজনা শুনিয়া তিনি মায়ের প্রতিমা দেখিতে ছুটিয়া বাহির হন নাই,—বোধনের প্রথম দিন হইতেই তিনি নিভৃতে ভারতমাতার পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন; আর ধর্ম্ম-বিশ্বাসী রজনীকান্ত কোন দিন ধর্ম্মহীন দেশাত্মবোধের প্রশ্রয় দেন নাই।

কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। বাঙ্গালী আমরা সত্য সত্যই কি কেবল বাঙ্গালা দেশ লইয়া তৃপ্ত থাকিব? বাঙ্গালার তীর্থ, বাঙ্গালার শোভা-সৌন্দর্য্য, বাঙ্গালার কলানৈপুণ্য, বাঙ্গালার বিদ্যা-বুদ্ধি, বাঙ্গালার জ্ঞান-গবেষণা—মাত্র এই গুলিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিব? তাহাই কি বাঙ্গালীর উচিত?—তবে বাঙ্গালার

বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তীর্থ—গয়া, কাশী, বৃন্দাবন,—দ্বারকা, অবন্তী, কাঞ্চী—প্রয়াগ, পুরী, রামেশ্বর—এ সকল তীর্থের সহিত কি বাঙ্গালীর সম্বন্ধ নাই? তবে এই ধর্ম্মবিপ্লবের দিনেও শত শত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী ঐ সকল পবিত্র স্থানে ছুটিয়া যায় কেন? গঙ্গোত্তরীর নয়নমনোহর গঙ্গাবতরণ, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নয়নাভিরাম শোভাসম্পৎ, হিমালয়ের সৌম্য-প্রশান্ত-অটল মূর্ত্তি, লবণাম্বুর উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছ্বসিত আবেগ দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী এখনও ব্যাকুল কেন? আগ্রার তাজ, অজন্তার গিরি-গুম্ফ, লাখ্‌নৌএর ইমামবারা দেখিতে আজিও বাঙ্গালী ব্যগ্র কেন? পার্শ্বনাথ-বুদ্ধদেব, কালিদাস-ভবভূতি, নানক-কবীর—ইঁহারা কি আমাদের কেহ নহেন? এই সকল মহাপ্রাণকে কি বাঙ্গালী প্রাণের ভিতর আপনার বলিয়া বোধ করে না? নিশ্চয় করে—করাই কর্ত্তব্য। তাই ভারতধর্ম্মী রজনীকান্ত বঙ্গবিভাগের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতের গৌরব-গান গাহিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভারতের বন্দনা গাহিবার পর ভারতীর প্রিয় সন্তান রজনীকান্ত 'বঙ্গমাতা'র সৌন্দর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন,—

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে কোটি
তটিনী—মত্ত, খর-তরঙ্গ;
নমো নমো নমো জননী বঙ্গ!

দেশের কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে রজনীকান্তকে রোজনামচায় লিখিতে দেখি,—"আর কি সে দিন ফিরে পাব? কি শান্তি, কি সুখ, কি প্রতিভা! সমস্ত জগৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, যারা সভ্য ব'লে আজ খ্যাত—তা'রা তখন কাঁচা মাংস খেতো। তখন বিলাস-বিমুখ,

গলিত-পত্রভোজী মুনি অরণ্যের অন্ধকারময় নির্জ্জনতা ভেদ ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম॥

সে দিন কি আর ফিরে আস্‌বে? ধর্ম্মপ্রাণ ভারত কি ধর্ম্ম মাথায় নিয়ে আবার জাগ্‌বে?"

রজনীকান্ত ভারত-মাতার সৌন্দর্য্যের উপাসক,—তাঁহার রূপের পূজক। তিনি মায়ের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া মায়ের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সদাই উন্মুখ। ইহাই রজনীকান্তের দেশাত্মবোধের প্রথম পরিচয়।

রজনীকান্তের দেশভক্তির দ্বিতীয় পরিচয়—স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালীর দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার—তাহার অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান চেষ্টায়। এই চেষ্টায় তাঁহার বিশেষত্ব যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা অপূর্ব্ব। আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালীর চোখে আঙ্গুল দিয়া তিনিই বলিয়া দিলেন,—তোরা একবার ঘরের পানে তাকা—দীন-দুখিনীর ছেলে তোরা—তোরা প্রথমে তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থানটা করিয়া নে। বিলাসের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তোরা বিপথে ছুটিয়া চলিয়াছিস্ বলিয়া তোদের পেটের ভাত আর পরণের কাপড় পর্য্যন্ত হারাইয়াছিস্।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে একা রজনীকান্তই বিলাসলালায়িত বাঙ্গালীকে সংযত হইয়া দেশের জিনিসগুলিকে আদর করিবার জন্য উপদেশ দিলেন—করযোড়ে মিনতি করিলেন। পেটের ভাত ও পরণের কাপড়

—তা যতই কেন মোটা হউক না—তাহাই লইয়া যে বাঙ্গালীকে নিজের পায়ের উপর ভর দিতে শিখিতে হইবে—এই কথাটা রজনীকান্ত তাঁহার সঙ্গীতের ভিতর দিয়া নানা ভাবে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে বলিয়া দিলেন। এখন আর তাঁহার গানে ভারত-মাতার অতীত গৌরবের কীর্ত্তন নাই, বঙ্গজননীর অপার্থিব রূপ-সৌন্দর্য্যের বর্ণন নাই—এখন তিনি সময়োচিত কাজের কথাগুলি একে একে তাঁহার গানের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর কাণে ও প্রাণে ঢালিয়া দিলেন। যে সকল কথা অবহিত চিত্তে শুনিয়া সেই মত কাজ করিতে না পারিলে, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইবে,—সেই কথাগুলিই সেই সময়ে রজনীকান্ত দেশের জনসাধারণকে নানা ছন্দে শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "সংকল্প," "তাই ভালো," "আমরা" ও "তাঁতী ভাই"—এই চারিখানি গানে তিনি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা-সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ইতিহাসে এই চারিখানি গান চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

যখন বাঙ্গালীর ধন, মান, প্রাণ,—সবই যাইতে বসিয়াছিল, আপাতমধুর চাকচক্যের মোহে যখন বাঙ্গালী উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত, যখন বাঙ্গালী অন্ন-সংস্থানের জন্য—লজ্জা-নিবারণের জন্য সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী—তখন রজনীকান্তই তাহাকে দেখাইয়া দিলেন—এই নাও তোমাদের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়।' এতদিন তোমরা মিহি বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিয়া বিলাসী হইয়াছ, বাবু বনিয়াছ—এখন আর বাবুগিরির সময় নাই। এখন এই মায়ের দেওয়া কাপড় তোমরা মাথায় তুলিয়া লও। কি বলিতে যাইতেছ—মোটা?—তা হইলই বা মোটা—ও যে মায়ের দেওয়া, তুমি যত্ন করিয়া গ্রহণ কর; ও যে তোমার স্বর্গাদপিগরীয়সী জননী-জন্মভূমির আশীর্ব্বাদ-নির্মাল্য—মাথায় করিয়া

লও। আশার একটা অভয় বাণী বাঙ্গালীর হৃদয়কে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ করিল। রোমাঞ্চিত দেহে, ভক্তিনম্র হৃদয়ে বাঙ্গালী বরেণ্য কবির এই মহান্ উপদেশ পালন করিল; প্রাণে প্রাণে বুঝিল—এ ভিন্ন আর তাহার অন্য গতি নাই—দ্বিতীয় পন্থা নাই।

শ্রোতার হৃদয়ের সুরে সুর বাঁধিতে পারিলে, সেই সুর অসাধ্য-সাধন করিতে পারে; সেই সুরে তাহার হৃদয় তোল্‌পাড় করিয়া দেয়: তখন সেই মথিত-হৃদয়-মধ্য হইতে হৃদয়ের সারবস্তু—প্রাণের প্রাণ নবনীতবৎ ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে। তখন যাহা পূত, যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা ইষ্ট—যাহা কল্যাণ ও মঙ্গল,—যাহা তাহার অস্তিত্ব-রক্ষার একমাত্র অবলম্বন--তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিবার তাহার কতই না আগ্রহ! তাই রজনীকান্তের—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই!—

বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে শত ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। এই গানের মধ্যে যেমন পবিত্র আদেশ ও করুণ মিনতি নিহিত আছে, তেমনই বাঙ্গালার চিরন্তন শাকান্ন ও মোটা কাপড়ের গরিমা পরিস্ফুট রহিয়াছে; আর ইহার ভাব ও ভাষা অতি সহজ ও সরল, তাই পণ্ডিত-মূর্খ, বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী, ইতর-ভদ্র—বাঙ্গালার সকলেই প্রাণে প্রাণে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুভব করিল। বাঙ্গালীর প্রাণ জুড়াইল, তাহার মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী মনের আশা শুনিতে পাইল। খাঁটি বাঙ্গালা কথায় রজনীকান্ত বাঙ্গালীকে তাহার ঘরের খাঁটি জিনিসটি দেখাইয়া দিলেন। স্বাদেশিকতায় রজনীকান্তের বৈশিষ্ট্য এইরূপে পূর্ণ-পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিতে পরামর্শ

দিয়াই কান্তকবি অন্নের সংস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিতেছেন,—

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব,
মা'র বাগানের কলার পাত।

—বাস্তবিকই মায়ের ঘরের ভাতের চাইতে—তা সে শুধু ভাতই হউক না কেন—তা'র চাইতে জগতে আর কি অধিক মিষ্ট ও মধুর খাদ্য থাকিতে পারে? আর মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব ও মা'র বাগানের কলার পাত—এগুলিও যে মায়ের প্রসাদী জিনিস। এগুলির মধ্যেই ত বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের, বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদার,—বাঙ্গালীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার নির্য্যাস নিহিত রহিয়াছে। এ বিষয়ে ত তর্ক-বিতর্ক নাই, বাদবিসংবাদ নাই, মতদ্বৈধ নাই—এমন কি চিন্তার প্রয়োজন পর্য্যন্ত নাই। এ যে সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। সেই জন্য কবি এই গানের নাম দিলেন, "তাই ভালো"—এবং গানের গোড়াতেই জোরে 'তাই ভালো' বলিয়া বাংলা সুরে আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীও সমস্বরে 'তাই ভালো' বলিয়া কবির মতে মত দিয়াছিল।

তাহার পর কান্তকবি তাঁহার স্বদেশবাসীকে আর্য্য-মর্য্যাদার মূলসূত্র "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"—বাক্য দৃষ্টান্ত-দ্বারা, সুর-সংযোগে বুঝাইয়া বলিলেন,—

ভিক্ষার চালে কাজ নাই—সে বড় অপমান;
মোটা হোক্—সে সোণা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান!
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় প'রব না, আর যেচে পরের কাছে;

মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে ;
দেখ্‌তো প'র্‌লে কেমন সাজে

তখন বাঙ্গালী বলিল আর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া 'ভিক্ষা দাও গো পরবাসি!' বলিয়া আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করিব না, স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিব, আত্মনির্ভর হইব, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিতে শিক্ষা করিব,—নতুবা জগতের সম্মুখে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। আমরা এতদিন 'মহা-যন্ত্রিতাড়িত জড়যন্ত্রবৎ নিয়ামকের সঙ্কল্প-সাধন-জন্য পরিচালিত হইতেছিলাম। আমাদের গমনে লক্ষ্য নাই, আসনে স্থৈর্য্য নাই, কার্য্যে সঙ্কল্প নাই, বচনে নিষ্ঠা নাই, হৃদয়ে আবেগ নাই,—যোগে একপ্রাণতা নাই।' মোহমুগ্ধ আমরা বিলাস-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছিলাম—তবু বিলাসকেই, এই ভোগস্পৃহাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছিলাম। তাই কবি হিন্দুর হিন্দুত্ব, আর্য্য-সভ্যতার মূলমন্ত্র, সুখ-দুঃখ-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্‌" সুরের মধ্য দিয়া, ভাষার ভিতর দিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

পরিশেষে স্বদেশভক্ত কবিকে—'আমরা' কাহারা?—এই প্রশ্নের বিচার করিতে দেখি। কবি বলিলেন,—'আমরা নেহাৎ গরীব,' বাঙ্গালী নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল,—'ইহ বাহ্য আগে কহ আর।' কবি বলিলেন,—'আমরা নেহাৎ ছোট,' বাঙ্গালী বলিল,—'ইহ বাহ্য আগে কহ আর।' কবি কহিলেন, 'তবু আছি সাত কোটি ভাই,' বাঙ্গালী কহিল,—'ইহোত্তম আগে কহ আর।' তখন বাঙ্গালীর কবি দুইটি ছোট শব্দ বলিয়া উঠিলেন,—'জেগে ওঠ',—আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল! তারপর সকলে মিলিয়া মহা কোলাহলে ও কুতূহলে গাহিতে লাগিল,—

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,—
তবু আছি সাত কোটি ভাই,—জেগে ওঠ'!

তখন সাত কোটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—এ আমাদের কিসের জাগরণ? আমরা এই সাত কোটি লোক জাগিয়া উঠিয়াছি, এখন কি করিব? কবি বলিলেন, এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে তোমাদের জন্ম। কি করিবে, তা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কাজ কর। তোমরা অভয়ার সন্তান—কাজের নামে ভয় পাও কেন? তোমাদের সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, কর্ম্মযোগীর সেই বজ্রনির্ঘোষ বাণী—

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

"পেও না ক্লীবত্ব, পার্থ!
—নহে তব যোগ্য কদাচন;
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ক্ষুদ্র
ত্যজি, উঠ—উঠ অরিন্দম!"

স্মরণ করিয়া ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর—দেহ হইতে অলসতা ঝাড়িয়া ফেল, তারপর কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া যাও। এই কর্ম্মভূমি ভারতে কাজের অভাব কি?—

জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান;
বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান;
আমরা মোটা খাব, ভাই রে প'র্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা রব কি উপোসী—ঘরে শুয়ে?

হারাস্‌নে ভাই রে আর এমন সুদিন ;
মায়ের পায়ের কাছে এসে যোটো।

তখন আবার সকলে মিলিয়া সমস্বরে গাহিল,—

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,—
তবু আছি সাত কোটি ভাই—জেগে ওঠ' !

মোহান্ধ বাঙ্গালী যেন এত দিন—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,—
পর কৈনু আপন—আপন কৈনু পর।"

—এই ভাবে তাহার জাতীয়-জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, স্বদেশ-প্রেমী রজনীকান্ত তাহাকে বাহির হইতে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মস্থ করিয়া দিলেন, নিজের কাজে লাগাইয়া দিলেন।

একজনের একটি কদাকার, কুৎসিত কাল' কুচ্‌কুচে ছেলে জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ছেলেটির মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"আমার চাঁদপানা ছেলে জলে ডুবে গেল গো।"—ভালবাসিতে হইলে এমনি করিয়া ভালবাসিতে হইবে। যত কুৎসিত হউক না কেন—যত দোষই কেন থাকুক না—আমার যাহা, তাহার সবটুকুই ভাল,—'আমার যা তা বড়ই মিঠে।' নিশ্চয়ই।

এই দেশের দেবতাই একদিকে শ্যাম—অন্যদিকে শ্যামা। এই দেশেরই জনসাধারণ এই কাল' ঠাকুর ও কালী ঠাকুরাণীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, কত যুগ যুগ হইতে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছে। আর এইরূপে ভালবাসিয়া ও ভক্তি করিয়াই তাহারা শ্যামসুন্দরের মদনমোহন রূপ এবং শ্যামা-মায়ের ভুবন-আলোকরা রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আছে।

আমরা সবাই ত মায়ের ছেলে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন

রজনীকান্তের মত মাকে প্রাণ-ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিয়া প্রণাম করিতে পারে ? ভারতসন্তান আমরা—যদি এই ভারতভূমিকে মা বলিয়া ডাকিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে পারি, তবেই আমরা রজনীকান্তের ন্যায় প্রকৃত দেশভক্ত হইতে পারিব। যে দিন এই দেশের নদনদী, গিরিগুহা, তরু-লতা, ঘাটমাঠ—ইহার প্রত্যেকের অণুতে পরমাণুতে আমার মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তির স্বরূপ দেখিতে পাইব, সেই দিন আমরা 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি' মাথায় লইয়া বাঙ্গালী-জন্ম সার্থক করিতে পারিব। মাতৃভক্ত রজনীকান্ত আমাদের দেশকে—আমাদের মাটিকে 'মা'টি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি একান্ত ভক্তিভরে এই মাটিকে পূজা করিয়া দেশাত্মবোধের প্রকৃত পরিচয় দানে দেশ ও দেশবাসীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

এজন্যই একদিন কথা-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ত্তমান যুগের স্বদেশী সঙ্গীতের কথায় বলিয়াছিলেন,—"যদি দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়-তন্ত্রীতে কাহারও সঙ্গীত অত্যধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে তাহা কবি রজনীকান্তের।" *

---

* নব্যভারত, শ্রাবণ, ১৩১৭—২১৪ পৃষ্ঠা।

সাধনতত্ত্বে

রজনীকান্তের কাব্যের ধারা ভগবৎ-প্রেমসিন্ধুনীরে ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্দাম ও উন্মত্তভাবে প্রবাহিত হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত বাধাবিঘ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া কিরূপ আকুলভাবে ছুটিয়া চলিয়াছিল এবং তাহার পরিণতিই বা কি হইয়াছিল, এইবার তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। যখন তাঁহার সাধনার ধারা হাস্যরস ও দেশাত্মবোধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, আপন ভুলিয়া, জগৎ ছাড়িয়া ভগবৎ-প্রেমসিন্ধুর পানে ছুটিয়াছিল, তখন রজনীকান্ত বুঝিয়াছিলেন,—

যাঁরে মন দিলে মন
ফিরে আসে না—

এ মন তাঁহারই রাতুল চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। ভগবৎ-প্রেমভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি সেই রূপময় ও গুণময়ের গলে বরমাল্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। মনের এই ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া রজনীকান্ত লিখিয়াছেন,—

বাবার কাছে সাগরের, রূপগুণ শুনেছি ঢের,
তাইতে স্বয়ম্বরা হ'তে—
সে প্রশান্ত সাগর পানে ছুটে' যাই।

* * *

——আমায় ধরে রাখ্‌বি কেউ?

কি টানে টেনেছে আমায়, উঠ্‌ছে বুকে প্রেমের ঢেউ,
(আমার) প্রাণের গানে সুধা ঢে'লে
প্রাণের ময়লা নীচে ফে'লে,
বাধা ভে'ঙ্গে চূ'রে ঠে'লে,—
কেমন ক'রে যাচ্চি চ'লে দেখ্‌না তাই !

এইরূপে যাহা রজনীকান্তের প্রাণের গান, সেই গানের সুধা-তরঙ্গ ঢালিতে ঢালিতে তাঁহার ভাবধারা প্রেমময়ের অপার ও অপরিমেয় প্রেমসাগরে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে ; নৃত্যপুলকে তাঁহার বক্ষ চঞ্চল, গীতিসুরে তাঁহার সুধাস্রাবী কলকণ্ঠ হইতে প্রেম-গীতি নিরন্তর ঝঙ্কৃত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সাগরসঙ্গমের যাত্রী দশ দিক্ মুখরিত করিয়া গাহিয়া চলিয়াছে,—

ফেলে দে মন প্রেম-সাগরে,
হারিয়ে যাক্‌রে চিরতরে,
একবার, পড়্‌লে সে আনন্দ-নীরে
ডুবে যায়, আর ভাসে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে কান্তকবিকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার সাধন-সঙ্গীতগুলি ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, অবহিতচিত্তে পাঠ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুরে বলিতে পারি, সেগুলি কষ্টকল্পিত, যশোলালসা বা কবি-গৌরবপ্রাপ্তির জন্য রচিত হয় নাই। হৃদয়ের অন্তস্তলবাহী ভক্তিনির্ঝরিণী হইতে এগুলি স্বতঃ উৎসারিত। আর এইগুলিতে কবির প্রাণের কথা সরলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সে প্রাণের কথা পাঠ করিয়া আমাদের ন্যায় অনেককেই চোখের জল ফেলিতে হইয়াছে।

রজনীকান্তের এই সাধন-সঙ্গীতগুলির ভাষাও যেমন সরল ও প্রাঞ্জল, ভাবও তেমনই মর্ম্মস্পর্শী ও প্রাণারাম; অথচ এগুলি প্রসাদগুণে

ভরপুর। একবার পাঠ করিলেই বা গায়ক-কণ্ঠে শুনিলেই কাণ ও প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

সাধন-সঙ্গীত-রচনায় রজনীকান্ত যে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কবি গুরুপ্রসাদ সেন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন; তিনি সাধক কবি—ভক্তকবি ছিলেন। তাঁহার এই শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁহার রচিত "পদচিন্তামণিমালা" ও "অভয়াবিহার" কাব্য দুইখানির ভিতরে পাই। তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিলে, রজনীকান্তকে বুঝা সহজ হইবে। এইখানে তাই আমরা গুরুপ্রসাদের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছি। একটিতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বরাগের বর্ণনা কবি কি সুন্দরভাবে করিয়াছেন,—

কাঞ্চন বরণ, বয়ন শচীনন্দন,
মলিন মলিন পরকাশ।
অবনত মাথে, অবনী অবলোকই
চলু চল নয়নবিলাস॥
সহগণ সঙ্গ, গরল অনুমানত,
চিতহুঁ উচাটন ভেল।
শ্রবণযুগল পুন, কাহে চকিত রহু,
না বুঝি মরমকি কেল॥
গগন-বিহারী জলদ ঘন হেরি।
লুবধ নয়ন জনু, নিমিখ নিবারত,
লোর ঝুরত বেরি বেরি॥
হরি হরি নাম, শুণহু চরিতামৃত
পিই পিই রহত উদাস।

প্রেম পরম ধন, জগতে ভসায়ল,
বঞ্চিত পরসাদ দাস ॥

মদনমোহনের মধুর মুরলীধ্বনি শুনিয়া শ্রীমতী রাধিকা প্রিয়সখীকে যাহা বলিয়াছিলেন—অপরটিতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ;—

কহ কহ শুনি, তুয়া মুখে শুনি,
মুরলি নামের মালা।
মধুর বয়নে, শুনিলে এ সখি,
ঘুচব হামারি জ্বালা ॥
কেবা আলাপয়ে, ললিত মুরলি,
দেব কি কিন্নর সেহ।
কিবা অপরাধে, বিধঁয়ে পরাণ,
আকুল হামারি দেহ ॥
অলপ বিবর, কহসি এ সখি,
অপরূপ তুয়া বাক্।
শবদ পরশে, হামারি হৃদয়ে,
বিবরহি লাখে লাখ্ ॥
সখি, হামে পুন হাম নহিয়ে।
রহ কি যায়ব এ পাঁচ পরাণ,
সংশয় নাহি ছুটিয়ে ॥
মিনতি করিয়ে, কহ কহ সখি,
কেবা সে করয়ে নাদ।
প্রসাদ ভণয়ে, শুনিলে এ ধ্বনি,
দ্বিগুণ বাঢ়ব সাধ ॥

পিতার এই অপরূপ কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণভাবে পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল।

রজনীকান্তের অধিকাংশ সাধন-সঙ্গীতের ভিতরেই ঐকান্তিক নির্ভরতা ও গভীর বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়। যে ভাষায় সেগুলি রচিত, যে ছন্দে সেগুলি গ্রথিত, যে ভাবে সেগুলি মণ্ডিত, তাহাতে অতি সহজেই সেগুলি প্রাণের তারে গিয়া ঝঙ্কার দেয়। তাঁহার সমস্ত সাধন-সঙ্গীত-গুলির ভিতরেই আমাদের সনাতন ভাবধারার সরল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর এগুলির ভিতরে বেশ একটি সুন্দর ও সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা বর্ত্তমান। এখানে সেই ভাবধারার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

আত্মীয়-স্বজন-পরিবৃত—পুত্রপরিবারবর্গের আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত গৃহেও রজনীকান্তের মনে মাঝে মাঝে গভীর অতৃপ্তি আসিত—নির্ব্বেদ উপস্থিত হইত। তাই নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়া, তাঁহার—

হৃদয়ে বহ্নিজ্বালা, নয়নে অন্ধ-তমঃ

দেখা দিল। জীবন তাঁহার কাছে তখন দুর্ব্বিবহ, তখন—

পাপচিত্ত, সদা তাপলিপ্ত রহি',
এনেছে দুরপনেয় মৃত্যু বিকার বহি',
দিতেছে দারুণ দাহ হৃদয়-দেহ দহি'।

তার পর তিনি তাঁহার সাধের সাজান বাগানের শ্যাম-শীতল ছায়ায় বসিয়াও কি নিদারুণ মর্ম্ম-কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন,—

আগুনে পুড়িয়া হ'য়ে গেছি ছাই,
ধূলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই?
একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ,
দুখে পাপে তাপে জ্বলে'।

আর এইরূপে পাপে তাপে জ্বলিয়া, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া তিনি বলিতেছেন,—

মাগো, আমার সকলি ভ্রান্তি।
মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মমতা;
মরুভূমি সুধু, করিতেছে ধূ ধূ!
হেথা, কেবলি পিয়াসা, কেবলি শ্রান্তি।

তিনি দেখিলেন, এই ভ্রান্তির মোহে তাঁহার পথের সম্বল, তাঁহার বিবেক, তাঁহার ধর্ম্ম সকলই তিনি হারাইতে বসিয়াছেন; ঠিক সেই সময়ে কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া গেল—

"বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

"বেলা যে ফুরায়ে যায়"—সত্যই ত রজনীকান্ত দেখিলেন, বিষয়কূপে নিমগ্ন হইয়া তিনি হাবুডুবু খাইতেছেন; আর তাঁহার চারি দিকে বিভীষিকার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ক্রমশঃই তিনি নিমজ্জিত হইতেছেন। এই অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া উদ্ধারের আশায় কাতরকণ্ঠে রজনীকান্ত ডাকিলেন,—

"ধ'রে তোল, কোথা আছ কে আমার!
একি বিভীষিকাময় অন্ধকার!
কি এক রাক্ষসী মায়া, নয়নমোহন-রূপে,
ভুলায়ে আনিয়া মোরে ফেলে গেল মহাকূপে!
শ্রমে অবসন্ন কায়, কণ্টক বিঁধিছে তায়,
বৃশ্চিক দংশিছে, অনিবার।

তাঁহার দেহ কর্দ্দমলিপ্ত, কণ্টকাঘাতে রুধিরাক্ত ও বলহীন, মন নিরাশায় পরিপূর্ণ ও দারুণ অবসাদে অবসন্ন; স্বার্থময় পৃথিবীর নিষ্ঠুরতাভরা প্রবঞ্চনা দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত। এই ভাবে বিপন্ন ও নিরুপায় হইয়া তিনি জীবনে হতাশ্বাস হইলেন। রজনীকান্তের সাধন-সঙ্গীতের মধ্যে ভাবের এই প্রথম স্তর বা ধারা দেখিতে পাই।

ইহার পরের স্তরে আমরা দেখিতে পাই, গতজীবনের কৃতকর্ম্মের জন্য রজনীকান্তের মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, 'কুটিল কুপথ ধরিয়া' তিনি তাঁহার গন্তব্য পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। অনুতপ্ত রজনীকান্তকে তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতে দেখি—

কি মোহ-মদিরা-পানে বৃথা এ জনম গেল,
নয়ন মেলিয়া দেখি শমন নিকটে এল।

অনুশোচনার এই মর্ম্মদাহী তাপে তাপিত হইয়া রজনীকান্ত শ্রীভগবানের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

আজীবন পাপলিপ্ত, ল'য়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত;
সব হারাইয়া প্রভু, হয়েছি ভিখারী দীন,
তোমারে ভুলিয়া, হায়, নিরানন্দ কি মলিন!
কোন্ লাজে দিব পায়? এ হৃদি কি দেওয়া যায়?
সে দিন আমার গতি কি হবে, হে দীনগতি?

তিনি জানিতেন,—

মূলের কড়ি সব খোয়ায়ে,
কল্লেম মিছে দাদন।

তাই তাঁহার অন্তরের অন্তর হইতে মর্ম্মব্যথা গুমরিয়া উঠিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার—

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে!

হায় হায়, আমি কি করিয়াছি—আমি যে—

নয়নে বসন বাঁধিয়া,

বসে', আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া।

আমি যে কিছুই দেখি নাই, কিছুই বুঝি নাই—

লোকে যখন বলিত তুমি আছ, তখন

ভেবে দেখিনি আছ কি না,

তখন আমি বুঝিনি, প্রভু

আমার নাস্তি গতি তোমা বিনা।

তোমারি দেওয়া এই যে আমার মন—এও ত তোমারি গুণ-গরিমা ভুলিয়া রহিয়াছে। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি বসিয়াছিলাম; আমার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য তুমি মাতৃরূপে আসিয়া কত ডাকিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমার সে ডাকে সাড়া দিই নাই—

আমায়, ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা ;—

আমি শুনেও জবাব দিলাম না !

তখন যে আমি মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম।

যখন রজনীকান্তের এই নিদ্রাঘোর কাটিয়া গেল, যখন আবার তিনি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই অসময়ের বন্ধুর চরণে কাতরে নিবেদন করিলেন,—

নিবিড় মোহের আঁধারে আমার,

হৃদয় ডুবিয়া আছে ;

কত পাপ, কত দুরভিসন্ধি,

আঁধারে লুকায়ে বাঁচে।

হে আমার প্রাণনাথ, হে আমার দিব্য আলোক, তুমি আমার এই অন্ধকার হৃদয়ে উদয় হও, তোমার উদয়ে—

হউক আমার মঙ্গল প্রভাত,
তাদের লুকাবার স্থান, ভাঙ্গ, ভগবান্,
তারা লাজে হোক্ মরমর।

"কল্যাণী"তে প্রকাশিত 'ভেসে যাই' সঙ্গীতের মধ্যেও এই প্রকার গভীর অনুশোচনার সুর শুনা যায়। ইহাই রজনীকান্তের সাধন-সঙ্গীতের দ্বিতীয় স্তর।

তৃতীয় স্তরে দেখি—অনুতপ্ত রজনীকান্ত এই দুঃখ, বিপদ্, মোহ ও ভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। তিনি ভাবিতেছেন,—

কার নাম স্মরি, দুখে পাই শান্তি?
বিপদে পাই অভয়, মোহে যায় ভ্রান্তি?
কার মুখকান্তি, হরে ভব-শ্রান্তি?

সেই পরিত্রাতার অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হইলেন;—অনুসন্ধান করিতে করিতে, তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—

আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,
আছে মাত্র একজন চিরবন্ধু সুখে দুখে!
বিপন্নের ত্রাণকর্ত্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,

আর—

কাঁদিলে সে কোলে করে, মুছে অশ্রু নিজ-করে।

তখন আশার অভিনব আলোকে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল;—তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, এই বিপদ্জাল হইতে রক্ষা করিতে একজনই পারেন,—

সেই যদি করেগো উদ্ধার।

সেই বিপন্নের ত্রাণকর্ত্তার সন্ধান পাইয়া রজনীকান্ত দেখিলেন—তাঁহার সেই চিরবন্ধুর

বিপুল প্রেমাচল-চূড়ে, বিশ্বজয়-কেতু উড়ে
পুণ্য-পবন হিল্লোলে, মন্দ মৃদু মৃদু দোলে
দিয়ে শান্তি-কিরণ রেখা, মহিমা-অক্ষরে লেখা,—
"ক্লিষ্ট কেবা আয় রে চলে, চিরশীতল স্নেহকোলে।"

সেই চিরশীতল স্নেহকোলে উঠিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করিবার জন্য রজনীকান্ত ব্যাকুল হইলেন।

ইহার পরের স্তরের সঙ্গীতগুলি মনঃশিক্ষামূলক। বিপন্নের বন্ধুর সন্ধান পাইয়া রজনীকান্ত মনঃশিক্ষায় মনঃনিবেশ করিলেন—মনকে বলিলেন,—

যা খেলে আর হয় না খেতে,
যা পেলে আর হয় না পেতে,
তাই ফেলে দিনে রেতে,
মরিস্ কিসের পিপাসায়?

তাই বলি,—

আর কেন মন মিছে ঘুরিস্
হিমে মরিস্, রোদে পুড়িস্
প্রেম-গাছের তলায় বস্ মন
যাবে হৃদয় জুড়ায়ে।

তোর গণা দিন যে ফুরাইয়া আসিল—তুই যে,

পার হ'লি পঞ্চাশের কোঠা
আর দু'দিন বাদে মন রে আমার
ফুল ঝরে যাবে, থাক্‌বে বোঁটা।

এখন সময় থাকিতে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি,—

তোর, মিছের জন্য সত্যি গেল, এই ত হ'ল লাভ,
সার যেটা তাই সার ভাব না,
সার ভাব এই শরীরটাই।

আর এই শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তির জন্য কত অসার জিনিসের খোঁজে তোর সারা জীবন কাটিয়া গেল; কিন্তু একবারও,—

তুই কি খুঁজে দেখেছিস্ তাকে ?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক
পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে।
বসে কোন্ বিজন দেশে
তোর ভাব্না ভাব্ছে রে সে,
আছিস্ কি গেছিস্ ভেসে
সেখান থেকে খপর রাখে।

—এখন আসলে মন দাও—এ ক্ষণভঙ্গুর অসার শরীরের সেবা ছাড়িয়া, সেই সকল সারের যিনি সারনিধি, তাঁহারই ভাবনা কর। বৃথা মায়ায় জড়িত হইয়া এত দিন তুই কর্‌লি কি ? তোর—

কবে হবে মায়ার ছেদন
কারে বল্‌বি প্রাণের বেদন ?
ইহ পরকালের গতি, সে
দয়াল হরির চরণে জানা।

তাই বলি,—

যদি, বেলাবেলি ঘাটে যাবি, হাল্কা হ'য়ে চল্‌বি ;
তবে, খুলে ফেল তোর পায়ের বেড়ী, ফেলে দে তোর ঝাঁপি।

—তুই যে বড় ভুল ক'রেছিস্—এ ত তোর বাড়ী নয়, এ যে তোর বাসা—

ওরে, এ পারে তোর বাসারে ভাই
ও পারে তোর বাড়ী ;
এই, কথাগুলো খেয়াল রেখে
জমিয়ে দে রে পাড়ি।

যখন ও-পারের সেই নিজের বাড়ীর—অভয়দাতার সেই অভয়নগরের সন্ধান রজনীকান্ত পাইলেন, তখন তিনি মনকে বলিলেন,—

ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে
ও তুই, যাবি যদি ওপারের সেই অভয়নগরে।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দিলেন—

কাজ কি রে তোর সের ছটাকে
বেঁধে নে তোর দেহের ছ'টাকে
শিখে নে রে পরিমিতির নিয়মটাকে
রাখ চতুর্ভুজের গুণটী জেনে।

উদ্ধৃত স্থলগুলি ব্যতীত "বাণী"র 'শেষদিন', 'পরিণাম', 'শুদ্ধপ্রেম', "কল্যাণী"র 'নশ্বরত্ব', 'কত বাকী', 'এখনও', 'বৃথাদর্প', 'ধর্‌বি কেমন করে', 'অসময়', 'মূলে ভুল' ; এবং "অভয়ার" 'রিপু', 'অকৃতজ্ঞ', 'অরণ্যে রোদন', ও 'খেয়া' প্রভৃতি গানগুলিতে মনঃশিক্ষার বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়।

এইবার সেই অভয়নগরের মালিকের সন্ধানে যাইতে যাইতে রজনীকান্তের মনে—সেই করুণাময় ভগবানের, তাঁহার সেই চিরসখার অযাচিত করুণার, অপরিমেয় স্নেহের মনমাতান ছবি সুন্দরভাবে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাই আমরা তাঁহাকে প্রথমেই গাহিতে শুনি,—

(আমি) অকৃতী অধম বলে'ও তো, কিছু
কম ক'রে মোরে দাওনি !

যা' দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,

কেড়েও ত' কিছু নাওনি !

(তব) আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে,

পায়ে দ'লে গেছি, চাহি নাই ফিরে ;

তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ,

প্রতিদান কিছু চাওনি।

* * *

(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,

শত বার যাই বাঁধন কাটিয়া,

ভাবি, ছেড়ে গেছ,—ফিরে চেয়ে দেখি,

এক পাও ছেড়ে যাওনি।

ভগবানের করুণাময়ত্বের এমন প্রকৃত ও মধুর পরিচয় আধুনিক কবিতার মধ্যে বড় একটা পাওয়া যায় না। আমি শত বার তোমার বাঁধন কাটিয়া পলাইয়া যাই—আর মনে করি, তুমিও ক্লান্ত-বিরক্ত হইয়া আমায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু এ কি করুণাময়, তুমি যে আমার সান্নিধ্য ছাড়িয়া এক পাও যাও নাই! আমার এই সারা জীবনে আমি ত তোমাকে চাহি নাই, একবারও তোমাকে ডাকি নাই; তবু তুমি আমার ডাকার অপেক্ষা রাখ নাই, আমি না ডাকিতেই আমার অনাদৃত হৃদয়-দেবতা, তুমি

——(আমার) হৃদয়-মাঝারে

নিজে এসে দেখা দিয়েছ।

* * *

(আমি) দূরে ছুটে যেতে দু'হাত পসারি।

ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।

জীব যে ভগবানের কত আপনার—কত প্রিয় ; তাহাকে তাঁহার প্রেমময় —স্নেহময় কোলে তুলিয়া লইবার জন্য সেই জীবসখা যে ব্যাকুলভাবে অহরহ ছুটিতেছেন—ইহা বুঝিতে পারিলে জীবের আর দুঃখ থাকে কি ?

"ওপথে যেও না ফিরে এস" ব'লে

তুমি আমার কাণে ধরিয়া কতবার নিষেধ করিয়াছ ; তোমার নিষেধ না মানিয়া আমি তবুও সেই বিপথে ছুটিয়াছি, আর তুমি—আমার সদা-মঙ্গলকামী সখা,আমাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিছু পিছু ছুটিয়াছ ;—

এই, চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসিমুখে তুমি বয়েছ ;
আমার, নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে করে নিয়ে রয়েছ ;

ভগবানের অশ্রান্ত করুণার এই মধুর পরিচয়ে পাষাণহৃদয়ও গলিয়া গিয়া, তাহার ভিতর হইতে প্রেম-মন্দাকিনীর ধারা সহস্রধারে বাহির হইয়া পড়ে। অন্য দিকে রজনীকান্ত কি সুন্দরভাবে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর প্রাণারাম মাতৃমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন দেখুন,—অবোধ ও অবাধ্য পুত্রের দুঃখে ব্যথিত হইয়া মা—

এল ব্যাকুল হয়ে, "আয় বাছা বলে"—
"বাছা তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে নারি,
আয় করি কোলে ;
আয় রে মুছায়ে দিই তোর মলিন বদন
আয় রে ঘুচায়ে দিই তোর বেদনা।"
আমি দেখ্‌লাম মায়ের দু'নয়নে নীর
মায়ের স্নেহে গলে, ঝর ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর।

অন্য স্থলে অনুতপ্ত অপরাধী পুত্রের স্বীকারোক্তির মধ্যেও এই ক্ষমাময়ী স্নেহময়ী মায়ের ছবি আরও কত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—তাহা দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—

আহা, কত অপরাধ করেছি আমি
তোমারি চরণে মাগো!
তবু কোলছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চলে গেলে না গো।
আমি চলিয়া গিয়াছি "আসি" বলে
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখিজলে
কত, আশীষ করেছ বলেছ "বাছারে
যেন সাবধানে থেকো;
আর পড়িলে বিপদে যেন প্রাণভরে
"মা" "মা" বলে ডেকো।
ওমা, আমি দেখি বা না দেখি বুঝি বা না বুঝি
তুমি সতত শিয়রে জাগো।

মায়ের এই করুণার ছবি দেখিয়া রজনীকান্তের মনে ধিক্কার জন্মিল—তাঁহার দারুণ লজ্জা হইল। তাঁহার মনে হইল, এই এমন আমার মা—আর তাঁর ছেলে আমি—অনুতাপে তাঁর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এমন যে মা, সেই মাকে তুই অবহেলা করিয়াছিস্—আর এখন দেখ—

যে মাকে তুই হেলা ক'রে বল্‌তিস কুবচন,
সেই ক্ষমার ছবি বলছে কাণে "জাগ্‌রে যাদুধন!"
তোর একই কাতে রাত পোহালো ভাঙ্গলো না স্বপন
তোর জীবন-রাত্রি পোহায় এখন উষার আগমন।

তোর সেই "ক্ষমার ছবি" মা-ই তোকে এখন সাবধান করিয়া তোর মঙ্গল-উষার আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া দিতেছে।

এই স্তরের কবিতাগুলিতে জীবের প্রতি শ্রীভগবানের মমতার ও অযাচিত করুণার পরিচয় কি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে শ্রীভগবানের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য রজনীকান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মনের এই অবস্থায় রজনীকান্ত তাঁহার সেই করুণাময় দেবতার উদ্দেশে বলিলেন—

কত দূরে আছ প্রভু প্রেম-পারাবার ?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ দীন ক্ষীণ জলধার।

* * *

ওহে মায়া-মোহহারি ! নিগড় ভাঙ্গিতে নারি,
নিরুপায় বন্দী ডাকে, অধীর আকুল প্রাণে।

যখন তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহার প্রাণের দেবতাকে এইরূপে ডাকিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই সদয় ঠাকুর নিদয় হইয়া একেবারে দূরে পলাইয়া গেলেন। দেবদর্শন-বঞ্চিত রজনীকান্তের প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইল—

দেবতা আমার, কেন দুখ দাও,
দাঁড়াও বলিতে দূরে চলে যাও,
ডেকে ডেকে মরি, ফিরে নাহি চাও
দয়াময় কেন নিদয় এমন ?

—এত ডাকেও যখন তিনি দেখা দিলেন না ; তখন তাঁহার দেবতার উপর রজনীকান্তের নিদারুণ অভিমান হইল—সেই অভিমানে তিনি বলিলেন —

যদি, মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?

* * *

যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন-পতি,
পতিতপাবন নাম নিলে গো ?

* * *

জীবনে কখন আমি, ডাকি নি হৃদয়স্বামি,
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

করুণাময়ের কাছে করুণা না পাইয়া, রজনীকান্ত করুণাময়ী মায়ের করুণার উদ্রেক করিবার জন্য কি করুণ সুরের রোল তুলিলেন দেখুন,—

কোলের ছেলে, ধূলো ঝে'ড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে।

* * *

কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে।

রজনীকান্ত মনে স্থির জানিতেন, তাঁহার এই 'অধীর ব্যাকুলতা' সেই করুণাময় শ্রীভগবান্ ও করুণাময়ী জগজ্জননীর শ্রীচরণ লাভ ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিবে না ; তাই তিনি একান্তমনে প্রার্থনা করিলেন—

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল-নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

মনের এই নিদারুণ ব্যাকুল অবস্থায় রজনীকান্ত সার বুঝিলেন, তাঁহার কৃপা না হইলে, তিনি নিজে করুণা না করিলে শ্রীভগবানের দর্শন-

লাভ সম্ভবপর নয়। তাই তাঁহার করুণার ভিখারী হইয়া রজনীকান্ত শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রজনীকান্তের এই করুণা-ভিক্ষা ও প্রার্থনা কি অকপট—কি কুণ্ঠাহীন—কি নির্ম্মল! অন্তরের অন্তর হইতে এগুলি স্বতঃ উৎসারিত—

তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচা'য়ে।

* * *

প্রভু, বিশ্ববিপদ হন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত-বাসনা গুছায়ে।

আমার কিছু শক্তি নাই, তুমি দয়া করিয়া আসিয়া 'হে বিশ্ব-বিপদ-হন্তা' আমার ভক্তিপথবিরোধী পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াও। আমি যে দুর্ব্বল—আমি যে অক্ষম—আমি যে পতিত, তাই হে পতিতপাবন—

দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়।

আমার যে-

দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন,
দীনতারা, ঘুচাও দীনের দুর্দ্দিন,
'আশা'-রূপে থাগো, নিরাশ প্রাণে জাগো,
দিয়ে ও চরণ অক্ষয় শান্তি।

মায়ের নিকট শান্তি-ভিক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার প্রাণে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল না, তখন তিনি তাঁহার চিরসাথীকে বলিতেছেন—

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে!
শ্রান্ত চিত, শ্রান্ত পদ, ঘিরিল দুখরাতি হে।

*   *   *   *

ক্ষেমময়! প্রেমময়! তার নিরুপায়ে হে;
মরণদুখহরণ! চিরশরণ দেহ পায়ে হে।

ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার প্রার্থনার সুর কি উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে দেখুন। রজনীকান্ত জানিতেন যে, সুখের মাঝে তিনি ভগবানকে ভুলিয়া থাকেন—সম্পদের কোলে বসিয়া গর্ব্বে তিনি আত্মহারা হইয়া যান, তাই আত্মজয় করিবার জন্য, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, বিপদ্‌কে বরণ করিয়া লইয়াছেন। ভগবানকে কি ভাবে পাইলে রজনীকান্তের প্রাণ তৃপ্ত হইবে, তাহা একবার তাঁহার ভাষায় পাঠ করুন—

হেরিতে চাহি চ'খে শুনিতে চাহি কাণে,
কর-পরশ চাহি, যেন তুমি স্থূল!

তোমার ভুবন-ভুলানো রূপ দেখিতে চাই, তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর স্বকর্ণে শুনিতে ইচ্ছা করি, তোমার শান্ত-শীতল করযুগলের সুকোমল স্পর্শ লাভ করিবার জন্য এ প্রাণ ব্যাকুল। কিন্তু এই যে দেখা—পার্থিব দুইটি চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ত সাধ মিটে না—আমাদের এই দুইটি কাণ দিয়া তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠ-সঙ্গীত-সুধা-পানের পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না—এই একটি মাত্র কণ্ঠ দিয়া সেই চিরদয়িতের যশঃকীর্ত্তন করা অসম্ভব, তাই রজনীকান্ত প্রার্থনা করিতেছেন—

কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত
তুলিতে তোমারি যশরোল !

পৃথিবীর নানা পাপ-তাপ, আশঙ্কা-ভয়ের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য রজনীকান্ত প্রার্থনা করিলেন—

ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে, সদা তব
সাথে থাকি যেন, সাথে গো ;
অভয়-বিতরণ চরণ-রেণু,
মাথে রাখি যেন মাথে গো ।

"কল্যাণীর" 'প্রাণ-পাখী' গানে তাঁহার প্রাণের প্রার্থনার সুরের বেশ একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে,
উধাও ক'রে লয়ে যাও এ মন ।

* * *

(প্রভু) বাঁধ তব প্রেম-সূত্র (এই) অবশ পাখায় হে ;
(আর) ধীরে ধীরে তব পানে টেনে তোল তায় হে ;

* * * *

(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে ;
(যেন) সব ভুলি', ওই বুলি, বলে অবিরাম হে ;

ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া ও তাঁহার চরণে প্রাণের প্রার্থনা জানাইয়া রজনীকান্ত তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতে বসিলেন। তাঁহার এই সরল আত্মনিবেদনের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা বা

লুকোচুরি নাই। কপটতা তিনি কোন দিনই ভালবাসিতেন না। ভণ্ডামিকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। বাড়াবাড়ি তাঁহার জীবনে কোন দিনই ছিল না; তাই তাঁহার কবিতায়—এই আত্ম-নিবেদনের ভিতরে তাঁহার প্রাণের সরল কথাই দেখিতে পাই—

করিনে তোমার আজ্ঞাপালন,
মানিনে তোমার মঙ্গল শাসন,
তোমার, সেবা নাহি করি তবু কেন, হরি
লোকে বলে মোরে 'হরিদাস'!

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি!
আমি দশের চ'খে ধূলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি!

* * *

যেমন পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখি;—
অমনি চমকে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্‌ছে তোমার আঁখি!
তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চরণতলে পড়ি,—
বলি "বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি।"

আমি সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে;
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গ-সুখ চাহিনে।

* * *

আমি কার তরে দিই আপনা বিলায়ে
ও পদতলে বিকাইনে;

আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা,
মনেরে সুধু শিখাইনে !

"অভয়া"র "পাগল ছেলে" নামক গানে—

আমার প্রাণ র'বে তোর চরণতলে,
দেহ র'বে ভবে ।

ছত্র হইতে রজনীকান্তের আত্মনিবেদনের গতি কোন্ দিকে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উত্তরকালে হাসপাতালের রোজনাম্চায় এই ভাবের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

ইহার পরে রজনীকান্ত সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের সত্তানুভব করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, এই যে গৃহ—যাহার মধ্যে আমি বাস করিতেছি—এ যে তোমার, যে অন্ন খাইয়া আমি প্রাণধারণ করিতেছি—ইহাও যে তোমারি দান, যে বায়ু সেবন করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, তাহাও যে তোমার, আর—

তোমারি মেঘে শস্য আনে,
ঢালি পীযূষ জলধারা,
অবিরত দিতেছে আলো,
তোমারি রবি-শশি-তারা,
শীতল তব বৃক্ষছায়া
সেবে নিয়ত ক্লান্ত কায়া।

এই জ্ঞান হইতে রজনীকান্ত যে অভিনব দৃষ্টি লাভ করিলেন, তাহার দ্বারা সর্ব্বভূতে ভগবানের সত্তানুভব করিয়া গাহিলেন—

আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর-সলিলে গহনে,

আছ, বিটপি-লতায়, জলদের গায়,
শশি-তারকায় তপনে।

ভগবানের বিশ্বরচনার মধ্যেও রজনীকান্ত তাঁহার সত্তা কি ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন, তাহা দেখিলে আনন্দে অভিভূত হইতে হয়—

চিরপ্রেম-নির্ঝরের একটি বুদ্বুদ ল'য়ে
ফেলে দিলে, প্রেমধারা চলিল অশ্রান্ত ব'য়ে,
অমনি, জননী করিল স্নেহ, সতী-প্রেমে পূর্ণ গেহ,
গ্রহ ছুটে এ উহার পাছ।

"কল্যাণীর" 'তুমি মূল' নামক কবিতায় সেই চিরসুন্দরের অক্ষয় সৌন্দর্য্য, তাঁহার অপার ও অপরিমেয় প্রেম, তাঁহার অকথিত ও অগণিত মহিমার পরিচয় কি সরলভাবে ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখুন,—

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময়
তুমি উজ্জ্বল, তাই—নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়!

*　　*　　*

তুমি প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে,
তাই মধু মমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি' প্রেম-কথা কয়;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেম জয়!

এইভাবে সর্ব্বভূতে, স্থাবর-জঙ্গমে শ্রীভগবানের সত্তানুভব করিয়া রজনীকান্ত—তাঁহাকে হৃদয় ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আর এই ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিলেন, কে যেন তাঁহার আঁখি-তারকার উপরে—

মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়।

আর তাহার ফলে তিনি সেই চিরসুন্দরের সৃষ্টির সকলই সুন্দর, সকলই নয়নমনোহর দেখিতে লাগিলেন,—

সুন্দর তব, সুন্দর সব,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।

গভীর বিশ্বাসের সুরে রজনীকান্তের হৃদয়-বীণার তার বাঁধা ছিল। তাঁহার সাধন-সঙ্গীতগুলিতেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, তাঁহার বিশ্বাসের কাছে বাতবিক্ষুব্ধ তৃণের ন্যায় দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহার এই বিশ্বাস কি অগাধ ও অপরিমেয় ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি পাঠে জানিতে পারা যায়,—

তুমি কি মহান্, বিভু, আমি কি মলিন ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিলবিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র,
তবু, তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস।

ভগবানের অসীম করুণা উপলব্ধি করিয়া উঁহাকে লাভ করিবার জন্য যখন তাঁহার প্রাণে দারুণ পিপাসা জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি বুঝিলেন, তিনি ভিন্ন এ পিপাসা কেহই দূর করিতে পারিবে না। তাই অটল বিশ্বাসে তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে শান্তি-সুখ-সুধা ;
পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব সনে অমৃত যোগ।

ভগবানের করুণা ও ভালবাসা লাভ করিয়া রজনীকান্ত গভীর বিশ্বাসের সুরে গাহিতেছেন—

কোন্ অজানা দেশে আছ কোন্ ঠিকানায়,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাস যে আমায় ;
গোপনে যাওয়া আসা, ভালবাসা, চোখের আড়াল সব,
লোক দেখান নয় হে তোমার করুণা নীরব।

"কল্যাণীর" 'বিশ্বাস' নামক কবিতায় এই বিশ্বাসের সুর একেবারে চরমে পৌঁছিয়াছে ;—

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে না হয় মরণে !

আশার কি অভয় বাণী ! তোমাকে পাবই—তুমি দেখা দেবেই—শুধু দেখা দিয়াই তুমি ত ক্ষান্ত হও না,—

আমি শুনেছি হে তৃষা-হারি !
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি।

তার পর শ্রীভগবানই যে অগতির গতি, অশরণের শরণ, অনাথের নাথ—তাহার বার্ত্তা কবি নিম্নের দুই ছত্রে কি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার।

এই পরিচয় পাইয়াই রজনীকান্ত জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন—

তব, করুণামৃত পানে, হবে
কঠিন চিত দ্রব হে ;
আমি, পাইব তব, আশীষ-ভরা,
জীবন অভিনব হে।

এই বিশ্বাসের সাহায্যে রজনীকান্ত বুঝিলেন, তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইবে—

সে যে যোগি-ঋষির সাধনের ধন ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, "সর্ব্বং সমর্পিতমস্তু" ব'লে যে জন ডাকে।

সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে একান্তভাবে নির্ভর করিতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তাই রজনীকান্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া লিখিলেন,—

আমি দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত ;
তুমি, আমারে যা দাও সবি তোমারি মত।

আকুল হইয়া আমি যে কতই কি চাহি। চাওয়ার আমার ত অন্ত নাই—শত নিষ্ফল বাসনা তবুও যে কাঁদিয়া মরে। আমি জানি না, কিন্তু

কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান দয়াময়—

আর কেনই বা কি সংকল্প-সাধনের জন্য আমি এত চাহিয়া মরি, তাহাও ত জানি না, কিন্তু—

তুমি জান কিসে হরি,
সফল হইবে মম জীবন-ব্রত।

এই ভাব প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া রজনীকান্ত বলিলেন—

চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত।

এই প্রকারে—সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া ভগবৎ-করুণা-বিশ্বাসী রজনীকান্ত শ্রীভগবানকে বলিলেন—

কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা' ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব ?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।

* * *

আমি জানি তুমি আমারি দেবতা
তাই আনি হৃদে বরি হে।

তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়
যখন যে রূপে প্রাণ ভ'রে যায়
তাই দেখি প্রাণ ভরি হে।

কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কি সুন্দর প্রাণারাম কথা রজনীকান্তের অমর লেখনীমুখে বাহির হইয়াছে—তোমায় ডাকিতে ডাকিতে আমার এই দগ্ধহৃদয় জুড়াইয়া যায়; আর হে অনন্ত রূপময়, তোমার যেরূপে যখন আমার প্রাণ ভরিয়া যাইবে, তখন আমি প্রাণ ভরিয়া সেই রূপই দর্শন করিব।

নির্ভরতার এই যে অপূর্ব্ব চিত্র—ইহাই রজনীকান্তের সাধন-সঙ্গীতের প্রাণ। এই নির্ভরতার ফলেই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—

আর, কাহারও কাছে, যাব না আমি,
তোমারি কাছে রব হে,
আর, কাহারও সাথে কব না কথা
তোমারি সাথে কব হে।
ঐ অভয় পদ হৃদয়ে ধরি
ভুলিব সব দুখ হে;
হেসে তোমারি দেওয়া বেদনা-ভার,
হৃদয়ে তুলি লব হে।

"বাণীর" 'তোমারি' নামক গানটি যেন শেষের দুইটি পঙ্‌ক্তিরই প্রতিধ্বনি—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।

এই অনুভূতির সাহায্যে তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন—

আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত।

ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার উপর নির্ভরতার ফলে রজনীকান্ত এই সার কথা বুঝিলেন—আর বুঝিয়া তাঁহার খেয়াঘাটে আসিয়া উদাত্ত-সুরে গান ধরিলেন—

বড় নাম শুনেছি,
ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছি, নাম শুনেছি,
পারের কড়ি লাগে না,
তোমার ঘাটে পার হতে নাকি কড়ি লাগে না,
'দয়াল' বলে তিন ডাক্ দিলে কড়ি লাগে না,
'দীনে পার কর' বলে ডাক্ দিলে আর কড়ি লাগে না,
কাতর হ'য়ে ডাক্ দিলে আর কড়ি লাগে না,
চোখের জলে ডাক্‌লে নাকি কড়ি লাগে না।

সত্যসত্যই রজনীকান্ত বুঝিয়াছিলেন—প্রত্যক্ষের মত জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন—চোখের জলে না ডাকিলে তাঁহার দয়া হইবে না—তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। আর একটি কথা রজনীকান্তের মনে হইল, সেই অন্তরের ধনকে অন্তরের মাঝে আনিতে হইলে, সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়কে লুপ্ত করিতে হইবে—

তারে, দেখ্‌বি যদি নয়ন ভ'রে,
এ দু'টো চোখ্ কর্‌রে কাণা;
যদি, শুন্‌বিরে তার মধুর বুলি,
বাইরের কাণে আঙ্গুল দে না।

সাধন-মার্গের এই খাঁটি কথা তিনি কত সহজ ও সরল ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

রজনীকান্তের সাধন-সঙ্গীতের শেষ স্তর ভগবানের স্বরূপ দর্শন।

প্রাচীমূল কনক-কিরণে কনকিত করিয়া তাঁহার হৃদয়-দেউলের দেবতা তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহারই আনন্দ-রশ্মিধারায় রজনীকান্তের হৃদয়-পদ্ম বিকসিত হইয়া সেই সৌম্যমূর্ত্তির পাদপদ্মেই অর্ঘ্যস্বরূপ সমর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দর্শনের পূর্ব্বেই রজনীকান্ত মনকে একটা বড় কথা বলিলেন—

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গলে
কঠিনে মেশে না সে,
মেশেরে তরল হ'লে।

প্রেমে গলিয়া গিয়া রজনীকান্ত প্রাণের ভিতর একটা মধুর স্পন্দন অনুভব করিলেন, তিনি দেখিলেন—

কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত-শীতল রাগে
মোহ-তিমির নাশে, প্রেম-মলয়া বয়
ললিত-মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি,
আদরে মোরে ডাকি, হেসে হেসে কথা কয়।

* * *

সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধমানসে মম, নাশে পাপ-তাপ ভয়।

আপনার হৃদয়ের মাঝে তাঁহাকে পাইয়া রজনীকান্ত চারিদিকে তাঁহার নানা ভাবের ছবি দেখিতে লাগিলেন।

যখন, জননী সন্তানের তরে, প্রাণ দিতে যান অকাতরে,
তখন, দেখ্‌তে পাই সে মায়ের মুখে তোমার প্রেমের চিত্র আঁকা।

সর্ব্বজীবে ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া রজনীকান্ত কি অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন—তাহার পরিচয় উপরের পঙ্‌ক্তি দুইটিতে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ করিয়া রজনীকান্ত দেখিতেছেন—

সাধুর চিতে তুমি আনন্দরূপে রাজ
ভীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে ;
প্রেমরূপে জাগ সতীর হিয়া-মাঝে
স্নেহরূপে জাগ জননী-নয়ানে,
প্রীতিরূপে থাক প্রেমিকপ্রাণে সখা
যোগি-চিতে চির উজ্জ্বল আলোক।

এইরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে রজনীকান্ত গাহিলেন—

সে যে, পরম প্রেমসুন্দর
জ্ঞান-নয়ন-নন্দন ;
পুণ্য-মধুর নিরমল
জ্যোতিঃ জগত-বন্দন।
নিত্য পুলক চেতন।
শান্তি চিরনিকেতন ;
ঢাল চরণে রে মন,
ভকতি-কুসুম-চন্দন।

আর এই ভাবে ভগবানের চরণে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়া রজনীকান্ত মিলনানন্দে বিভোর হইলেন। তাঁহার আনন্দপ্লাবিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এক অপরূপ প্রাণমাতান সুর উঠিল,—

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি,
তাত! জননি! সখে! হে গুরো! হে বিভো!
নাথ! পরাৎপর! চিত্তবিহারি!
• • • •
সফল আজি মম অন্তর ইন্দ্রিয়!
মনোমোহন! সুন্দর! মরি বলিহারি!

কাব্য-পরিচয়ে

'বাণীর' ভূমিকায় ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত-পদাবলী কেবল সঙ্গীত।" এই সঙ্গীতই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই তিনি বাঙ্গালা দেশে অমর হইয়া গিয়াছেন এবং এই সঙ্গীত-সাধনার সিদ্ধিই তাঁহাকে দেশ-কালের অতীত করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী জননীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়াছে। সঙ্গীতের সার্থকতা ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?

রজনীকান্তের রচিত সাতখানি পুস্তকের মধ্যে, 'অমৃত' ও 'বিশ্রাম'—এ দুইখানি শিশুপাঠ্য নীতিপূর্ণ কবিতায় রচিত। তাঁহার বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, বিশ্রাম ও অভয়া এই পাঁচখানি পুস্তকের বার আনাই গান। তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই গানের কবি। তিনি কথা কহেন সুরে, কাঁদেন সুরে, হাসেন সুরে, দেশকে জাগান সুরে, ভগবানকে—জগন্মাতাকে ডাকেন তাও সুরে। তাঁহার প্রায় সকল রচনাই সুরে গাঁথা। রজনীকান্ত ছিলেন, খাঁটি বাঙ্গালী কবি এবং তাঁহার কবিতা খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা। তাহাতে ইংরেজির গন্ধ বা সম্পর্ক নাই। অতি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় তিনি আমাদের অন্তরের ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের অন্য কবিদিগের অন্য বিষয়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ থাকিতে পারে; কিন্তু রজনীকান্ত যে দিকে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ।

এক দিকে যেমন তিনি আমাদের প্রাণের কথাগুলিকে ভাষার ভিতর

দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ; অন্যদিকে আবার হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ভক্তিবাদের তত্ত্বগুলিও বেশ প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা যে ভাষায় ভাবি, কথা কহি, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভরসা, অনুরাগ-বিরক্তি প্রকাশ করি—রজনীকান্ত ঠিক সেই ভাষাতেই কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহার সুর বা ভাষায় যে খুব একটা বাহাদুরী আছে, তাহা নহে ; তবে তাহা বেশ সহজে পড়া, গাওয়া বা বোঝা যায়। তাঁহার বিশেষত্ব, তিনি উচ্চ ইংরেজি-শিক্ষিত হইয়াও খাঁটি বাঙ্গালীভাবে খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা বাঙ্গালীকে উপহার দিতে পারিয়াছিলেন।

বঙ্গভূমি কবি-মাতৃকা—বহু কবি-সন্তানের জননী। গত ষাট বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ষোল আনাই শিক্ষিত সমাজের কবি। তাঁহাদের কবিতার স্রোত দেশের এক স্তরে প্রবাহিত ; কিন্তু দেশের অন্য স্তরে তাঁহাদের কবিতা পৌঁছিতে পারে নাই। কারণ, এই শিক্ষিত সমাজ লইয়াই দেশ বা দেশের প্রাণ নয় ; দেশের বার আনা প্রাণ—দেশের কৃষক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। দেশের এই অশিক্ষিত জন-সাধারণ তাঁহাদের অনেকেরই নামও জানে না। একদিন ছিল, যখন যাত্রা, পাঁচালী, তরজা, বাউল, কবি, হাফ্‌ আখড়াই প্রভৃতির ভিতর দিয়া দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ সাহিত্যানন্দ উপভোগ করিত, সৎশিক্ষা পাইত। সেকালে এই শ্রেণীর সঙ্গীত সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশের ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন।

ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি, নীলকণ্ঠ, কাঙ্গাল হরিনাথ প্রভৃতি দেশের জনসাধারণের কবি ; আর মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি শিক্ষিত সাধারণের কবি।

রজনীকান্ত এই দুই শ্রেণীর মধ্যস্থল অধিকার করিয়াছিলেন। সেই জন্য রজনীকান্তের দ্বারা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—এই উভয় শ্রেণীর উপযোগী কবিতার সমন্বয় হইয়াছে—আর এই সমন্বয়ে তিনি কবিতার ভিতরে এক নূতন রসের প্রবাহ বহাইয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে রজনীকান্তকে বাঙ্গালার কাব্যক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এই কার্য্য সাধনের জন্য দুইয়ের মধ্যে যাহা ভাল, তিনি তাহা লইয়াছেন এবং যাহা মন্দ, তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন কবিদিগের সরল ভাষা ও অকপট ভাব গ্রহণ করিয়া আদিরসের আতিশয্যটুকু বর্জ্জন করিয়াছেন; অথচ তাঁহার কবিতায় এ যুগের কবিগণের ছন্দ-বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য বর্ত্তমান, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় ভাবের যে অস্পষ্টতা ও প্রহেলিকা বিদ্যমান, তাহা তাঁহার কবিতায় একেবারেই নাই।

আমাদের দেশের আধুনিক কবিগণের রচনার মধ্যে অশিক্ষিত জন-সাধারণের সুখ-দুঃখের সহিত সহানুভূতি যে পাই না, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের ভাব কৃত্রিম, ভাষা কষ্টবোধ্য, প্রকাশের ভঙ্গীও জটিল। সে শ্রেণীর কবিতা এখন পোষাকী কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পোষাকী জিনিসে আর কাজ নাই। বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে আর বিলাসিতার উপকরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। তাই যখন রজনীকান্তের কবিতার ভিতরে অকৃত্রিম কাব্যরসের সরল উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই, তখন আমরা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচি। ড্রয়িং রুম ও পার্লারের কৃত্রিম বাহ্য আড়ম্বর ও শুষ্ক-নীরস ভাবের আতিশয্যে আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। রজনীকান্তের কাব্যের ভিতর আমরা দেশের মেঠো সুরের পরিচয় পাই—সে সুর সহরের বৈঠকখানায় পাওয়া যাইবে না। আর সেই মেঠো সুর দেশের অন্তরতম প্রাণের সুরটিকে জাগাইতে

পারিয়াছিল বলিয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা সাড়া পাওয়া গিয়াছিল ; যাহা সচরাচর বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে পাওয়া না। বর্ত্তমান যুগের কবিগণের মধ্যে আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার অন্ত কোন কবি এমনভাবে একই সঙ্গে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের হৃদয় তোলপাড় করিতে পারেন নাই।

রজনীকান্তের গানের এত প্রসারতা লাভের কারণ, সেগুলি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণে ভরপুর, ভাষার মধ্যে খোঁচখাঁচ নাই, ব্যাকরণের আড়ম্বর নাই, উৎকট সমাসের প্রয়োগ নাই, অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি নাই—নির্ম্মল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার। ভাষার জালে পড়িয়া ভাবকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই, ভাব বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না। এই সমস্ত কারণে সেগুলি জনসাধারণের কাছে বিশেষ আদৃত। আর শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছেও সেগুলি এত আদৃত কেন ? —না, তাহারা পুরাণ কথা, পুরাণ ভাব নূতন ছন্দে, নূতন সুরে, নূতন বেশে, নূতন আকারে পাইল। কান্তের গানে তাহারা পাইল—অনাবিল হাস্য, বিশুদ্ধ কৌতুক, মধুর ব্যঙ্গ, তীব্র শ্লেষ ; পাইল—শান্ত, করুণ ও হাস্যরসের অপূর্ব্ব সংযোগ ; পাইল—স্বাদেশীকতা, দেশাত্মবুদ্ধি, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ; পাইল—বিশ্ব-সৌন্দর্য্য, বিচিত্র সৃষ্টিরহস্য, ভগবদ্বিশ্বাস, ভগবৎ-প্রেম—তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মহারা হইয়া গেল।

রজনীকান্তের কাব্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই, হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামী নাই। উৎকট দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা নাই,—আছে প্রেম, ভক্তি, করুণা, ভালবাসা ; আছে বিশ্বস্রষ্টা, আছে উপনিষদের ঈশ্বর, গীতার ভগবান্। তিনি সকলের কবি—কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা জাতি বা ধর্ম্ম বিশেষের কবি নহেন।

কাব্য পড়িয়া কবিকে বুঝিতে পারা যায়—এ কথাটা পুরা সত্য

নহে, সব সময়ে এটা খাটে না—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন—

কাব্য পড়ে বুঝবো যেমন, কবি তেমন নয় গো।

কিন্তু তাঁহার এই উক্তি রজনীকান্ত সম্বন্ধে মোটেই খাটে না। রজনীকান্ত ও রজনীকান্তের কাব্য একেবারে পূরামাত্রায় এক জিনিষ—একেবারে অভিন্ন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এইচ্ আর জেমস্ সাহেব মহাকবি মিল্টন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—There is no divorce between John Milton the man and John Milton the poet. As was the man, so were his works ; his works are an index to his character—এই উক্তি রজনীকান্তের পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। রজনীকান্ত সেনও যা, আর তাঁহার সমগ্র গান ও কবিতাও তাই। তাঁহার সমগ্র কাব্য নিজের মর্ম্মের কথা, প্রাণের কথা—অন্তরের কথা। তাই অত স্পষ্ট, অত পরিস্ফুট, অত মর্ম্মস্পর্শী—ইহার মধ্যে ধার করা কথা নাই, কল্পিত কথা নাই, মিথ্যা কথা নাই—তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন—যাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, যাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাহাই ভাষার ভিতর দিয়া, গানের মধ্য দিয়া সুরসংযোগে গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেই তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিব, আবার তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে—সেই রজনীকান্ত সেন মানুষটিকে বুঝিতে পারিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জনপ্রিয় রজনীকান্ত

দোষে গুণে মানুষ। প্রত্যেক মানবের চরিত্রেই কতকগুলি গুণ এবং কতকগুলি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার চরিত্রে দোষের মাত্রা কমিয়া গিয়া ক্রমেই গুণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়—পশুত্ব কমিয়া গিয়া দেবত্বের ক্রম-বিকাশ হয়, তিনিই মানব নামে পরিচিত হইবার যোগ্য। আপাদমস্তক পাপে জড়িত ব্যক্তিও জগতে যেরূপ বিরল, সেইরূপ নিরঙ্কুশ-পুণ্য-প্রভায় উদ্‌ভাসিত লোকও সংসারে দুর্লভ। আবার যাঁহারা ক্ষণজন্মা পুরুষ, ঈশ্বরানুগ্রহে যাঁহারা সমাজ-মধ্যে, জাতি-মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের চরিত্রে গুণরাশির মধ্যে কোন একটি গুণ বিশেষরূপে বিকশিত হয়। সেই গুণের গৌরব, সেই গুণের জ্যোতিঃ অন্য সকল গুণকে ছাপাইয়া দীপ্তি পায়, বিকাশ পায়, চারিদিকে আনন্দ বিতরণ করে।

রজনীকান্তের চরিত্রের বিশেষ গুণ—তিনি জনপ্রিয় ছিলেন, সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে এমন একটি মাধুর্য্য ছিল, স্বভাবে এমন একটি কমনীয়তা—নমনীয়তা ছিল, ব্যবহারে এমন একটি বিনীত ভাব ছিল, আলাপে এমন একটি সরস ভঙ্গি ছিল, ভাষণে এমন মিষ্টতা ছিল, বিবৃতিতে এমন মনোমুগ্ধকর শক্তি ছিল, কণ্ঠে এমন সুললিত সুর ছিল, হৃদয়ে এমন আবেগ ছিল—আর প্রাণে পরকে টানিয়া লইবার এমন আকর্ষণ ছিল যে, দুই দণ্ডের জন্যও যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই রজনীকান্তের গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সরল, সরস সহৃদয়তায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার কেনা হইয়া গিয়াছেন—রজনীকান্ত

যেন তাঁহার চিরপরিচিত, যেন তাঁহাদের কত কালের বন্ধুত্ব, কত দিনের আলাপ। রজনীকান্ত ছিলেন প্রাণের মানুষ, তাই সর্ব্বজনপ্রিয়। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। অমন হাসিভরা, প্রাণভরা মানুষ আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুঃখ হয়,—সেই হাসিহাসি মুখ, সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিনয়-নম্র ভাব, আর ত দেখিতে পাইব না; সেই সরস উক্তি, সেই কমনীয় কণ্ঠ, সেই ধীরে ধীরে মিষ্ট মধুর বুলি, সেই প্রাণখোলা হাসি আর ত শুনিতে পাইব না; সেই দুই হাত বাড়াইয়া বুকে টানিয়া আলিঙ্গন, সেই পরের জন্য হৃদয়ভরা ব্যাকুলতা, সেই প্রাণঢালা ভালবাসা আর ত উপভোগ করিতে পারিব না। কান্না পায় না? চোখ ফাটিয়া কান্না যে আপনি বাহির হয়।

যে সকল গুণ থাকিলে লোকে জনপ্রিয় হয়, সকলের আপন-জন হয়, সেই সকল গুণেই রজনীকান্তের চরিত্র শোভিত ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামরসাধারণ সকলেই বলিত 'আমাদের রজনীকান্ত,' 'আমাদের রজনী-বাবু,' 'আমাদের রজনীসেন,' 'আমাদের কান্তকবি'। এ সৌভাগ্য, এ গৌরব কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে, আর যাঁহার ভাগ্যে ঘটে তিনি যে সত্যই অমর,—তিনি যে প্রকৃতই সকলের মনের মন্দিরে নিত্য সেবা পাইয়া থাকেন—পূজা পাইয়া থাকেন,—তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রজনীকান্ত মিষ্টভাষী, সদালাপী,—পরোপকারী। রজনীকান্ত আশ্রিত-বৎসল, বন্ধুবৎসল,—সমাজবৎসল। রজনীকান্ত আমোদপ্রিয়, রহস্যপ্রিয়, ক্রীড়া-কৌতুকপ্রিয়। গল্প বলিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গের চিত্তবিনোদন করিবার রজনীকান্তের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; গান গাহিয়া, হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া ক্রমাগত ৭।৮ ঘণ্টা কাল লোককে মুগ্ধ—স্তম্ভিত করিবার দক্ষতা ছিল রজনীকান্তের অসীম। তাস খেলায়, দাবা খেলায় রজনীকান্ত সিদ্ধহস্ত। রজনীকান্ত হাসির গানে ফোয়ারা ছুটাইতে পারিতেন, মজ্‌লিসে চুট্‌কি গল্পের

অবতারণায় হাসির লহর তুলিতে পারিতেন, মুখে মুখে ছড়া কাটিয়া, কবিতা রচনা করিয়া, হিঁয়ালি তৈয়ার করিয়া বন্ধুবর্গকে আনন্দ দিতে পারিতেন। রজনীকান্ত সামান্য কথায়, অতি ক্ষুদ্র ঘটনায় হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারিতেন,—ব্যঙ্গ্যে, রঙ্গে ও কৌতুকে সুহৃদ্‌বর্গকে ক্রমাগত হাসাইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া কাঁদাইয়া ছাড়িয়া দিতেন। রজনীকান্তের চরিত্রের এই এক দিক্।

আবার সেই রজনীকান্তই ভগবৎ-সঙ্গীত গাহিয়া অতিবড় পাষণ্ডকেও কাঁদাইয়া দিতেন। পূরা মজ্‌লিস, আসর জম্ জম্ করিতেছে, হাসির হর্‌রা উঠিতেছে, হাততালির চট্‌পট্ ধ্বনি হইতেছে, মুহুর্মুহুঃ বাহবা পড়িতেছে, চারিদিকে আনন্দ, হাসি আর স্ফূর্ত্তি। ধীর, স্থির, গম্ভীর-প্রকৃতি রজনীকান্ত নীরবে আস্তে আস্তে সেই জমাট বৈঠকে প্রবেশ করিলেন, মুখে কথা নাই, কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত নাই, সমান—সটান গিয়া একটা হার্ম্মোনিয়াম টানিয়া লইয়া বৈরাগ্য-সঙ্গীত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, পর্‌দায় পর্‌দায় গানের সুর চড়িতে লাগিল, সমস্ত গণ্ডগোল, রঙ্‌তামাসা সহসা থামিয়া গেল—সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দ—অসাড় হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা উৎকর্ণ হইয়া সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

বন্ধুমহলে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে, রজনীকান্ত অতি বিনীত ভাবে, সঙ্কুচিত হইয়া সেই আলোচনায় যোগ দিলেন,—এ যেন তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা! কিন্তু দুই চারি মিনিট পরেই সকলে বুঝিতে পারিলেন, দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তিনি যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রেরই আলোচনায় আজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। সেইরূপ ইতিহাস, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি—সকল বিষয়েই তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করিতেন, নিজের অনুসন্ধান, নিজের অভিজ্ঞতা সরল ও সহজ ভাবে পাঁচজনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার গুছাইয়া বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া, তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া সকলে

আশ্চর্য্য হইত। তখন কিন্তু রজনীকান্ত আর সেই হাস্যপ্রিয়, রহস্যপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয় রজনীকান্ত নহেন,—তখন তিনি ধীর, স্থির, গম্ভীর রজনীকান্ত,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্তের মনোভাব বুঝিতেছেন, দৃষ্টি নত করিয়া আস্তে আস্তে নিজের বক্তব্য, নিজের যুক্তি প্রকাশ করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে একদৃষ্টে অপরের মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে, অথচ বেশ একটু জোরের সহিত স্বীয় মতামত বলিতেছেন।

তুমি শোকে ম্রিয়মাণ, চোখে আঁধার দেখিতেছ—উদাস-মনে হতাশ-প্রাণে গুম্ হইয়া বসিয়া আছ, অশ্রু জমাট বাঁধিয়া তোমার বুকের ভিতর চাপিয়া বসিয়াছে। রজনীকান্ত তোমার বিপদের বার্ত্তা শুনিয়াই তোমার কাছে ছুটিয়া গেলেন, তাঁহার মুখে কথা নাই, আর তোমার ত কথা কহিয়া আহ্বান করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। সেই গম্ভীর, উদার, প্রশান্ত-হৃদয় রজনীকান্ত অতি সন্তর্পণে তোমার পাশে গিয়া বসিলেন। একবার মাত্র চারি চক্ষুর মিলন হইল, তারপর দুইজনে নির্ব্বাক্ হইয়া দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিলে। তুমি বুঝিলে—হাঁ, আমার ব্যথার ব্যথী বটে,—রজনীকান্ত প্রকৃতই দরদের দরদী! অত শোকের মধ্যেও তুমি একটু শান্তি পাইলে। রজনীকান্তের চরিত্রের এই আর এক দিক্। এ হেন রজনীকান্ত যে সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন, তাহা ত বিচিত্র নহে! এই সকল বিষয়ের দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিয়া জনপ্রিয় রজনীকান্তকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

বেঙ্গলী প্রভৃতি সংবাদপত্রের সুবিখ্যাত রিপোর্টার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সরকার মহাশয় জনপ্রিয় রজনীকান্তের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা প্রথমেই দেখাইতেছি;—

"একদিন রাজসাহীর বার লাইব্রেরীর এক কোণে বিষণ্ণভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছি। এমন সময় রজনীকান্ত আসিয়া কাণে কাণে বলিলেন—'দুঃ

ভারি কেন? ভারি হইলে আমার ওখানে যেয়ো, হাল্‌কা ক'রে দেবো'। বাস্তবিকই রজনীকান্তের নিকট গেলে দুঃখের বোঝা, চিন্তার বোঝা একেবারে হাল্‌কা হইয়া যাইত। তাঁহার সংসর্গ যেন কি এক অপূর্ব্ব জিনিষ; তাঁহার কথা, তাঁহার কবিতা, তাঁহার গান শুনিয়া একবারে আত্মহারা হইতাম। অতিরিক্ত ভোজনের পর কুচ্‌কি-কণ্ঠা-ভরা, পুরাদমে বোঝাই উদরের বোঝা কমাইয়া উহা পুনর্ব্বার বোঝাই করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে রজনীকান্তের শরণাপন্ন হইতাম। নানাপ্রকার রসের কথা, রসিকতাপূর্ণ ভঙ্গিতে বলিয়া—হাসির তরঙ্গ ছুটাইয়া দিয়া তিনি উদরের বোঝাকেও এরূপভাবে হাল্‌কা করিয়া দিতেন যে, পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইত।

কত লোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, কত লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে রজনীকান্তের সহিত যেরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তেমন আর কাহারও সহিত হয় নাই। সুধু আমি কেন, অনেক লোকের মুখেই এইরূপ শুনিয়াছি; অনেকেই বলেন—'রজনীবাবু আমাকে যেমন ভালবাসেন, তেমন আর কাহাকেও নয়।' যদি রজনীকান্তকে না চিনিতাম, তাহা হইলে আমিও ঐ কথা বলিতে পারিতাম। রজনীকান্ত এ জগতের লোক নন, তাঁহার হৃদয় অপার্থিব ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহার গানে যে ভাবের অভিব্যক্তি, তাঁহার ব্যক্তিত্বেও সেই ভাবেরই প্রকাশ পাইত। এমন হৃদয়ভরা সরলতা ও প্রেম আমি দেখি নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমি আমার জীবনের আনন্দস্রোতের প্রধানতম নির্ঝরিণীটিকে হারাইয়াছি।"

রজনীকান্তকে রোগশয্যায় দেখিয়া, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "যে রজনীকান্তকে লইয়া আমরা কত রজনী আনন্দ-সাগরে ভাসিয়াছি, যাঁহার প্রতিভা মূর্ত্তিমতী শ্রীর ন্যায় উৎসব-ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার রচিত ব্যঙ্গ ও তত্ত্ব-বহুল,

গীতি রৌদ্র-মিশ্র বৃষ্টির ন্যায় বন্ধু-সমাজে অজস্র কৌতুক ও রসধারা বিতরণ করিয়াছে, আজ সেই ভক্ত ও সুগায়ক কবি উৎকট রোগে বাক্‌হীন। বসন্তের কোকিলকে রুদ্ধকণ্ঠ দেখিলে কাহার প্রাণ ব্যথিত না হয়?"

অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তকে রোজনাম্‌চায় লিখিতে দেখিয়াছি, "তোমাদের কাছে আমার acting (অভিনয়) করা সাজে না। সবই ত করছি—হাসি, ঠাট্টা, কবিতা-লেখা, লোকের সঙ্গে আলাপ,—সর্ব্বোপরি পুত্রের বিবাহ দিলাম। করছি নি কি? আমি দ'মে যাই নি। কাশীতে যখন অনবরত রক্তের স্রোত বইতে লাগ্‌ল, তখন স্ত্রী কাঁদতে লাগ্‌ল। আমি ত কোন আর্ত্তনাদ করি নি। যে এনেছে, তাঁর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।" রজনীকান্ত অমায়িক, অক্রোধ, অভিমানশূন্য; যিনি জীবনে কখনও কাহারও প্রতি অযথা বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নাই, কোন সহচরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেই জোর-কলমে লিখিতে দেখি, "একটা কথা বলি, অকারণ লোকের সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ ক'র না। তাতে নিজের ক্ষতি আছে।" পূর্ব্বে লিখিয়াছি, শ্রীযুক্ত রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি হাসপাতালে রজনীকান্তের কটেজের পার্শ্বে থাকিতেন। রজনীকান্তের হাসপাতাল-বাস-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "রজনীবাবু সাংঘাতিক রোগে উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তথাপি তিনি তাঁহার সহজ প্রফুল্লতায় কখনও বঞ্চিত হন নাই। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, আমার হাসপাতাল-বাস সুখের ছিল। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হইতে আমার হাসপাতাল-বাস প্রকৃতই হাসপাতাল-বাস হইয়াছিল।"

একদিন 'গুরুগোবিন্দ সিংহে'র জীবনীলেখক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম, তখনও রজনীকান্তের হাস্যরসের উৎসের

বেগ একটুও মন্দীভূত হয় নাই—তখনও তিনি কথায় কথায় হাসির ঢেউ তুলিতে পারেন। সেই কথাই বলিতেছি। আমাদের দুই জনকে দেখিয়া রজনীকান্ত লিখিলেন, "খুব ব্যথা ক'রছে, তবু তোমাদের দেখে উঠে বসেছি।—আর বসন্তবাবু, যদি বাঙ্গালা ভাষা এমন ক'রে অপাত্রে অপব্যবহার করেন, তবে ত শীঘ্র ভাষার দৈন্য হবে।" ইতিপূর্ব্বে বসন্তবাবু রজনীকান্তকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আপনাকে দেখিয়া হিংসা হয় বলিয়াছিলাম, তাহা কেবল কথার কথা নহে—বাস্তবিকই হৃদয়ের কথা। যিনি আপনার দুঃখরাশিকে পদে দলিয়া ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভর হইতে পারেন, আর তাঁহার কৃপায় কর্ত্তব্যকে সদাই আঁকড়াইয়া থাকেন, তিনি কি বাস্তবিকই হিংসার পাত্র নহেন? আমি আপনার তোষামোদ করিতেছি না। আপনাকে দেখিয়া ও আপনার কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় কয়েকবার অত্যন্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, আপনাকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছাও বলবতী হইয়াছিল।"

তাহার পর এই পত্রের ভাষা-সম্বন্ধে রজনীকান্ত পুনরায় লিখিলেন, "ওঁর সব ভাষা, আর আমাদের সব ভোবা নাকি?" এই সময়ে রজনীকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র খাটের ডাণ্ডা ধরিয়া ছত্রির উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম,—"প'ড়ে যাবে যে।" রজনীকান্ত উত্তরে লিখিলেন, "আমি যে বার বি এ পাশ ক'রে বাড়ী যাই, সে বারও গাছে চ'ড়ে আম পেড়েছি, কাজেই পুত্রঃ পিতৃগুণং ধত্তে।" পরে তিনি বসন্তবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন,—"উনি আমাকে বাঙ্গালা ভাষা ঝেড়ে গালাগালি দিয়েছেন। আর ভাষার কিছু বাকী রাখেন নি। আমাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন—সে বড় সুবিধে হ'বে না, কারণ বুকে কেবল একখানা হাড়! হিংসার কিছু নাই বসন্তবাবু! আমি অনেক সময় অনন্যোপায় হ'য়ে কবিতা লিখি। এতে হিংসা হবে কেন?

যে কষ্ট পাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ করুন যেন শীঘ্র যাই।" সবশেষে আমাকে লিখিলেন, "যখন আস্‌বে বসন্তবাবুকে সঙ্গে ক'রে এনো। কি আশ্চর্য্য! আমি জানতাম যে, 'গুরুগোবিন্দ সিংহে'র রচয়িতা পুরুষ মানুষ—এত লাজুক দেখে আমার মনে সন্দেহ হ'য়েছে। আমিও পুরুষ, উনিও পুরুষ,—আমাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন, তাতে লজ্জা কি?" আমরা দুইজনে হাসিতে হাসিতে সে দিন কবির নিকট বিদায় লইলাম।

রজনীকান্ত স্বয়ং লিখিয়াছেন, "সঙ্গীত আমার জীবনের ব্রত ছিল।" তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের কথা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না। তবে তাঁহার সঙ্গীত-শক্তি সম্বন্ধে দুই চারিজন মনস্বীর উক্তি উদ্ধৃত করিব। রাজসাহী একাডেমীর প্রধান শিক্ষক ৺ চন্দ্রকিশোর সেন লিখিয়াছেন,—

"একবার রজনীকান্তের সহিত আমরা ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ষ্টীমারে উঠিয়াই রজনীকান্ত হার্ম্মোনিয়াম বাহির করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া আরোহী সকলেই রজনীকান্ত ষ্টীমারের যে ধারে ছিলেন, সেই ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে ষ্টীমার সেই দিকে হেলিয়া পড়িল। সারেঙ্‌ তাহা লক্ষ্য করিয়া আরোহীদিগকে একপার্শ্বে দাঁড়াইতে নিষেধ করিবার জন্য জনৈক খালাসীকে পাঠাইল। সে আসিয়া গানের স্বরে এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া সেও দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। তখন সারেঙ্‌ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিল। কিন্তু সেও আসিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইয়া যাওয়ার পর, সারেঙ্‌ এই কথা সকলকে বলিয়া আমাদের আরও আনন্দ-বর্দ্ধন করিল।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও এই বিষয়ে লিখিয়াছেন,—

"রাজসাহী হইতে দামুকদিয়া যাইবার ষ্টীমার গ্রীষ্মকালে প্রায়ই চড়ায়

ঠেকিয়া সমস্ত রাত্রি পথে বদ্ধ হইয়া থাকিত। যে দিন রজনীকান্ত ষ্টীমারে যাত্রী থাকিতেন, সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহার ছোট হার্ম্মোনিয়ামটি লইয়া গান আরম্ভ করিতেন, সে দিন সমস্ত সহযাত্রীরা কষ্ট, অসুবিধা, ক্ষুধা ও সময়-নষ্ট হওয়ার ক্ষোভ ভুলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিত ও সুখে রাত্রি কাটাইয়া দিত।"

বরিশাল হইতে অশ্বিনীবাবু লিখিয়াছিলেন,—"রজনীবাবু বরিশালে যে দুই একদিন ছিলেন, তাহার মধ্যেই সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও প্রাণের আবেগ আমাদিগের প্রাণে যে ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আজও তাঁহার মধুর সঙ্গীত গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।" আর রাজসাহী হইতে কালীপ্রসন্ন আচার্য্য মহাশয় ব্যাধিগ্রস্ত রজনীকান্তকে লিখিয়াছিলেন, "May God restore you to us, the sweetest Nightingale of Bengal." (ভগবান্ বাঙ্গালার কলকণ্ঠ কোকিলকে আমাদিগকে ফিরাইয়া দিন।)

রজনীকান্তের গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনের একটি দিনের ঘটনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; "পূজার ছুটীর পর একবার তিনি বাড়ী হইতে রাজসাহীতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; আমিও ছুটীর শেষে রাজসাহীতে যাইতেছিলাম। দামুক্দিয়া ঘাট হইতে প্রত্যূষে ষ্টীমার ছাড়িয়া অপরাহ্নকালে রাজসাহী পৌঁছিত। আই, জি, এস্, এন্ কোম্পানীর ষ্টীমার। আমি চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিয়া দামুক্দিয়া গিয়া ষ্টীমারে চাপিতাম; কিন্তু সে বার সোজা গরুর গাড়ীতে পদ্মাতীরবর্ত্তী আলাইপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে গিয়া ষ্টীমার ধরি। ষ্টীমারে উঠিয়া দেখি, ষ্টীমারের ডেকের উপর একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া রজনীকান্ত আড্ডা জমাইয়া লইয়াছেন,—তাঁহার

গল্প আরম্ভ হইয়াছে। বহু যাত্রী তাঁহার চারিপাশে বসিয়া মুখব্যাদান* করিয়া গল্প গিলিতেছিল—আর, মধ্যে মধ্যে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। এমন কি, ষ্টীমারের সারেঙ্, সুখানি, ডাক্তার পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাতার দিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জাহাজ পদ্মার প্রতিকূল স্রোতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহা আলাইপুর ছাড়াইয়া—চারঘাট, সরদহ প্রভৃতি ষ্টীমার-ষ্টেশনগুলি অতিক্রম করিল। কত মাল নামিল, উঠিল; কত বিদেশের যাত্রী জাহাজে উঠিল, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল; কিন্তু রজনীকান্তের গল্প শেষ হইল না।—অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় ষ্টীমার রাজসাহীর ঘাটে নঙ্গর করিল—তখনও গল্প শেষ হয় নাই। সারেঙ্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার কেচ্ছা বড় সরেস, এ রকম কেচ্ছা আর কখন শুনি নাই, বড়ই আপশোস্ যে, শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। যদি জানিতাম, উহা শেষ করিতে দেরী হইবে,—তাহা হইলে আমি জাহাজ খুব ঢিমে চালাইতাম'।"

রজনীকান্তের চুট্‌কি গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল। তিনি কথায় কথায় চুট্‌কি গল্প বলিয়া বন্ধু-বান্ধবের চিত্তবিনোদন করিতেন। আমরা তাহার দুইচারিটি নমুনা দিতেছি।

(১)

রজনীকান্ত লিখিয়াছেন,—"রাম ভাদুড়ী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—'বিয়েতে গেলে, দিলে কি? খেলে কি? পেলে কি?' আমি উত্তর করিলাম, 'দিলাম দৌড়, খেলাম আছাড়, পেলাম ব্যথা'।"

(২)

প্রশ্ন। বিয়ের সময় তোমার বয়স কত ছিল?

উত্তর। ১৭ বৎসর।

প্র। তোমার স্ত্রীর বয়স তখন কত ছিল?

উ। বছর বার।

প্র। এখন তোমার বয়স কত?

উ। আজ্ঞে ৩০।৩২ বৎসর।

প্র। এখন তোমার স্ত্রীর বয়স?

উ। আজ্ঞে, সে তো প্রায় ৪৬।৪৭ বছরের হবে।

প্র। সে কি রে? তোর বউ তোর চেয়ে হঠাৎ বড় হ'য়ে উঠ্‌ল কেমন ক'রে?

উ। আজ্ঞে, ঐ কথাটাই কোন ভদ্রলোককে আজ পর্য্যন্ত বোঝাতে পার্‌লেম না।—স্ত্রীলোকের বাড় যে একটু বেশী!

(৩)

ডিম প্রায় ২০টে এনে রাজসাহীর বাসার উপরে এক কুলঙ্গীতে রেখে দিয়াছিলাম। আমি একদিন ডিম চাইলাম। গৃহিণী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কোথায় রেখেছ?' আমি বল্‌লাম—'উঁচুতে আছে, পেড়ে আন।'

(৪)

রামহরি বলিল, "পণ্ডিত মশাই, আমার এক ছেলের নাম জগৎ-পতি, এক ছেলের নাম লক্ষ্মীপতি, একজনের নাম শচীপতি, একজনের নাম ধরাপতি। আর এক ছেলে হ'য়েছে, তার নাম মেলাতে পারিনে।" পণ্ডিত মশাই উত্তর করিলেন, "কেন, এ ছেলের নাম রাখ—ভগ্নীপতি!"

(৫)

এক সময়ে রজনীকান্ত তাঁহার কোন বন্ধুর দ্বিতীয়-পক্ষের বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তাঁহার সেই বন্ধু-পত্নীর প্রবল জ্বর হয়। তাঁহার বন্ধুটি তাঁহার কাছে আসিয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"জ্বর এখন তিন হইয়াছে।" রজনীকান্ত হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"পূর্ব্বেও এক সতীন ছিল, এখনও ১০৩।"

(৬)

এক বৃদ্ধ বড়লোক কোন মতে থিয়েটারে যাবেন না। অনেক ক'রে তাঁকে নিয়ে গেলাম। তিনি উর্দ্দু খুব ভালবাসেন। বক্সে গিয়ে বস্‌লেন, আমাকেও টিকিট দিলেন, পাশে বস্‌লাম। তিনি থিয়েটার কি, জন্মে জানেন না। একখানা প্রোগ্রাম দিয়ে গেল। চশমা দিয়ে দেখেন "কৃষ্ণকুমারী" নাটক, প্রথমেই জয়পুরের রাজার প্রবেশ। তার কথা শুনেই বৃদ্ধ আমাকে বল্‌লেন,—"হাঁরে জয়পুরের রাজা এল; কথা কয় বাঙ্গালা; এ কেমন নাটক!" তারপর স্ত্রীলোকেরা রঙ্গমঞ্চে যখন ঢুকল, তখন বল্‌লেন,—"হাঁরে ওরা কি মেয়ে মানুষ?" আমি বল্‌লাম—"হাঁ।" তিনি বল্‌লেন—"আর ও নাটক ত রোজই বাড়ীতে এক্ট করি। মাগীগুলো মাগীর কথা কয়, পুরুষগুলো পুরুষের কথা কয়। ছিঃ ছিঃ! তুই এখুনি চল। আমি আর একদণ্ড রাত জাগ্‌বো না,"—ব'লে বৃদ্ধ সটান রওনা দিলেন। কি করি, সঙ্গে সঙ্গে মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে আমি ও চ'লে এলাম।

তাস ও দাবাখেলায় রজনীকান্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি একজন পাকা খেলোয়াড় ছিলেন। রোগশয্যায় শুইয়া থাকিয়াও তাঁহাকে দাবা খেলিতে দেখিয়াছি। কিন্তু কখন শুনি নাই যে, খেলিতে খেলিতে মাথা গরম করিয়া তিনি কখন চেঁচামেচি করিয়া উঠিয়াছেন বা 'কাদের সাপ কোন্ বাপকে কামড়াইয়াছে' জিজ্ঞাসা করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। দাবাখেলা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"বড় কঠিন খেলা, তবে খেল্‌তে খেল্‌তে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে, অনেকটা বোঝা যায় যে, এই যে কর্‌তে যাচ্ছি—এতে এই হবে। তা সকলে বোঝে না, ভাল কর্‌তে গিয়ে মন্দ হয়। কত মন্দ কর্‌তে গিয়ে ভাল হয়। Attack (আক্রমণ) কর্‌তে গেলাম যাতোয়ারা হ'য়ে—নিজের পরণে কাপড় নেই;

"এমন কত হয়। বড় exciting (মাতান') খেলা, তা আমরা খেলি না, তাতে খেলার মজা থাকে না। আমি এমন splendid problems (চমৎকাররূপে ঘুঁটী সাজাতে) জানি যে, দেখ্‌লে interest (মজা) পাবে। আমি পঞ্চরং, নবরং জানি। সে কিছু নয়,—মাতই চূড়ান্ত খেলা।"

রজনীকান্ত মুখে মুখে গান বাঁধিতে পারিতেন, কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, তাহার পরিচয়ও পূর্ব্বে দিয়াছি। তাঁহার কৃত দুইটি মাত্র হেঁয়ালি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

অতি মিষ্ট ফল আমি
পাক্‌লে পরে খাবে,
আমার নামের উল্টো কর্‌লে—
মজা দেখ্‌তে পাবে।

সাকারে হই উর্দ্ধগামী,
নিরাকারে নীচে নামি ;
থাকি রমণীর অঙ্গে,
সাকারে বা নিরাকারে
কাটি দিন নানা রঙ্গে।

রজনীকান্তের দাম্পত্যজীবন বড় সুখের ছিল—বড় মধুময় ছিল। অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার পত্নীকে মনোমত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন। স্ত্রীকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার প্রকরণ-পদ্ধতিও তাঁহার বিচিত্র। একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।—

রজনীকান্তের স্ত্রী বিবাহের পর ২।৩ বৎসর রজনীকান্তের মাতাকে 'মা' বা 'ঠাকরুণ' বলিয়া ডাকিতেন না,—'আপনি', 'আসুন' 'বসুন' বলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। সেই জন্য কবি-জননী প্রায়ই আক্ষেপ

করিয়া বলিতেন,—"আমার একটি পুত্রবধূ, সেও আমাকে 'মা' ব'লে ডাকে না।" কথাটা ক্রমে রজনীকান্তের কাণে গেল, তিনি পত্নীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। কড়া হুকুম চালাইলে, হয়ত হিতে বিপরীত হইবে, এই ভাবিয়া রজনীকান্ত স্ত্রীকে সেদিন আর কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিলেন, একটা মতলব আঁটিলেন। কয়েক-মাস পরে একবার রজনীকান্ত সপরিবার নৌকা করিয়া ভাঙ্গাবাড়ী হইতে রাজসাহী যাইতেছিলেন। হঠাৎ তিনি নদীগর্ভে পড়িয়া গেলেন, দাঁড়ি-মাঝিরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবু জলে ডুবে গেল,"—সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন মাঝি বাবুকে বাঁচাইবার জন্য জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্‌যোগ করিল। রজনীকান্তের স্ত্রী উন্মাদিনীর মত শাশুড়ীর পা দু'ইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "মা! কি সর্ব্বনাশ হ'ল মা! মা! কি হ'বে মা?" সন্তরণপটু রজনীকান্ত নৌকার নিকটেই ছিলেন, দুই একটা ডুব দিয়াই তিনি নৌকার উপর উঠিলেন এবং স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কেমন, আর ত 'মা' ব'ল্‌তে মুখে আট্‌কাবে না? এবার থেকে মাকে 'মা' ব'লে ডাক্‌বে ত?" তারপর তাঁহার মতলবের কথা, পূর্ব্ব হইতে মাঝিদের সহিত তাঁহার পরামর্শের কথা—একে একে সকল কথা মাকে ও পত্নীকে বলিলেন। মা বুঝিলেন, তিনি রত্নগর্ভা; পত্নী লজ্জায় জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ শিক্ষা-পদ্ধতি বিচিত্র নহে কি?

অতি সামান্য ঘটনায় রজনীকান্ত রসের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তুচ্ছ ব্যাপারে যে কোন লোককে লইয়া রসিকতা করিতেন। একদিনের একটি ঘটনা বলিব।

রজনীকান্তের রাজসাহীর বাটীর বৈঠকখানায় একখানি আয়না,

চিরুণী ও ব্রুস প্রায়ই পড়িয়া থাকিত। একদিন রজনীকান্তের একজন প্রাচীন মুসলমান মক্কেল মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার ঘরে আসিলেন। রজনীকান্ত নিবিষ্টচিত্তে বৃদ্ধ মুসলমানের কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ আয়নাখানি হাতে করিয়া মুখ দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে ব্রুসখানি তুলিয়া লইয়া দাড়ী আঁচড়াইতে সুরু করিলেন। রজনীকান্ত একবার মুখ তুলিয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া, পরক্ষণেই আবার দলিলপত্র পড়িতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মুসলমান তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রজনীকান্ত গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি যে ব্রুস দিয়ে দাড়ী আঁচড়াচ্ছেন, ওটা কোন্ 'জানুয়ারের রুমায়' তৈয়ার জানেন কি? যার নাম শুনলে আপনারা কাণে আঙ্গুল দেন—!" বৃদ্ধ মুসলমান তৎক্ষণাৎ ব্রুসখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া 'তোবা তোবা' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে পাকা দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিলেন। রজনীকান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে, গম্ভীর ভাবে পুনরায় কাগজপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন—যেন কোন কিছুই ঘটে নাই।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। রজনীকান্ত কলাবিদ্, রজনীকান্ত রসবিদ্, রজনীকান্ত রসিক ছিলেন। রসিকের কাছে ভিতর বাহির ত একই বস্তু—উভয় উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া দুইএ মিশিয়া মিলিয়া এক হইয়া আছে। এই বিশ্ব-সৃষ্টি, এই অনন্ত জগৎ অনন্ত কাল হইতে আপনা আপনি স্ফুরিত হইয়া—বিকশিত হইয়া সেই সকল সৌন্দর্য্যের আধার, সকল রসের পুঞ্জীভূত কেন্দ্রের প্রতি পাগল হইয়া ছুটিতেছে, তবু আজও সেই রসের নাগরের নাগাল পায় নাই। প্রকৃত কবি—যথার্থ রসিকও সেইরূপ আপন-ভোলা হইয়া বিশ্বের অনন্ত প্রবাহের সহিত নিজের জীবনের ধারা মিলাইয়া দিয়া, এই জগৎ যে মিথ্যা নহে—সে

যে সেই প্রেমময়ের, সেই রসময়ের আনন্দবাজার ইহা অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করেন এবং ইহারই ভাব ভাষার মধ্য দিয়া, কবিতার মধ্য দিয়া—গানের ভিতর দিয়া, সুরের ভিতর দিয়া জগদ্বাসীর প্রাণে ঢালিয়া দেন। রজনীকান্ত এই ভাবের রসিক ছিলেন। তিনি প্রতি অণুরেণু—ধূলিকণা হইতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুতে সেই রসময়ের রস-সৃষ্টির চরম পরিণতি উপভোগ করিতেন, এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টাকে রসময় বলিয়া প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতেন; তাই রজনীকান্ত প্রকৃত রসিক হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রসপ্লাবনের মুখে অমঙ্গল ভাসিয়া যাইত, অকল্যাণও দূরে সরিয়া পড়িত। তিনি সকলকেই সেই রসময়ের রূপান্তর মনে করিয়া প্রাণের সহিত কোল দিতে পারিতেন, হৃদয় ভরিয়া ভালবাসিতে পারিতেন। সেই জন্য তিনি ছিলেন—সর্ব্বজনপ্রিয়, সকলের আপনার লোক। এই ভাবের ভাবুক, এই রসের রসিক জগতে দুর্লভ। তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

> "বড় বড় জন রসিক কহয়ে,
> রসিক কেহ ত নয়।
> তর তম করি বিচার করিলে
> কোটীতে গুটীক হয়॥

বুঝিলাম, রজনীকান্তের প্রাণ ছিল, তিনি প্রাণের মানুষ। সেই প্রাণের টানে তিনি পরকে আপন করিতেন। আর সর্ব্বোপরি ছিল তাঁহার বিনয়। যথার্থই বৈষ্ণব-বিনয়—সেই তৃণ অপেক্ষা নীচ জ্ঞান—সেই ফুলের চাইতে কোমল প্রাণ। 'বড় হবি ত ছোট হ'—কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার চরিত্রে এই ভাবটিই অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে তিনি যেন—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥"

তাই তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালী বলিতেছে, 'অমন মানুষ আর হবে না।' এই অভাবটাই বাঙ্গালী বেশি করিয়া অনুভব করিতেছে। তাঁহার মত কবি আগেও ছিলেন, পরেও হয়ত হইবেন; অমন প্রাণের মানুষও আগে দেখা যাইত, কিন্তু বাঙ্গালীর পোড়া অদৃষ্টে আধুনিক সমাজে এখন একান্ত দুর্লভ। তাই আজ বাঙ্গালী রজনীকান্তের তিরোভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—অমন প্রাণের মানুষ, মনের মানুষ—অমন প্রাণ-মাতান', মন-ভোলান' মানুষ,—অমন অহঙ্কার-শূন্য অভিমান-শূন্য মানুষ,—অমন সরল, সহৃদয় মানুষ—অমন রসের সাগর, প্রাণের পাগল আর হইবে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধক রজনীকান্ত

যে দেশের পল্লী-নগর, হাট-মাঠ, পথ-ঘাট সাধনার ইতিহাসে—সাধকের কাহিনী ও গানে ভরা, যে দেশের মাটি শত সাধকের পদরেণুস্পর্শে পবিত্র—সাধনার সেই পুণ্যপীঠে ভগবৎকৃপালব্ধ কবি গুরুপ্রসাদের পুত্র রজনীকান্তের জন্ম। আর তাঁহারই জন্মের পূর্ব্ব হইতে গুরুপ্রসাদ বহু সাধক-সংস্পর্শে বৈষ্ণব-সাধনায় মগ্ন ও 'পদচিন্তামণিমালা'-রচনায় রত। এই পবিত্র সময়েই রজনীকান্ত ভূমিষ্ঠ হন। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার ভগবদ্ভক্তি, অচলা নিষ্ঠা, জীবে দয়া, নামে রুচি প্রভৃতি গুণরাজি পুত্রের জীবনকে শৈশব হইতে ভক্তির পথে পরিচালিত করিয়াছিল। পিতার এই সমস্ত সদ্‌গুণ উত্তরকালে একে একে পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। এইরূপেই রজনীকান্তের সাধনার ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, আর এই ভিত্তির উপর সাধনার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াই রজনীকান্ত শেষ জীবনে সাধকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

গুরুপ্রসাদ বৈষ্ণব-সাধক ছিলেন; বৈষ্ণব-সাধনায়—কেবল বৈষ্ণব-সাধনায়ই বা বলি কেন, সকল ধর্ম্ম-সাধনার যাহা মূল সূত্র, সেই সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সাধনায় মনঃসংযোগ করেন এবং তাহাতে সিদ্ধ হন। তিনি ভগবৎকৃপাবিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রাণে প্রাণে জানিতেন,—শ্রীভগবান্ কৃপাময়, আর সেই কৃপাময়ের কৃপা না হইলে মানুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। পিতার ন্যায় রজনীকান্তও সে তত্ত্বটি বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি তাহাই সার জানিয়া আকুলকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

হে নাথ, মায়ুহর। ওহে কলুষহরণ, আমার কলুষ হরণ কর।

ওহে নিখিলশরণ, আমার শরণাগতি স্বীকার কর। ওহে দীনদয়াল, আমার দয়া কর। আমার এই—

কাতর চিত্ত দুর্ব্বল ভীত

চাহ করুণা করি হে।

প্রভো, তুমি করুণা কর। তোমার করুণা ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি নাই। কিন্তু তিনি শুধু দীনদয়ালের করুণা ভিক্ষা-চাহিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কারণ তিনি স্থির জানিতেন,—

তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস।

আর চাই কি? শ্রীভগবান্ আমাকে ভালবাসেন, আর তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আমার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন—আমাকে কৃপা করেন—এ যে একটা মস্ত বড় আশা ও আশ্বাসের কথা। মনের এই যে অকপট ও অটল বিশ্বাস—ইহা রজনীকান্ত তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ইহারই জোরে তিনি একদিন জোর গলায় গাহিয়াছিলেন,—

কেন বঞ্চিত হ'ব চরণে?

আমি যখন আশার আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, তখন হে আমার বাঞ্ছিত, জীবনে না পাইলেও মরণে তোমাকে পাইবই। প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছিলও তাই। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে রজনীকান্ত শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহার সারা জীবনের শত বাধাপ্রাপ্ত সাধনা এইখানে—এই সন্ধিস্থলে পৌঁছিয়া পূর্ণ ও সিদ্ধ হইয়াছিল।

কথাটা স্পষ্ট করিয়া, একটু বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি। ভগবৎকৃপাবিশ্বাসী রজনীকান্ত হৃদয়ের পরতে পরতে শ্রীভগবানের কৃপা, তাঁহার অযাচিত করুণা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই চরণ-মকরন্দ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন; তাই তিনি কবিতার ভিতর দিয়া নিজের মনের ভাবকুসুমগুলিকে ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণের উদ্দেশে অর্পণ

করিতেছিলেন। কিন্তু কে যেন বিরোধী হইয়া, এই ভক্তিসাধনার পথ হইতে রজনীকান্তকে 'কণ্টক-বনে' টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার 'পাথেয়' কাড়িয়া লইতেছিল, কে যেন 'দীর্ঘ প্রবাস-যামিনীর' ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে ডুবাইতেছিল, কে যেন 'মায়ামোহে'র শিকলে তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া সংসারের বেড়াজালে তাঁহাকে বন্দী করিতেছিল,—আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীভগবানের চরণ-সরোজ হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছিলেন। সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া, সেই 'অমৃতবারিধি' শ্রীহরির অগাধ প্রেমসিন্ধুনীরে ঝাঁপ দিবার জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু 'দারা-সুত-সুখ-সম্মিলনে' মিশিয়া তাঁহার এ ব্যাকুলতা নিষ্ফল হইতেছিল। অবস্থা যখন এইরূপ, সাধনার পথে যখন পদে পদে শত শত বাধা উপস্থিত হইয়া বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল, তখন রজনীকান্ত নিরাশ ও কাতর হইয়া শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন করিলেন,—

বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে
একবিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা
করুণা-কল্লোলে তারে ডাক একবার॥

তিনি বুঝিলেন, ভগবানের করুণা ভিন্ন তাঁহার এ সাধনা সিদ্ধ হইবার নয়। তাঁহার করুণার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে না পারিলে—তাঁহারই করুণাধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত মলিনতা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে, এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না। অকপট ভক্ত তাই আপনাকে সেই করুণাময়ের চরণে উৎসর্গ করিলেন; কায়মনপ্রাণে তাঁহারই করুণার ভিখারী হইয়া সকল প্রকার ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশা-বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইলেন।

গলদেশে অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে রজনীকান্ত শ্রীভগবানের দর্শন পাইতেন,

কিন্তু সে ক্ষণিক দর্শন। তাঁহার রচনার ভিতরে এই দর্শনের পরিচয় ও বিবৃতি পাই,—

কোন্ শুভ গ্রহালোকে, কি মঙ্গল যোগে
চকিতে যেন গো পাই দরশন!
সেই ক্ষুদ্র এক পল, কৃতার্থ সকল
রোমাঞ্চিত তনু ঝরে দু'নয়ন॥

এই যে চকিতের জন্য তাঁহাকে পাওয়া—তার পর তাঁহাকে হারাইয়া ফেলা, এই যুগপৎ ঘটনায় তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইত, তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে ;—

আঁখি মুদি আমার নিখিল উজ্জল
আঁখি মেলি আমার আঁধার সকল,
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই
তুমি জান গো সাধক-শরণ।
তব যাত্রা সনে যদি পায় লোপ
ধরণীর মায়া, নাহি রয় ক্ষোভ,
সবাই ফিরে আসে, ভাঙ্গা হৃদি পাশে
কেবল হারাইয়া যায় সাধনার ধন।

সেই হারানিধিকে ফিরিয়া পাইবার আকুল আবেগ রজনীকান্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল ; তাঁহার বিরহ রজনীকান্ত আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সেই সাধনার ধনকে ধরিবার জন্য, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য, অন্তরের অন্তরে তাঁহার চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য কাতরকণ্ঠে কান্ত তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলেন,—

ওহে প্রেমসিন্ধু, জগবন্ধু
আমি কি জগৎ ছাড়া হে ;

এই গভীর আঁধারে অকূল পাথারে
একবার দেহ সাড়া হে।
(কেন সাড়া দেবে না ?)
(কাতরে পাপী ডাকে যদি, কেন সাড়া দেবে না ?)

কবি বিদ্যাপতি এক দিন যে কথা বলিয়া আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই,—

"তুহুঁ জগন্নাথ জগমে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুই ছার।"

এ যেন তাহারই প্রতিধ্বনি! কিন্তু এখানে তাহা আরও সুন্দর—আরও মর্ম্মস্পর্শী। তুমি যে জগন্নাথ, জগতের পতি—আর আমি যে তোমারই এই জগতের মাঝখানে রহিয়াছি; তখন কেন আমার ডাকে—আমার আকুল আহ্বানে, হে জগন্নাথ, তুমি সাড়া দেবে না? হাসপাতালের রোজনামচার মধ্যেও এই সুরের ধ্বনি দেখিতে পাই—"সে জগৎ ভালবাসে, আমাকে ভালবাসে না? তাকে ভুলেছিলাম, তা সে ছেলেকে ছাড়বে কেন?"

সংসার-তাপে তাপিত চিত্তকে শ্রীভগবানের করুণা-চন্দনের প্রলেপে শীতল করিবার জন্য রজনীকান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই চিরশরণের শরণ লইবার জন্য তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছিলেন,—

কবে, তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে।

এই নির্ম্মল ও কুণ্ঠাহীন আত্ম-নিবেদন তাঁহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল—তাই আবেগে তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইয়াছিল,—

প্রভাতে যখন পাখী, নীড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর-মাঝে,
দুর্ব্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে ;
কি তীব্র উৎকণ্ঠা লয়ে, আশার আশ্বাসে বাঁচে।
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেম্‌নি ক'রে মাকে চা'ব
সুখ দুঃখ ভুলে যাব, হায়রে, সে দিন কোথা আছে !
হয়ে অন্ধ, হয়ে বধির 'মা,' 'মা,' ব'লে হ'ব অধীর,
দু'নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে।"

এই ব্যাকুলতার ধারা রজনীকান্তের প্রাণ হইতে স্বতঃই প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, এইভাবে ডাকিতে না পারিলে, মাকে ঠিক ধরিতে পারা যাইবে না।

হ'য়ে অন্ধ, হ'য়ে বধির, 'মা,' 'মা' বলে হব অধীর,
দু'নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে।

অন্ধ ও বধির হইয়া, মা-মা বলিয়া মাকে ডাকিয়া অধীর হইতে হইবে, আর দীনহীন কাঙ্গালের সাজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। যেটি আমাদের দেশের সনাতন সুর, যে ভাব-ধারা চারিশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেমতরঙ্গে বান ডাকাইয়াছিল, সেই সুরটি রজনীকান্তের হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, সেই যে—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

হে ঠাকুর, কবে তোমার নাম করিতে করিতে নয়নধারায় আমার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইবে, গদ্গদধ্বনি উত্থিত হইয়া বাক্যরুদ্ধ হইবে, আর পুলক-রোমাঞ্চে সমস্ত দেহ ভরিয়া উঠিবে। এই ত সাধকের প্রকৃত আকাঙ্খা ;

এই ভাবে ভাবিত হইয়া সাধনা করিতে না পারিলে ত সিদ্ধ হওয়া যায় না, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না।

সত্য সত্যই সহজে তাঁহার দেখা মিলে না। যে আপনার জন, তাহাকেও সে সহজে দেখা দেয় না—কেন না সে বড় 'নিজজন-নিঠুর'; আপনার জনকে সে বড় কাঁদায়। শ্রীমতী রাধিকার সে ভিন্ন অন্য গতি ছিল না, কিন্তু শ্রীমতীকে সে কতই না কাঁদাইয়াছে। সে ছাড়া অন্য কাহাকেও পাণ্ডবেরা জানিত না, শয়নে-জাগরণে, বিপদে-সম্পদে তারই নাম তাদের জপমালা ছিল; আর তারাও তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল, কিন্তু সেই পাণ্ডবদের সে কতই না কষ্ট দিয়াছে! সে জানে, যে আপনার জন—তাহাকে খুব কাঁদাইতে হয়—কষ্ট দিতে হয়; তবে তাহার ভক্তি ঐকান্তিকী হইবে, অহেতুকী হইবে; আমার প্রতি তার মতি অচলা থাকিবে। নতুবা পাঁচ বছরের দুধের ছেলেকে বনে বনে ঘুরাইয়া, কত কাঁদাইয়া, "পদ্মপলাশলোচন"-দর্শনলালসায় ব্যাকুল করিয়া শেষে সে দেখা দিবে কেন? না কাঁদিলে, হৃদয় একান্ত ব্যাকুল না হইলে, তাঁহাকে ত পাওয়া যায় না; তাই সে কাঁদায়। তাকে পাবার জন্ম মানবের মনে সেই ত করুণাবশে ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দেয়। বহু সুকৃতি ও জন্মান্তরীন সাধনার ফলে রজনীকান্তের মনে এই একান্ত ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল। তাই হাসপাতালে রোগশয্যা-গ্রহণের পূর্ব্বে —স্বাস্থ্যসুখসম্পদের মাঝখানে বসিয়া একদিন তিনি কাতরকণ্ঠে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন,—

সম্পদের কোলে বসাইয়ে, হরি,
সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে;
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।

মত্ত হ'য়ে সদা পুত্র-পরিবারে,
ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্যে,
(আমি) ধুয়ে মুছে ফেলি তোমার নাম-গন্ধ
মজে তার চাকচিক্যে।
নির্লজ্জ হৃদয় ভেঙ্গে সব লও,
দুঃখ দিয়ে দাও দীক্ষে ;
(আমার) বাধাগুলো নিয়ে অভয় চরণ,
(আর) ভিক্ষার ঝুলি, দাও ভিক্ষে।

রজনীকান্তের দয়াল শ্রীহরি তাঁহার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যসুখসম্পদ্ হরণ করিয়া কলকণ্ঠ রজনীকান্তকে রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া দিলেন—তাঁহাকে সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া তাঁহার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া দিলেন। বাক্যহারা কবির নীরব আত্মদান গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তের ভগবান্ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহলৌকিক সুখ-দুঃখের প্রকৃত অনুভূতি রজনীকান্তের অন্তরের অন্তরে পরিস্ফুট করাইয়া দিবার জন্য অন্তর্যামী ঠাকুর দুঃখ-যন্ত্রণার, অভাব-অনটনের শত চাপে কান্তকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন।—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইল—রজনীকান্তের হৃদয় ভরিয়া সেই সুর উঠুক, সেই,—

আমি, সংসারে মন দিয়েছিনু
তুমি, আপনি সে মন নিয়েছ,
আমি, সুখ বলে দুঃখ চেয়েছিনু
তুমি, দুঃখ বলে সুখ দিয়েছ।

তাই রজনীকান্ত যখন সকল রকমে নিরুপায় হইলেন—সকল রকমে কাঙ্গাল হইলেন—যখন স্থির বুঝিলেন, পার্থিব যশ, অর্থ, মান, সম্পদ্—এই শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ইহাদেরই মায়ায় আমি অহমিকা-কূপে মগ্ন হইয়া

পড়িতেছি—তখনই দেহাত্মিকা মতিকে ভগবদাত্মিকা করিবার জন্ত গাহিয়া উঠিলেন,—

এই, দেহটা যে আমি সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর
তাই, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর।

তিনি বুঝিলেন—তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে,—তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইলে, তাঁহাতে একান্ত নির্ভর করিতে হইবে—একমাত্র সেই অনন্ত-শরণের চরণেই শরণ লইতে হইবে—তাঁহারই ক্ষমাভিক্ষা করিয়া বিশ্বরূপ-দর্শনমুগ্ধ অর্জ্জুনের ন্তায় তাঁহারই উদ্দেশে বলিতে হইবে—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥

বিশ্বের পূজিত দেব ঈশ্বর যে তুমি
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতেছি, আমি—
পিতা পুত্রে, সখা মিত্রে, বান্ধবে বান্ধব
ক্ষমা করে যথা আর সহ্য করে সব,
সেইরূপ ক্ষমা কর আমায় যে দোষ
প্রিয় ভাবি সহ্য কর—না করিও রোষ।

ঠিক এই ভাবের কথাই তখন রজনীকান্তের লেখনীমুখে বাহির হইয়াছিল,—

হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ
কর 'তোমাগত'প্রাণ।

আমার এই অস্থির চঞ্চল প্রাণকে দোহাই ঠাকুর, 'তোমাগত' করিয়া

দাও। এই উঁচু তারে সুর বাঁধিয়াই রজনীকান্ত কুরুসভামধ্যবর্ত্তিনী নির্য্যাতিতা ও বিপন্না দ্রৌপদীর ন্যায় সেই নিখিলশরণের চরণে চিরশরণ লইলেন। তিনি বলিলেন,—

রাখ ভাল, মার ভাল, চরণে শরণাগত।

ঐতিহাসিকপ্রবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কেও তিনি অন্তিম সময়ে ঠিক এই কথাই জানাইয়াছিলেন—

একান্ত নির্ভর আমি
করেছি দয়ালে,
রাখে সেই, মারে সেই
যা থাকে কপালে।

এইখানে পৌঁছিয়া রজনীকান্তের সাধনা সিদ্ধ হইল—এইখানেই, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে—রজনীকান্ত সেই সাধকশরণের দর্শন পাইলেন। তিনি স্থির জানিতেন—শুধু জানা নয়, প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন,—

ও তার কাঙ্গাল-সখা নাম
কাঙ্গাল বেশে দেয় দেখা
আর পূরায় মনস্কাম।

তাই কাঙ্গাল হইয়া সেই কাঙ্গাল-সখাকে পাইলেন—কিন্তু যে মূর্ত্তিতে তিনি দেখা দিলেন, সে বড় কঠোর মূর্ত্তি—সে তাঁহার শাসনের রূপ তাঁহার 'দয়ালের'—তাঁহার সেই 'কাঙ্গালসখার' সেই ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া রজনীকান্ত ভয় পাইলেন না—তিনি শ্রীভগবানের চরণযুগল ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন।

একখানি পত্রে তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে এই দর্শনের পরিচয় কথা এই ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন—"আমাকে বড় মারছে। বলে আর মারে। তা' মেরে ধরে যা' হয় করুক' আমি আর কাঁদি না

উঃ আঃ কিছুই কচ্চিনা। কতদিনই বা মারবে? মারতে মারতে হাত ব্যথা হয়ে যাবে। আমি কিছু বলবো না। যা' হয় তাই হোক। যা' হয় তাই হোক। দেখি না, কোথায় নিয়ে যায়। আমি ত আর ধূলোতে নামবোই না। ঘাড় ধ'রে যদি না পাঠায়—তখন কাঁদবো। এ কান্না শুনতে হবেই। * * * * আমার শরীরে আর কিছু রাখ্‌লো না। তা কি হবে? এটা তো ফাঁকা বই ত নয়? তবে আর কি হবে? আমার মাথায় একটা আর বুকে একটা পা দিয়েই থাকে, আমি দেখতে পাই। পাও দেয়, মারেও। তবে এক সময় বেশীক্ষণ নয়, ছেড়ে দেয়। তখন অন্য অন্য কাজ করি, কিন্তু পা দিয়েই থাকে—নামায় না।"

কি সুন্দর অনুভূতি! কি মর্ম্মস্পর্শী অভিব্যক্তি! কোন্ সাধনায়,—জন্মজন্মান্তরের কোন্ সুকৃতি-বলে রজনীকান্ত এই অনুভূতির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা বলিতে পারি না।

রজনীকান্তের এই পত্র-সম্বন্ধে ভক্ত অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছিলেন—"নিজের বিষয় কি কথাই লিখিয়াছেন! এমন মানুষই তিনি ছিলেন—'আমার মাথায় একটা আর বুকে একটা পা দিয়েই থাকে, আমি দেখতে পাই। পাও দেয়, মারেও।' এমন কথা অমন লোক বই কেউ কি লিখতে পারে?"

বাস্তবিক এই ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখাইয়াই ভগবান্ যেন রজনীকান্তকে 'তদেব'—সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন,—

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥

ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ হেরিয়া আবার,
ব্যথিত বিমূঢ় যেন, হইও না আর ;
ভয়শূন্য প্রীতমনে দেখ পুনরায়,
গদাচক্রধারী সেই কিরীটী আমায়।

—আর শ্রীভগবানের এই মধুর—এই ভক্তজনমনোরঞ্জন মূর্ত্তি দেখিয়াই রজনীকান্ত বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"একি বিকাশ! এ কি মূর্ত্তি প্রেমের! সখা, প্রাণবন্ধু, প্রাণের বেদনা কি বুঝেছ?"

হাসপাতালে নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রজনীকান্তের এই ভগবদ্ভক্তি ও ঐকান্তিক ঈশ্বর-বিশ্বাস দেখিয়া বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। একবাক্যে সকলের কণ্ঠ হইতে এই কথাই কেবল বাহির হইতেছিল—"সাধনার এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ধন্য হইলাম।" হাসপাতালে রজনীকান্তের এই অপূর্ব্ব সাধনার পরিচয় পাইয়া লোকমান্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় রজনীকান্তকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা এইখানে তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছি—"ভগবান্ আপনাকে লইয়া যে লীলা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। লীলাময়ের লীলা আপনি এ রোগকষ্টের অবস্থায় যেরূপ বুঝিতেছেন, এরূপ বুঝিবার লোক ত পাই না। আপনিই ধন্য—এরূপ কঠোর যাতনার মধ্যে আনন্দ-নির্ঝরের মধুরতা অনুভব করিতেছেন। দেবগণ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন বলিয়াই আপনি এমন ভাগ্যধর। আপনাকে যে দর্শন করিয়াছি ও স্পর্শ করিয়াছি, ইহা মনে করিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইতেছি। কষ্ট আর যাতনা কতটুকু? আনন্দের ত' ওর নাই। আনন্দময় যে আপনাকে যাতনার মধ্যেও তাঁহার মাধুরী দেখাইয়া কৃতার্থ করিতেছেন, ইহারই চিন্তনে আখস্ত হইতেছি। * * * * যাঁহার চরণে আপনার মধুময় প্রাণ বিকাইয়াছেন, তিনি আপনার চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে মধুবর্ষণ করিতেছেন। চিরদিন আপনি অমিয়-সাগরে

ডুবিয়া থাকুন, আর বঙ্গদেশবাসিগণ আপনার প্রাণ-নিশ্চ্যুত দুই এক বিন্দু পাইয়া আপনি যেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, তেমনি করিতে থাকুন। সমস্ত দেশ তদ্দ্বারা সিক্ত, পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হউক।"

হাসপাতালে রজনীকান্ত যখন রোগশয্যায় শায়িত তখন পথে-ঘাটে, সভায়-মজলিসে, সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে—লোকের মুখে প্রায়ই রজনীকান্তের কথা উঠিত। হাসপাতালে আসিবার আগে তাঁহার নাম এত শোনা যায় নাই—তাঁহার কথা এরূপভাবে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে নাই। কেন,—তাহার একটি সুন্দর উত্তর আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"অনেকে বলেন, রজনীকান্তের নাম পূর্ব্বে ত এত শোনা যায় নাই, হঠাৎ তাঁহার এত নাম হইল কেন? যাঁহারা রোগশয্যায় কবিকে একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। যে কারণে রাজ-রাজেশ্বর সাধু-ভক্তের চরণে মাথার মুকুট রাখিয়া সম্মান করেন, সেই কারণেই রজনীকান্তের আজ এত সম্মান। ভগবান্‌কে অন্তরে ধারণ করিয়াই ভক্ত জগতে পূজিত, সম্মানিত।"

বাস্তবিকই হাসপাতালে রোগশয্যায় রজনীকান্ত ভগবান্‌কে অন্তরে ধারণ করিয়া সাধারণের কাছে সম্মানিত—পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সাধনার ভাব—ভক্তির ভাব দেখিয়াই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু লোকে বলিয়াছিলেন—"আপনাকে দেখে পূজা করতে ইচ্ছা যাচ্ছে।"

মানুষের আধি-ব্যাধি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অভাব-অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা—এই সমস্ত উপসর্গের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে যে মহৌষধি সেবন করিতে হয়, সেই মহৌষধি পান করিয়া রজনীকান্ত ইহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। "এই ক্ষুধা পিপাসা তোমার চরণে দিলাম,"

বলিয়া যে দিন তিনি শ্রীভগবানের চরণে তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা অর্পণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তিনি ভগবৎ-প্রেমসুধারূপ মহৌষধি পানের অধিকারী হইয়া আত্মাকে ক্লেশ-মুক্ত করিয়াছিলেন। আত্মার এই যে মুক্তাবস্থা—ইহা রজনীকান্ত লাভ করিয়াছিলেন এবং এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, সাধকের আত্মা যে দেহ ও তাহার সংশ্লিষ্ট কষ্টাদি হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত হইয়া যায়—আমাদের সাধক রজনীকান্ত তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়াই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।"

পুণ্য-চরিত্র আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—"বুঝিলাম কবি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অমৃতে পৌঁছিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন! আমি যতবারই সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, ততবারই তাঁহার আত্মসংযম ও বিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। * * * * কবি যে দিন তাঁহার 'দয়ার বিচার' গান করাইয়া শুনাইলেন, সে দিনের কথা এ জীবনে ভুলিব না।" তার পর রজনীকান্তের সাধনার কথা বলিতে গিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"এক কথায় বলিতে হইলে,—রজনীকান্ত সাধক ছিলেন বলিলেই যথেষ্ট হইল! কবিতাপুষ্প চয়ন করিয়া রজনীকান্ত আবেগের ধূপ-ধুনাতে আমোদিত করিয়া, আজ কয়েক বৎসর হইল, মাতৃ-ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে সাধনা-উৎস প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শুধু কবির নিজ হৃদয়ের পবিত্র নিলয়টি অধিকতর পবিত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—উহা বঙ্গবাসীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া সরল সাধনার একটি যুগ আনয়ন

করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে, কেন না পাঠক হয় ত এতাদৃশ প্রশংসাবাদকে কোনরূপ অপকৃষ্ট আখ্যার আঘাত করিতে পারেন। রজনীকান্ত ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, অথচ নব্য-বঙ্গে সরল সাধনার যুগ আনয়ন করিয়াছেন,—শুনিলে স্বতঃই মনে সংশয়-সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু কথাটার মীমাংসা করিতে হইলে, রজনীকান্ত কোন্ শ্রেণীর সাধক, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইবে। বঙ্গে এমন কোন সন্তান নাই, যিনি সঙ্গীতজ্ঞ সাধু রামপ্রসাদকে সাধক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন—বরং 'সাধক রামপ্রসাদ,' ইহাই বাঙ্গালার প্রতিগৃহে রামপ্রসাদের আখ্যা। তাঁহার সাধনার উপকরণ-সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহা আর কিছুই নহে—গভীর আবেগপূর্ণ সঙ্গীতই তাঁহার ফুল-বিল্বপত্র, প্রেমাশ্রু তাঁহার গঙ্গোদক, তন্ময়তাই তাঁহার 'আনন্দম্'। কবি রজনীকান্তও এই শ্রেণীর সাধক! যাঁহারা এই সাধু ও সজ্জন কবি-বরকে দেখিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার জীবনের সুখদুঃখ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার আর্থিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অবস্থা জ্ঞাত, যাঁহারা এই বিনীত, উদার, ধর্ম্মপ্রাণ কবিপ্রবরের দয়া-দাক্ষিণ্য-সরলতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত—তাঁহারা একবাক্যে সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, রজনীকান্ত সাধক ছিলেন! সংসারে থাকিয়া ধনরত্নস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া, কি প্রকারে শিক্ষা-জ্ঞান-সমাজসংস্কারে জীবন ঢালিয়া দেওয়া যায়—রজনী-কান্ত তাহার উদাহরণ।"

যে অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হইয়া রজনীকান্ত জনসাধারণ কর্ত্তৃক এরূপভাবে সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছিলেন, সেই সম্পদের পরিচয় আমরা তাঁহার হাসপাতালের রচনা ও রোজনাম্চার মধ্যে পাই। সেইগুলি সূক্ষ্ম-ভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার সাধনার ধারা বেশ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। গভীর ও অটল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর তিনি

সাধনার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে সেই সাধনের ধনকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তার পর হৃদয়ের শুভ্র, নির্ম্মল ভক্তি-শতদলে হৃদয়-দেবতার পূজা করিয়া সিদ্ধ সাধক রজনীকান্ত তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহার হাসপাতালের রচনা—তাঁহার অন্তিম সময়ের মর্ম্মকথার ভিতরেই আমরা এই সাধনার পূর্ণ পরিচয় পাই। তাঁহার সাধনার প্রত্যেক স্তর, ছন্দঃ, ভঙ্গী ও ধারার গতি লক্ষ্য করি।

যখন জীবনের সুখ, সম্পদ্, স্বাস্থ্য, আশা, অর্থ,—সকলই একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে, চারিদিক্ হইতে বিপদ্ ও নিরাশার ঘনীভূত অন্ধকার অল্পে অল্পে রজনীকান্তকে গ্রাস করিতেছে, জীবনের সেই সঙ্কটময় নিদারুণ সময়ে রজনীকান্তের হৃদয়বীণার তারে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহা একেবারে খাঁটি ও সরল, কৃত্রিমতার লেশমাত্র তাহার মধ্যে ছিল না। সকল হারাইয়া, কাঙ্গাল হইয়া—দিবাবসানে জীবনের গোধূলিবেলায় খেয়া ঘাটে বসিয়া রজনীকান্ত যে মর্ম্মকথা তাঁহার মরমের দেবতার পায়ে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতেই বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কপটতা বা অতিশয়োক্তি ছিল না, স্থান কাল পাত্র ও অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে—তাহা যে থাকিতেই পারে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অগণিত বিপদ ও অসহনীয় যন্ত্রণার মাঝখানে বসিয়া রজনীকান্ত সেই বিপদবারণ হরির মঙ্গলময় মূর্ত্তি—তাঁহার দয়াল-রূপ দেখিয়াছিলেন—করুণাময়ের করুণার সহস্রধারা দেখিয়া উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"আমি আবার মার দয়া সহস্রধারায় দেখছি; তোরা দেখ্। 'মা জগদম্বা,' 'মা জগজ্জননি' ব'লে একবার সমস্বরে ডাক্ রে।"

প্রথমেই রজনীকান্ত দেখিলেন, তাঁহার এই যে দুরারোগ্য কষ্ট দায়ক ব্যাধি, এই যে তীব্র যন্ত্রণা, এই যে পীড়ন ও বেত্রাঘাত—এ কেবল তাঁহাকে "আগুনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে, খাদ উড়িয়ে দিয়ে খাঁটি ক'রে কোলে

নেবে (ব'লে) ; নইলে ময়লা নিয়ে তো তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।" তখন তিনি বুঝিলেন—"এ তো মার নয়, এ তো কষ্ট নয়—এ প্রেম, আর দয়া। মতি ভগবদভিমুখী কর্‌বার জন্য এ দারুণ রোগ, আর দারুণ ব্যথা, আর কষ্ট।"—এইভাবে দেহাত্মিকা মতিকে সংযত করিয়া রজনীকান্ত সাধনায় বসিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন এবং অকপটে স্বীকারও করিয়াছিলেন,—

আমি, ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করেছি সর্ব্বনাশ।

কেবল কি তাই ?

তোর অগোচর পাপ নাই মন
যুক্তি ক'রে তা করেছি দু'জন
মনে কর দেখি ? আমাদের মাঝে
কেন মিছে ঢাকাঢাকিরে ?

হাসপাতালের রোজনাম্‌চার মধ্যেও তাঁহাকে অনুতাপ করিতে দেখি,—"দেখ প্রকাশ্যে না হোক্, মনে বড় জ্ঞান আর বিদ্যার গৌরব কর্ত্তাম, তাই আমার ঘাড় ধরে মাথাটাকে মাটির সঙ্গে নীচু করে দিয়েছে, দয়াল আমার।" অনুতপ্ত রজনীকান্ত দেখিলেন, বাক্যজ পাতক হরণ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার কণ্ঠনালী রুদ্ধ করিয়া দিয়া তথায় তীব্র বেদনা ঢালিয়া দিয়াছেন। আর এইভাবেই 'পাপবিঘাতক' শ্রীহরি রজনীকান্তের কায়জ ও মনোজ পাতকও হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে—

নির্ম্মল করিয়া 'আয়' বলে লবে
শীতল কোলে ডাকি রে।

যখন তিনি এই পীড়নের ও নিদারুণ ব্যথার মধ্যে সেই প্রেমময়ের প্রেমের সন্ধান পাইলেন,—যখন রজনীকান্ত বুঝিলেন—"আমাকে প্রেম দিয়ে বুঝি-

য়েছে যে, এ মার নয়, এ কষ্ট নয়—এ আশীর্ব্বাদ।" তখন তিনি দৈহিক কষ্টকে জয় করিয়া আত্মাকে দেহমুক্ত করিবার সাধনায় মনঃসংযোগ করিলেন। রজনীকান্ত বেশ জানিতেন, তাঁহার যে কষ্ট—তাহা শারীরিক; আত্মা তাঁহার কষ্টমুক্ত;—"এই দেহাত্মিকা বুদ্ধি হয়েই যত কষ্ট। নইলে শরীরের পীড়ায় কেন কষ্ট হবে? শরীরটা তো খাঁচা, ভেঙ্গে গেলে পাখীটার কষ্ট কি?" তাই তিনি আত্মাকে দেহমুক্ত করিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন—তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশে জানাইলেন—"আত্মাকে দেহমুক্ত কর দয়াল, আর দেহ চাহি না। দেহ আমাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। আমার আত্মাকে তোমার পদতলে নিয়ে যাও।" এইভাবে প্রার্থনা জানাইয়া, আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া রজনীকান্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা পাইলেন; তিনি লিখিলেন,—"রাত এলেই বেশ নীরব নিস্তব্ধ হয়, তখন মার খাই বেশী, আর প্রেমের পরীক্ষায় পড়ে কত সান্ত্বনা পাই, কষ্ট হয় না, বেশ থাকি!"

দৈহিক কষ্টকে এইভাবে জয় করিয়া সাধক রজনীকান্ত স্থিরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় তিনি বলিলেন,—"মন স্থির করবো না ত কি? হিন্দুর ছেলে গীতার শ্লোক মনে আছে তো?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

জীর্ণবাস ছাড়ি যথা মানবনিচয়
নববস্ত্র পরিধান করে, ধনঞ্জয়,
সেইরূপ জীর্ণদেহ করি পরিহার
নব কলেবর আত্মা ধরে পুনর্ব্বার।

অমন ত' কতবার মরেছি—মর্‌তে মর্‌তে অভ্যাস হয়ে গেছে।" নির্ভীকহৃদয়ে

মৃত্যুঞ্জয়ী সাধকের ন্যায় তিনি লিখিলেন—"আমি মৃত্যুর অপেক্ষা কর্‌ছি, আমার ব্যায়রাম যে অসাধ্য। বেদবাক্য বলছি না, তবে যা খুব সম্ভব, তাই মানুষ বলে আমিও তাই বল্‌ছি। আর তৈরী হয়ে থাকা ভাল। খুব ঝড় বয়ে যাচ্ছে, নৌকা ডুবে যাওয়ারই ত বেশী সম্ভাবনা, সেই ভেবেই লোকে হরিনাম করে। বাঁচব না মনে হলেই আমার এখন বেশী উপকার। কারণ, সুস্থ থাক্‌লে কেউ বড় দয়ালের নাম করে না।" কি সুন্দর কথা! এ যেন ভক্তকবি তুলসীদাসের সেই সনাতন বাণীরই অভিব্যক্তি; সেই—

"দুখ পাওয়ে ত হরি ভজে
সুখে না ভজে কোই।"

এইভাবে ভগবৎ-বিচারের উপর নির্ভর করিয়া রজনীকান্ত "যা ভগবান্ করান, আমি তাতেই গা ঢেলে ব'সে আছি। আর বিচার করিনে, যা হয় হোক্। এক মৃত্যু,—তার জন্য ভগবানের পায়ে পড়ে আছি"—বলিয়া তাঁহার হৃদিস্থিত হৃষীকেশের চরণতলে পড়িয়া রহিলেন।

গীতার সেই মহতী বাণী, যে বাণী একদিন বাণীপতির শ্রীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রেমধারায় সমগ্র জগৎকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, সেই—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যাহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি—রজনীকান্ত প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, তিনি জানিতেন—"সম্যক্ ও যথাবিধ একাগ্র সাধনায় যে ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো ভক্তের ঠাকুর, যে তাঁহাকে যে ভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন; এ কথা সত্য না হইলে যেন তাঁহার করুণাময়ত্বে—তাঁহার ভক্তবৎসলতায় কলঙ্ক হয়।" বড় উঁচু কথা। আর এই উঁচু কথা কয়টিকে জপমালা করিয়াই তাঁহার দর্শনলালসায় রজনীকান্ত ব্যাকুল হইলেন। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা—

পরলোকগত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জননী রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে আসিলে রজনীকান্ত বলিলেন—"মা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মতি ভগবন্মুখিনী হয়। তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অচলা হয়, আর সংসারে আমার কে আছে?" শয্যাপার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুদিগকে কাতরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন—"আমাকে ভগবৎপ্রসঙ্গ শোনাও। আমাকে কাঁদাও। আমার পাষাণ হৃদয় ফাটাও। প্রাণ পরিষ্কার করে দাও। খাদ্ উড়াও।" এই কাতরোক্তি, এই দৈন্য প্রকাশ, এই আকুল আবেগ সাধনার বিঘ্নসঙ্কুল পথকে সরল করিয়া দিতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত ভুলভ্রান্তির কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত-অনুতপ্ত রজনীকান্ত বলিতে লাগিলেন—"আমি যেন ঠিক দয়ালের খেয়াঘাটে পৌছাই। এই পথ তোমরা আমায় বলে দিও, আর যেন আমার ঘাট ভুল না হয়।"

এইভাবে সাধনা করিতে করিতে রজনীকান্তের কি অবস্থা হইল, তাহা একবার তাঁহার ভাষায় পাঠ করুন—"আমি যখন 'ভগবান্ দয়াল,—আমার দয়াল রে' লিখি, তখন ভাবে আমার চোখ জলে ভরে উঠে।" সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের কোণে লুকানো সেই অতি পুরাতন ছবিখানি, সেই—

"অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে—
বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশি-তারকায়, তপনে।

—শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশদর্শনের চিত্র আরও উজ্জ্বল হইয়া প্রত্যক্ষের মত তাঁহার হৃদয়পটে চিত্রিত হইয়া উঠিল। প্রতি কার্য্যে তিনি ভগবানের প্রেরণা বুঝিতে লাগিলেন—"মানুষ আমার জন্য এত করছে। তাঁরি মানুষ, সুতরাং তাঁরি প্রেরণায়।" কি গভীর অনুভূতি ও বিশ্বাস, আর এই অনুভূতি ও বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ হইয়াই রজনীকান্ত লিখিলেন—"আমি

তাঁর প্রেম প্রত্যক্ষের মত অনুভব কচ্ছি।" ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রেমের পরিচয় পাইয়া রজনীকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল—"সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার মন্দ হলেও ত পুত্র, আমাকে কি সে ফেল্‌তে পারে?" মনের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন রজনীকান্ত তাঁহার দয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! তুমি আমাকে কোলে নাও। তুমি দয়া করে কোলে নাও।"

"আমার প্রাণের হরিরে! হরিরে কোলে তুলে নাও হরিরে, আমি নিতান্ত তোমার চরণে শরণাগত হয়েছি, আর ফেল না।"

"তুমি ছাড়া আমার আর কেহই নাই। আমাকে যে ক্ষমা করে কোলে তুলে নেবে সেও তুমি।"

সকল প্রকারে সকল দিক্ দিয়া দেখিয়া তাঁহার এই যে ধারণা ও শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ—এই যে তাঁহার উপর ঐকান্তিক-নির্ভরতা, সাধনার উচ্চস্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে এগুলি আসে না। এইগুলিই সাধনামগ্ন রজনীকান্তকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরও রজনীকান্তের পরীক্ষার অন্ত নাই। তাঁহাকে লইয়া লীলা করিবার ইচ্ছা তখনও সেই লীলাময়ের পূর্ণ হয় নাই। তাই তিনি তখনও রজনীকান্তকে ভয় দেখাইতেছেন, পীড়ন করিতেছেন—কণ্ঠহারা রজনীকান্তের শেষ প্রার্থনা শুনিবার আশায় লীলাময় ঠাকুর কতই না খেলা খেলিতেছেন! সাধক রজনীকান্ত বুঝিলেন, কেবল ভার দিলে, আত্মসমর্পণ করিলে চলিবে না,—তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইলে—নামীকে ধরিতে হইলে—তাঁহার সেই অভয় নামের শরণ লইতে হইবে। সাধনার যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য, আসন্নমৃত্যু-কবলিত রজনীকান্ত বলিতে লাগিলেন—"খালি হরি বল্। বল্ হরি বল্, বল্ হরি বল্, খালি হরি বল্, আর কিছু নাই, সুধু হরি বল্, আর চাইনে কিছু—সুধু হরি বল্, হরি বল্। এই রসনা জড়ায়ে আসে, বল্ হরি

হইল্।" সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি নিজে আসিয়া এইবার রজনীকান্তের সাধন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রাণারামকে দর্শন করিয়া রজনীকান্তের অভিমানবিক্ষুব্ধ হৃদয় বলিয়া উঠিল—"হে দয়াল প্রাণবন্ধু, হৃদয়নিধি, এতকাল পরে কি আমার কথা মনে পড়েছে করুণা-সাগর!"

সাধক রজনীকান্তের সাধনা সিদ্ধ হইল। ভগবদ্দর্শন-তৃপ্ত রজনীকান্ত লিখিলেন—"আমাকে ভগবান্ দয়া করেছেন।" জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী তখন সর্ব্বদাই রজনীকান্তের কাছে বসিয়া থাকিয়া রজনীকান্তকে দিয়া লেখাইতেন—"মা এসে বসে আছে।"

কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর রজনীকান্ত সাধনার অতি সুন্দর ধারা দেখাইলেন, প্রাণান্তকর নিদারুণ যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি সেই ভূমার পদে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং সেই ভূমানন্দকেই সম্বল করিয়া আনন্দময়ী মায়ের সদানন্দালয়ে চলিয়া গেলেন।

এই কঠোর সাধনার ও সিদ্ধির প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া আমাদের মনের মধ্যে কান্ত যে ছবি আঁকিয়া দিয়া গেলেন, ভক্তিপূত হৃদয়ে বাঙ্গালী তাহা চিরদিন স্মরণ করিবে, আর কবি সুধীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে থাকিবে—

"হে রজনীকান্ত! তুচ্ছ করি সর্ব্বব্যথা
কি ধন লাগিয়া তুমি পুলকিতপ্রাণ—
রুদ্ধকণ্ঠ, বাক্যহারা—করিলে প্রয়াণ
মহাকাল-পারাবারে! ভক্তের বিভব
ও সে দুঃখ-মৃণালের কমলসৌরভ।"

রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের
নামে প্রবর্ত্তিত
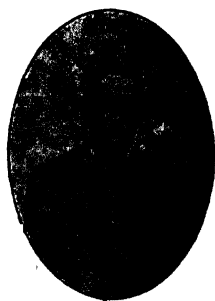
হৃষীকেশ-সিরিজ এর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

Approved by the Director of Public Instruction as a: Prize and Library Book.

(প্রথম সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া আসিল)

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম-এ ; বি-এল ;
এফ্-জেড্-এস্ প্রণীত

২। পাখীর কথা মূল্য—২॥৹

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩। <u>ভারত-পরিচয়</u> মূল্য—২৸৵০

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

৪। <u>কান্তকবি রজনীকান্ত</u>

প্রকাশিত হইতেছে

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত

৫। <u>চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ.</u>

পরে বাহির হইবে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত

১। <u>বৌদ্ধধর্ম্ম</u>

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

২। <u>স্থাপত্য-শিল্প</u>

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত

৩। বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়